প্রকাশক
রনধীর পাল
১৪ এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মে, ১৯৫৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
গণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
সনৎকুমার দত্ত
৮এ নবীন পাল লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১ বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

একদা প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় বিচিত্র বিষয় ও বিস্ময়কর রচনাশক্তির প্রসাদে বাঙালি পাঠকসমাজে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কথাসাহিত্য ও ভ্রমণসাহিত্যেই তাঁর অসপত্ন অধিকার। সমগ্র জীবন ধরে নানা অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে ঘুরেছেন, কখনো মরুপর্বতে, কখনো জলজঙ্গল পরিবেষ্টিত-আর্দ্রভূমির দেশে তিনি পরিব্রাজক হয়ে পরিক্রমণ করেছেন। সেই সমস্ত দুর্লভ অভিজ্ঞতা তাঁর চেতনাকে সম্প্রসারিত করেছে, রচনাশক্তিকে সৃষ্টিমূলক শিল্পকর্মে সার্থক করেছে। জীবনের স্বাদু প্রত্যয়, তীব্র তিক্ত বিষণ্ণতা, প্রেমের পুজোপচার, আবার ব্যর্থতার শূন্যতা তাঁকে ঘিরে ধরেছিল, কিন্তু তিনি সমস্ত খণ্ডতাকে পিছনে ফেলে পূর্ণের সন্ধান করেছেন।

তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প ও হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনী তাঁর শিল্পী-প্রতিভাকে উচ্ছলতা দিয়েছে, তীক্ষ্ণতা দিয়েছে, সুবলয়িত করেছে। মনের দিক থেকে একটু আবেগধর্মী, কিন্তু মননের দিক থেকে তীক্ষ্ণধী, প্রবোধকুমার একসময়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদের উপস্থিতি সত্ত্বেও নিজের জন্য একটি জ্যোতিষ্কমণ্ডল নির্মাণ করেছিলেন, যেটি তাঁর গল্পেই বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। সাধারণতঃ অতি-জনপ্রিয়তার মাশুল দিতে হয় দ্রুতবিস্মৃতির দ্বারা। কিন্তু প্রবোধকুমারের লেখা জলের লিখন নয় যে, শীঘ্র মুছে যাবে। আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও পরিণাম বিচার করলে তাঁর গল্পগুলিকে একটি নিটোল লাবণ্যের মতো মনে হবে, চরিত্রগুলিকে মনে হবে, আমাদের পার্শ্বচর।

পশ্চিম-বিশ্বেও ছোটগল্পের আয়ু দু'শো বছরের বেশী নয়, আমাদের আরো অল্প। উনিশ শতকের শেষে 'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গল্প দিয়ে বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পের সূচনা। আবার তিনিই এই রাজ্যের অসপত্ন অধিরাজ। তাঁর পরেও বাংলা ছোটগল্প পরিধিতে প্রসারিত হয়েছে, বৈচিত্র্যে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এক শতাব্দীর

(উনিশ শতকের অষ্টম দশক থেকে বর্তমান শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত) মধ্যে বাংলা ছোটগল্প, শুধু ভারতীয় সাহিত্যে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও স্বীকৃতিলাভ করেছে। বোধহয় গীতিকবিতা ও ছোটগল্পের সঙ্গেই বাঙালির মনের ধাতু ঠিক খাপ খায়। অবশ্য গীতিকবিতাও ছোটগল্পের আত্মীয়। লেখক-তন্ময়তা দুটি প্রকরণেরই প্রাণ। হয়তো একদিন ছোটগল্প ও গীতিকবিতার পার্থক্য ঘুচে যাবে। তেমন সম্ভাবনা পাশ্চাত্য ছোটগল্পেও দেখা দিয়েছে। আসলে ছোটগল্প হচ্ছে বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, উপন্যাসের ডালপালা ছেঁটে বামনাবতার বা বন্‌জাই শিশুবৃক্ষে পরিণত করলে তা কখনোই ছোটগল্পের শিল্পত্ব লাভ করবে না, আবার ছোটগল্পকে ইণ্ডিয়া রবারের মতো টেনেবুনে বড়ো করলে উপন্যাস হবে না। দুটি-ই-গদ্যে লেখা এবং দুটিতেই মানুষের কাহিনী থাকলেও রচনাপ্রকরণ ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের বস্তু। বরং তথাকথিত 'বড়োগল্প' হচ্ছে কুলভ্রষ্ট উপন্যাস। মানবজীবনের একটিমাত্র অভিজ্ঞতা একমুহূর্তের জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলে ছোটগল্পের রস জমে ওঠে। সামান্য কথায় অসামান্য প্রতিক্রিয়া ছোটগল্পের মূল ধর্ম। তাই নাটকীয় অপ্রত্যাশিত-ভাব সার্থক ছোটগল্পকে শিল্পরূপ দান করে। একটি কেন্দ্রবিন্দুতে চেতনাকে সংহত করতে না পারলে যথার্থ ছোটগল্প লেখা যায় না। তাই ছোটগল্প হচ্ছে এমন একটি মায়ামুকুর, যাতে গল্পকারের কুশীলবগণ ছায়ামায়ার আকারে ভেসে ওঠে। অবশ্য একালে ওদেশে ছোটগল্পের আঙ্গিকের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর ছোটগল্পে 'গল্প' থাকছে না, থাকছে না গীতিরসোচ্ছ্বাস, নাটকীয়তা, অনিবার্যতা। একালের গল্প গল্পলেখকের এক মুহূর্তের ইম্প্রেসন (impression), অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে পরাবাস্তবতার চকিত চমক হয়ে উঠছে। দ্বিমাত্রিক কলাশিল্পে যেমন শিল্পীর মনে ইন্দ্রিয়ময় ত্রিমাত্রিকতার বদল হচ্ছে, তেমনি সাহিত্যের নানা শাখায় এই রীতি স্বীকৃত হচ্ছে, বিশেষতঃ গীতিকবিতা ও ছোটগল্পে। একালের ছোট গল্পে বিকাশগত কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। অত্যাধুনিক ছোটগল্পে কোনো আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত পরিণাম থাকে না, কোনো-একটা স্থির সিদ্ধান্ত থাকে না। কারণ জীবন তো ইউক্লিডের জ্যামিতি নয় যে, সরল রেখা সরল রেখাই থাকবে। জীবন হচ্ছে একটি অন্ধ বৃত্ত, যার মধ্যে আমরা কানামাছি খেলছি, কিন্তু কেউ বুড়ীকে ছুঁতে পারছি না। কিন্তু

প্রবোধকুমারের এই সংগ্রহের গল্প পড়লে অতটা নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এতে আখ্যান আছে, চরিত্র আছে, আছে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, লেখকের জীবনদর্শন, এবং পরিশেষে যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি। দুশোর বেশী তিনি গল্প লিখেছেন, কিন্তু কোথাও পর্যুসিত পুনরাবৃত্তি-দোষ ঘটেনি, তা ঈষৎ সতর্ক পাঠক-পাঠিকা বুঝতে পারবেন।

তাঁর অধিকাংশ গল্পের পটভূমিকা মধ্যবিত্তসমাজকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, চরিত্রগুলিও সেই সমাজের প্রতিনিধি। অবশ্য নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজেরঅসহ্য ক্লেশও তাঁর কোনো কোনো গল্পে বাস্তবতার ধূম্রনিঃশ্বাসী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অনেক গল্পের অন্তিম পরিণতি মোহভঙ্গ ও নৈরাশ্য, কোথাও বা আত্মবিনাশ। কখনো চকিত চমকের মতো একটা বিশেষ দিক চরিত্রটিকে আমাদের কাছে মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট করে তোলে। 'তৃতীয়া' গল্পে প্রণবেশের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী সুললিতার মন-মেজাজ চড়াসুরে বাঁধা, তাকে নিয়ে নিরীহ প্রণবেশের সমস্যার অন্ত নেই। সুললিতার উগ্রতা, খামখেয়ালিপনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রণবেশের গা-সওয়া হয়ে গেলেও মাঝেমাঝে তার কষ্টের অবধি থাকে না। হঠাৎ সুলতা দুরারোগ্য জ্বরে পড়ল, বাঁচবার আশা কম। প্রণবেশ কি প্রেমহীন হৃদয়হীন স্ত্রীর কাছ থেকে মুক্তি পাবে? হঠাৎ সুলতার মৃত্যুচিন্তা তাকে প্রচণ্ড আঘাত দিল। তার দুটি স্ত্রী মরেছে, তৃতীয়টির সঙ্গে তার মনের মিল না হলেও সে তার মৃত্যু চায় না। এখানে তার মনোভাবটি নাটকীয় দিকে এইভাবে মোড় ফিরেছে :

> "এই নারীটির সেবা করিয়া ইহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। মৃত্যু আর সে চাহে না, সে জীবন ভিক্ষা করিতে চাহে। এই নারীটির চরিত্রে শত দৈন্য ও শত অন্যায়ের সন্ধান সে পাইয়াছে, এই নারী বাঁচিয়া থাকিলে তাহার সমস্ত জীবন দুর্বিষহ বোধ হইবে, প্রতিটি দিন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া উঠিবে, প্রতি মুহূর্তে তাহার মন ক্লেদাক্ত হইয়া উঠিতে থাকিবে —তবু সে বিধাতার কাছে ইহার জীবন ভিক্ষা চাহে। চিরদিনের অশান্তির অসহ্য বেদনায় তাহার বুক ভাঙিয়া যাক—তবু সে সুললিতার মৃত্যু কামনা করে না। সুললিতা বাঁচুক, বাঁচুক,—ভগবান, সুললিতাকে তুমি বাঁচাও।"

ছোট গল্প থেকে পাঠক অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তা চায়। সেদিক থেকে তাঁর এই গল্পগুলির এত জনপ্রিয়তার কারণ বোঝা যায়। কোনো বিশেষ তত্ত্বকথা নয়, সমস্যা নয়, রচনাকর্মের মারপ্যাঁচ নয়, সহজ জীবনের পরিচিত রস, যা কখনো তরল ফেনোচ্ছ্বাস. কখনো বা ক্লেদাক্ত,—প্রবোধকুমারের গল্পের প্রধান আকর্ষণ। সব বয়সীর পাঠক-পাঠিকা গল্পগুলি থেকে মনের আনন্দ খুঁজে পাবেন। প্রবোধকুমার সান্যালের পুত্রদ্বয় সমগ্র গল্প একাধিক খণ্ডে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে পিতার লেখকস্মৃতি অম্লান করতে প্রয়াসী হয়েছেন, এজন্য তাঁরা আমাদের অভিনন্দনযোগ্য।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

।। সূচীপত্র

তৃতীয়া	১
সিংহাসন	১১
মোহ	২১
পূরবী	৩২
প্রেতিনী	৪৩
মানব	৫৫
অগ্নিশিখা	৬৯
বিয়ের আগে বিয়ে	৭৭
অসংলগ্ন	৯১
ভাই	৯৮
রোগশয্যা	১০৬
বিস্ফোটক	১১৭
ঐশ্বর্য	১২৯
স্বামী-স্ত্রী	১৩৭
একটি মাত্র পা	১৪৩
গল্পের ভূমিকা	১৪৬
সর্বংসহা	১৫২
বন্যাসঙ্গিনী	১৫৫
শেষ পৃষ্ঠা	১৬৪
পুরানো কথা	১৭৫
ভুই-চাঁপা	১৯২
ছবি	১৯৯
উৎসব	২০৪
আলেয়া	২১১
ছিন্ন মুকুল	২২০
মৃত্যুরে কে মনে রাখে	২২৬
ছি ছি	২৪৫
অনুতাপ	২৬১
আগ্নেয়গিরি	২৬৫
মার্জনা	২৭৪

তৃতীয়া

প্রথম বিবাহ যখন হয় তখন প্রথম যৌবনের সমারোহ। প্রণবেশের জীবনে সেদিন নবীন বসন্তের আবির্ভাব। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন, আনন্দ-উল্লাস—ইহাদেরই ভিতর দিয়া সে সুন্দরী শিক্ষিতা বধূ ঘরে আনিয়াছিল। সংসার ছিল আনন্দের হাট।

তারপর একদিন আকাশের চেহারা বদ্‌লাইল, দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া কালবৈশাখী নামিয়া আসিল। গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জন, দিক্‌ চিহ্নহীন অন্ধকার, শিলাবৃষ্টি, তারপর বজ্রাঘাত। শাঁখা ও সিঁদুর পরিয়া প্রণবেশের প্রথম স্ত্রী বিদায় লইল।

তাহার পর দ্বিতীয় স্ত্রী। ঘা শুকাইয়াছে, কিন্তু দাগ তখনও মিলায় নাই। তবু প্রণবেশ ঘর বাঁধিল, ফাটলগুলি মেরামত করিল, চুনকাম করিল, জানালা দরজা খুলিয়া আলো-বাতাসের পথ করিয়া দিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর মধ্যে প্রথমাকে সে আবিষ্কার করিয়া লইল।

স্ত্রী যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী নয়। এক বৎসর কায়ক্লেশে ঘর করিয়া অবশেষে সে শয্যাগ্রহণ করিল। শয্যা সমেতই প্রণবেশ একদিন তাহাকে ট্রেনে করিয়া বাপের বাড়ি লইয়া গেল। ফিরিবার সময় দেখা গেল, স্ত্রী তাহার সঙ্গে নাই—প্রণবেশ একা; অশ্রুসিক্ত তাহার মুখ।

সেই হইতে কয়েক মাস সে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাইয়াছে। সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সদ্বংশের সন্তান—জীবনে সে অন্যায় করে নাই, জীবন-বিধাতাকে সে কোনোদিন অপমানও করে নাই। তবু সে পথে পথে ঘুরিয়াছে, অসহ্য লজ্জায় সে সমাজ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে।

জীবনের প্রতি তাহার গোপন মমতা ও ভালবাসা মৃত্যুর মধ্য দিয়া একটু একটু করিয়া বাড়িয়াছে, কিন্তু সে আর কাহাকেও বিশ্বাস করে না। মানুষ তাহার কাছে অসহায়, ক্ষুদ্র অবস্থার দাস,—নিয়তির খেয়ালের খেলনা।

তারপর তৃতীয়া।

বিবাহ-বাড়ির গোলমাল চুকিয়াছে, একে একে সব আলোগুলি নিবিয়া গেল।

বিবাহে আনন্দের চেয়ে স্বস্তিই যেন বেশী। উত্তেজনা নাই, একটি মন্থর ক্লান্তির ভাব।

ফুলশয্যার রাত। আলোটা একধারে টিম্‌ টিম্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে নিবিয়া যাইতে পারে। ঘরের বাহিরে আড়ি পাতিবার মতো মানুষ কেহ নাই। না আছে কাহারও ধৈর্য, না অভিরুচি।

ঘরের উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া প্রণবেশ জানালার বাহিরে শুক্লা রাত্রির দিকে তাকাইয়া ছিল, ঘরের দক্ষিণ দিকে দরজার কাছে সুললিতা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া। দেখিলে মনে হয় একজনের কথা ফুরাইয়া গেছে, আর একজনের কথা আরম্ভ করিবার পথ নাই।

ঘরের মাঝখানে খাটের উপর শয্যা রচনা করা ছিল, সুললিতা এক সময় উঠিয়া আসিয়া একপাশে শুইয়া পড়িল। বিছানায় শুইয়া জাগিয়া থাকিবার অভ্যাস সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রণবেশ তাহার দিকে একবার তাকাইল, তারপর অত্যন্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে দূর হইতেই বলিল,—চোখে লাগছে, আলোটা নিবিয়ে দেবো?

সুললিতা স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল,—না।

এমন সহজ ও পরিচ্ছন্ন গলার আওয়াজ প্রণবেশ জীবনে শোনে নাই। সে চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, প্রণবেশ ক্লান্ত হইয়া জানালার কাছ হইতে সরিয়া আসিল, খাটের কাছাকাছি আসিয়া কহিল,—সারাদিন উপবাসে গেল, কত কষ্ট হয়েছে, কিছু খেলে হ'ত না?

সুললিতা মুখ তুলিয়া সামান্য একটুখানি হাসিল, তারপর কহিল,—একদিন না খেলেও মানুষ বেঁচে থাকে।—বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

কুণ্ঠায় ও সংকোচে প্রণবেশ ধীরে ধীরে খাটের নিকট হইতে সরিয়া গেল।

সকাল বেলা উঠিয়া যে যার কাজে নামিল, বেলা বাড়িল, কিন্তু নূতন বউ আর উঠিতে চায় না। পিসিমা একবার মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া গেলেন, বউ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। প্রণবেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া অপ্রস্তুত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইল—কিন্তু সুললিতা আর জাগে না।

প্রণবেশ এক সময় ঘরে ঢুকিয়া অতি সন্তর্পণে বার-দুই ডাকিল। চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া সুললিতা কহিল,—কেন?

নূতন বধূর মুখের সহিত সে মুখের চেহারা মেলে না, প্রণবেশ অপ্রস্তুত হইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, পরে কহিল—এমনি ডাক্‌ছি, এ-ক'দিন বোধ হয় তুমি ঘুমোতেই পাওনি!

—তা জেনেও আবার ডাকা হ'ল কেন?—বলিয়া গম্ভীর হইয়া সুললিতা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। মনে হইল ঘুম ভাঙাইলে সে অকারণে চটিয়া যায়।

এই মেয়েটির দিকে অগ্রসর হইতে কোথায় যেন একটি ভয়ানক বাধা আছে। প্রণবেশের ধারণা হইল সে-পথ ভয়ানক দুর্গম, অতিরিক্ত কণ্টকাকীর্ণ। নারী কেমন করিয়া নিশ্বাস ফেলে তা পর্যন্ত প্রণবেশের জানিতে আর বাকি নাই।

কাপড় কাচিয়া সুললিতা ঘরে ঢুকিতেই প্রণবেশ বাহির হইয়া গেল। পিসিমা জলখাবার লইয়া আসিলেন। মনে হইল, সুললিতা যেন তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই; পিছন ফিরিয়া সে চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

—বউমা?

সুললিতা ফিরিয়া তাকাইল, তারপর কহিল,—রাখুন না ওইখানে, আমি এখন মাথা আঁচড়াচ্ছি।

পিসিমা কহিলেন,—মুখখানি তোমার শুকিয়ে আছে, আগেই খেয়ে নাও মা।

—না, পরে খাবো। আপনি রাখুন ওইখানে।

পিসিমা কহিলেন,—আচ্ছা আচ্ছা, তাই খেয়ো মা, এই রইল জল, পরেই খেয়ো, আমি ভাবছিলাম—বলিতে বলিতে তিনি সস্নেহ হাসি হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরিবারের মধ্যে অনেকেই ছিল, কিন্তু তাহারা কেহই নব-পরিণীতা বধূর ভাবগতিক বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। অথচ বলিবার এবং অভিযোগ করিবার কিই-বা আছে! মৃত্যু ও বেদনার মধ্য দিয়া এই মেয়েটি সকলের মধ্যে আসিয়াছে, ইহাকে নির্বিচারে যত্ন করিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে, ইহার দাবি, স্বাধীন ইচ্ছা এবং অবাধ অধিকার সকলকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। এই মেয়েটিকে সম্ভ্রম করিতে সকলেই বাধ্য।

কয়েকদিন পরে একদিন সুললিতা বলিল,—আচ্ছা এটা ত আমাদেরই ঘর?

প্রণবেশ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল,—হ্যাঁ, কি হ'ল? কেন বল ত?

—ভাঙা বাক্স আর বিছানাগুলো কা'র?

—ওঃ ওগুলো পিসিমার,—আজ ক'দিন থেকেই—

সুললিতা কহিল,—সরিয়ে নিয়ে যান্ উনি, শোবার ঘরের মধ্যে ওসব ছাই-পাশ আমি সইতে পারিনে। এখনি নিয়ে যেতে ব'লে দাও। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে আবার ঘুরিয়া আসিয়া অলক্ষ্য কাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল,—এত ভিড়ই বা এ বাড়ীতে কেন? কাজকর্ম্ম কবে চুকে গেছে, এবার সবাই আমাকে নিশ্বেস ফেলতে দিক্ বাপু।—এই বলিয়া সে সম্রাজ্ঞীর মতো উন্নত মস্তক লইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

প্রণবেশ মুখ ফিরাইরা এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বিধা-কুণ্ঠিত নিজের মুখখানা নিজেই অনুভব করিয়া সে একবার কোথাও নির্জ্জনে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যে শাসন সুললিতা এইমাত্র করিয়া গেল, তাহা না মানিয়া লইবারও কোনো উপায় নাই। বিপন্নের মতো প্রণবেশ ভাঁড়ার-ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

—পিসিমা?—দরজার পাশ হইতে সে ডাকিল।

পিসিমাও তাহাকে ডাকিলেন না, শুধু ভিতর হইতে বলিলেন,—কেন বাবা? কিছু বল্‌বি?

—বলছিলাম যে—বলিয়া প্রণবেশ একবার এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর কোনো রকমে কথাটা বলিয়াই ফেলিল,—তোমরা কি কালকেই যাওয়া ঠিক করলে পিসিমা ?

—কাল ত নয় বাবা, আজই—কথাগুলি ছাড়াও আর একটি শব্দ পিসিমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, সম্ভবতঃ সেটি তাঁহার তীক্ষ্ম হাসির একটি শিখা।

প্রণবেশ কহিল,—আজকেই।

—হ্যাঁ বাবা, আজকেই। সেখানে সংসার ফেলে এসেছি, না গেলে আর চলছে না। আমি গাড়ী ডাকতে পাঠিয়েছি বাবা।

গাড়ী আসিল। ছেলেপুলে সঙ্গে করিয়া পিসিমা বিদায় লইলেন। ইতিমধ্যে আর সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। বাকি ছিলেন ছোট মাসিমা, একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে লইয়া রাত্রের গাড়ীতে তিনি সেদিন কাশী রওনা হইলেন।

নারীর গোপন আত্মপরতা প্রণবেশের চোখ এড়ায় না, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল। অনাদর করিয়া সে ভুল করিবে না, অশ্রদ্ধা করিয়া সে অশান্তি আনিবে না,—চুপ করিয়া তাহাকে থাকিতেই হইবে। সুললিতাকে আগে তাহার রহস্যময়ী মনে হইয়াছিল, এখন দেখিল তাহা নয়, সে অতিরিক্ত স্পষ্ট, তাহাকে বুঝিবার জন্য চোখ খুলিয়া থাকিলেই হয়, পরিশ্রম করিতে হয় না।

তবু তৃপ্তি! মরুভূমির ভয়াবহতা কেমন, এ কথা প্রণবেশের চেয়ে আর কে বেশী জানে! তাই সে তৃপ্তি পাইয়াছে শ্যামলতার আস্বাদ পাইয়া। চক্ষু আর তাহার জ্বালা করে না, বরং একটি অলসতার আবেশে ভারী হইয়া আসে।

রাস্তায় বেড়াইয়া ঘুরিয়া আপন মনে টহল দিয়া বাড়ি ফিরিতে তাহার একটু রাতই হয়। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া সেদিন ঘরে ঢুকিল। ভাবিল, সুললিতাকে একটু চমকাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু কৌতুক করা আর তাহার হইয়া উঠিল না। জানালার ধারে সুললিতা বসিয়াছিল, মুখ ফিরাইয়া একবার তাহাকে দেখিল। তাহার উদাসীন মুখ দেখিয়া প্রণবেশের মুখের হাসি ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসিল, কোথায় যেন কি একটা খচ্ খচ্ করিয়া উঠিল।

জানালার ধার হইতে সুললিতা উঠিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। ক্ষানিকক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল এবং সেই অবস্থাতেই এক সময় জিজ্ঞাসা করিল,—চিঠিখানা ফেলা হয়েছিল ?

প্রণবেশের চমক ভাঙিল। বলিল,—ওই যা ভুলে গেছি, পকেটেই রয়ে গেছে। কাল সকালে উঠেই—

উত্যক্ত কণ্ঠে সুললিতা বলিয়া উঠিল,—কাল সকালে, কিন্তু আজ ত আর ফেলা হ'ল না ? কই, দাও আমার চিঠি, আমি ঝি-কে দিয়ে ফেলতে পাঠাবো।

প্রণবেশ নিঃশব্দে চিঠি বাহির করিয়া দিল। হাতে লইয়া সুললিতা কহিল,—খুলেছিলে ত ? নিশ্চয় খুলেছিলে!

—আমি ত অন্যের চিঠি খুলি না ?

—সত্যি বলছ ?

প্রণবেশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, মাথা হেঁট করিয়া কহিল,—হুঁ্যা।

সুললিতা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া অতি যত্নে চিঠিখানি নিজের মাথার বালিশের তলায় রাখিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

রাত জাগিয়া প্রণবেশের পড়াশুনা করা অভ্যাস। টেবিলের উপর আলোটা ঠিক করিয়া লইয়া সে চেয়ার টানিয়া বসিল। এই পড়াশুনা অনেক দিনের অনেক অবস্থা হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়াছে।

এমন সময় জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি খেয়েছ সুললিতা ?

সুলিলিতা তাহার এ কথার জবাব দিল না, বাঁ-হাত বাড়াইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কেবল কহিল,—খাবার ঢাকা আছে ও-কোণে, খেয়ো।

আর কেহ কোনো কথা কহিল না। শুধু টেবিলের উপর টাইমপিস ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল।

একখানি বই মুখের কাছে খুলিয়া প্রণবেশ কি করিতেছে তাহা সে নিজেই জানে না। হয়ত বইয়ের অক্ষরগুলির দিকে তাকাইয়া সে ভাবিতেছিল, এমনি করিয়াই তাহার প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি রাত কাটিবে। আলো জ্বলিতেই লাগিল, কিন্তু বই হইতে সে মুখ তুলিল না, হাত পা নাড়িল না, চোখের পলক ফেলিল না।

সুললিতা একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, তারপর কহিল,—ও বাড়ির মেজবৌটা আজ এসেছিল আমার কাছে···ছুঁড়ির কি অংখার গো, ও সব সাপের হাঁচি আমি চিন্‌তে পারি···আ-মর্। দিলাম আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে। আমি কারও তক্কা রাখিনে।

প্রণবেশ একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কিছু বলিল না। শুধু তাহার সত্যবাদী মন বলিয়া উঠিল, এ মেয়েটির অন্তরে আভিজাত্যও নাই, ঐশ্বর্য্যও নাই।

স্বামীর নিকট হইতে কোনো উত্তর এবং সমর্থন না পাইয়া সুললিতা একবার ভ্রূকুঞ্চন করিল, তারপর গুছাইয়া পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

অনেকক্ষণ পরে প্রণবেশ উঠিল। ঘরের এক কোণে খাবার ঢাকা ছিল, সরিয়া গিয়া খাবারের ঢাকা খুলিল, কিন্তু কি জানি, আহার করিবার তাহার রুচি ছিল না— সে আবার উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। অভিমান সে করিতে পারে কিন্তু করিবে কাহার উপর ?

বাহিরে অনেকক্ষণ পায়চারি করিয়া সে আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। আলোতে বোধ করি তেল ছিল না, ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছে। জানালার বাহির হইতে চাঁদের আলো স্পষ্ট হইয়া বিছানার উপর আসিয়া লাগিয়াছে। খাটের কাছে গিয়া প্রণবেশ দাঁড়াইল। সুললিতা এবার সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রণবেশের মনে হইল ঘুমাইলে তাহার মনের মালিন্য মুখের উপর ফুটিয়া উঠে না। মুখ তাহার সত্যিই সুন্দর। জানালাটা প্রণবেশ সবখানি খুলিয়া দিল। বাতাস আসিতেছিল না, হাত-পাখাখানি লইয়া যে সুললিতার মাথার কাছে বাতাস করিতে লাগিল। অনেক দুঃখ ও

অনেক গ্লানির ভিতর দিয়া এই মেয়েটি সে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, ইহার উপর কোনোদিন কোনো মুহূর্ত্তেই অভিমান করা চলিতে পারে না।

ভালবাসিয়া সে দুঃখ পাইয়াছে, এই মেয়েটিকে সে আর ভালবাসিবে না। প্রেম তাহার জীবনে মৃত্যু আনিয়াছে, অভিশাপ আনিয়াছে, কাঙালের মতো তাহাকে পথে পথে ঘুরাইয়াছে।

—স্ত্রী তাহার বাঁচে না বলিয়া আত্মীয়জন ও বন্ধুবান্ধবের কঠোর ইঙ্গিত সে সহ্য করিয়াছে,—ভাল আর সে বাসিবে না। স্ত্রীর সহিত তাহার এবারের সম্পর্ক হইবে প্রেমের নয়—মমতা, দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতির।

অনেকক্ষণ ধরিয়া বাতাস করিয়া প্রণবেশ খাটের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। আলোটা ইতিমধ্যে নিবিয়া গিয়াছে।

সংসারের কিছু কাজ না করিয়া সুললিতার উপায় নাই, নিতান্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। অথচ তাহাকে ছুটিয়া হাঁটিয়া চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে দেখিলে প্রণবেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। সতর্ক পাহারায় সমস্ত আঘাত হইতে সে তাহার স্ত্রীকে সাবধান করিয়া রাখিতে চাহে।

—কিন্তু তুমি উনুনের কাছে গিয়ে যেন বসো না সুললিতা।

—কেন?

—দরকার কি? যে চঞ্চল তুমি, কোন্ সময় যদি আঁচল ধরে যায়?

সুললিতা হাসিতে লাগিল, তারপর কহিল,—এ যে জেলের শাস্তি! উনুনের কাছে যাব না পাছে আঁচল ধরে যায়, কুটনো কুটতে বসবো না পাছে হাত কাটে, জল তুলতে যাবো না পাছে পা পিছ্‌লে পড়ে যাই,—সে দিন আর একটা কি বলছিলে? হ্যাঁ মনে পড়েছে, ছাতে বেড়াতে পারব না পাছে ঘূর্ণী হাওয়ায় ঘুরে পড়ে যাই! তাহ'লে কি করব বল ত সারাদিন?

বিদ্রূপ সুললিতা করিতে পারে, করিলে অন্যায়ও হয় না, কিন্তু প্রণবেশ ত জানে জীবনের অর্থ কি! একটি বিশেষ দৈব ঘটনার জন্য মানুষ বসিয়া আছে, কখন্ কেমন করিয়া কিরূপে সে-দৈব নিয়তির মতো মানুষের উপর আসিয়া পড়িবে তাহার কোনো স্থিরতাই নাই।

কিয়ৎক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল,—বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে?

সুললিতা কহিল,—কি ভাগ্যি!

প্রণবেশ বলিল, প্রতাপবাবুর বাড়ীতে কীর্ত্তন আছে, চল আজ শুনে আসি।

সন্ধ্যার সময় সেদিন তাহারা দুইজনে সত্যই বাহির হইল। কাসারীপাড়ায় কোথায় কীর্ত্তন হইতেছে, সেইখানে গাড়ী করিয়া তাহারা আসিল। বাল্যকাল হইতে প্রণবেশের কীর্ত্তন শুনিবার সখ।

ভিতরে কীর্ত্তন বসিয়াছে কথক ঠাকুর 'দোয়ার' সঙ্গে লইয়া আসরের মাঝখানে বসিয়াছেন। পালা মাথুরের। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রার সময় শোকার্ত্ত ব্রজবাসীর করুণ

বিলাপ সুরু হইয়াছে। উদ্ধব আনিয়াছে সংবাদ, অক্রূর আনিয়াছে রথ। আসন্ন প্রিয়বিরহে বিবশা ব্যাকুল শ্রীমতী ধূলায় ধূসরিতা। কথক ঠাকুর মধুর কণ্ঠে ও সুললিত ভাষায় সমস্ত বর্ণনা করিতেছেন।

নিস্তব্ধ আসরে সকলেই উদ্বেলিত অশ্রুতে কীর্ত্তন শুনিতেছিল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সুন্দর কথকতায় মুগ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে চোখের জল মুছিতেছিল।

প্রণবেশের নিঃশ্বাসও ভারী হইয়া আসিয়াছিল, তাহার মন বড় নরম। অনেকক্ষণ এমনি করিয়া শুনিতে শুনিতে এক সময় পিঠে চাপ পড়িতেই সে ফিরিয়া তাকাইল। একটি ছোট ছেলে তাহাকে ডাকিতেছিল। ছেলেটি তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া দরজার দিকে দেখাইয়া কহিল,—আপনাকে ডাকছেন।

প্রণবেশ কহিল,—কে?

—ওই যে, উঠে আসুন না?

শ্রোতাদের ভিতর হইতে অতি কষ্টে পথ কাটিয়া প্রণবেশ উঠিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, দরজার কাছে সুললিতা দাঁড়াইয়া। মুখে কাপড় চাপা দিয়া কোনও রকমে সে তখন হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল।

প্রণবেশকে দেখিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া সে বলিল,—কি জায়গাতেই এনেছিলে বাপু, হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দম আট্‌কে যাচ্ছিল। যে-দিকেই তাকাই, সবাই ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করছে। কাঁদবার জন্যে এরা সবাই তৈরী হয়ে এসেছিল!

আবার সে হাসিতে লাগিল।

প্রণবেশের চোখে তখন জলের রেখা মিলায় নাই। সে শুধু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আর একটু শুনে গেলে হ'ত না?

—না, আর এক মিনিটও নয়, এখুনি চল। মানুষের কান্না শোনবার জন্যে ত' আর বেড়াতে বেরুনো হয়নি!

অগত্যা প্রণবেশ তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিল। ফুট্‌পাথের উপর এক জায়গায় সুললিতাকে দাঁড় করাইয়া সে গাড়ী ডাকিতে গেল। পথের অন্ধকারে তাহার মুখের চেহারাটা কি রকম হইয়াছিল তাহা বুঝা গেল না। কীর্ত্তন শেষ হইবার আগেই তাহাকে উঠিয়া আসিতে হইয়াছে এজন্য সে দুঃখিত নয়, কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, সুললিতার অকরুণ ও হৃদয়হীন হাসিটা তখনও তাহার মনের মধ্যে আগুনের ঢেলার মতো নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। বিয়োগান্তর ভালবাসা যে-নারীর মনে রেখাপাত করে না, করুণ রস যাহার নিকট নিতান্তই বিদ্রূপের বস্তু, হৃদয়ের কোমল বৃত্তির পরিচয় যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও নাই—সে নারীর বোঝা চিরদিন সে বহিবে কেমন করিয়া? ভয়ে প্রণবেশের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

গাড়ীতে বসিয়া কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছিল না, কেবল এক একবার সুললিতা কীর্ত্তনের আসরের দৃশ্য স্মরণ করিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিতে লাগিল!

সে-রাত্রে প্রণবেশ স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারে নাই।

বাড়ীতে অনেক দিন হইতে তাহাদের কয়েকটি পাখী পোষা ছিল। নীচে ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে মনুয়াপাখীর একটা বড় খাঁচা অনেকদিন হইতেই এ বাড়ীতে রহিয়াছে। পাখীগুলি প্রণবেশের আদরের। সুললিতা ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের নিয়মিত আহার পরিবেষণ করিবার ভার লইয়াছিল।

সে-দিন উদ্বিগ্ন হইয়া আসিয়া প্রণবেশ কহিল,—ইস্ ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, পাখীগুলোর কি অবস্থা হয়েছে দেখেছ সুললিতা?

সুললিতা একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—ওঃ, ওদের ক'দিন খাবার দেওয়া হয়নি বটে। চল যাচ্ছি।—বলিয়া সে নিতান্ত উদাসীনের মতো বিছানা গুছাইয়া খাবার লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, দুই তিন দিন অনাহার সহিতে না পারিয়া পাঁচ ছয়টি পাখী ইতি-মধ্যেই মরিয়া গিয়াছে, বাকী কয়েকটি ধুঁকিতেছে।

প্রণবেশ তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া ধীরে ধীরে একটা বড় নিঃশ্বাস শুধু ফেলিল, কথা কহিল না।

সুললিতা বলিল,—বাবারে, কী ক্ষীণজীবী এরা। দু-দিন খাবার দিতে মনে নেই তা'তেই একেবারে বংশলোপ। ধন্য।

প্রণবেশ তবুও কথা কহিতেছে না দেখিয়া সে বলিল,—এত শিগগির যখন এরা নষ্ট হয় তখন এদের দাম অল্পই। কাল দুটো টাকা দেবো, গোটাকয়েক পাখী আমায় এনে দিয়ো।

প্রণবেশ চুপ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

এমনি করিয়াই তাহাদের দিন চলিয়াছিল।

স্বার্থান্ধতার স্পষ্ট রূপ দেখিয়া প্রণবেশ শিহরিয়া উঠিয়াছে, মনের দৈন্য ও দারিদ্র্যের ভয়াবহ পরিচয় পাইয়া ভিতরে ভিতরে তাহার অসহ্য হইয়াছে, অসঙ্গত দাবি ও অনধিকার মন্তব্য শুনিয়া সে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু ফাটিয়া পড়িবার সাধ্য তাহার ছিল না। নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্য তাহাকে প্রতিদিন যন্ত্রণা দিতেছিল, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে, মার্জ্জনা তাহাকে করিতেই হইবে।

এমনি করিয়াই তাহাদের দিন চলিতেছিল।

শরৎকালের ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়টাই সুললিতার একদিন গা গরম হইল। অতিরিক্ত জল ঘাঁটা তাহার অভ্যাস, তাই ঠান্ডা লাগিয়াছে। সারাদিন সে কিছু খাইল না, শুইয়া বসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দিন তিনেক পরে সে আর লুকাইতে পারিল না, গা তাহার পুড়িয়া যাইতেছে। মুখ চোখ লাল হইয়াছে, গা ভারী, মাথা তুলিতে পারিতেছে না। ধীরে ধীরে আসিয়া সে বিছানা লইল। বিছানায় শুইয়া সে চোখ বুজিল।

প্রণবেশ তাহার দিকে চাহিয়া এক সময় একটু হাসিল। সে-হাসি সুললিতা দেখিতে পাইল না, পাইলে বুঝিত এ-হাসির সহিত পরিচয় তাহার অতি অল্প। কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া প্রণবেশ দেখিল, ভয়ানক গরম। তারপর কহিল,—নিশ্চয় তোমার বুকেও সর্দি বসেছে, নয়? গলাটা ঘড়-ঘড় করছে ত? সে ত করবেই, আমি জানতাম!

সুললিতা রাগ করিয়া কহিল,—বুকে আমার সর্দি বসেনি!

—বসেনি? আশ্চর্য্য!—বলিয়া প্রণবেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর আবার একটু হাসিয়া গায়ে জামা ও পায়ে জুতা দিয়া সে ডাক্তার ডাকিতে গেল।

ডাক্তার তাহার পরিচিত। দেখা করিয়া সে কহিল,—আর একবার এলাম আপনার কাছে, ডাক্তারবাবু!—এই বলিয়া সে হাসিয়া একেবারে আকুল হইল।

ডাক্তার কহিলেন,—কি হ'ল?

—প্রথমে যা হয়, জ্বর; তারপর যা হয়, সর্দ্দি; সর্দ্দির পর যা হয় তা আপনি জানেন! জ্বর বোধ হয় এখন দু-তিন ডিগ্রি, পাঁচ ডিগ্রিও হ'তে পারে! কোনো ভুল হয়নি ডাক্তারবাবু, ঠিক পথেই চলছে!

ডাক্তার কাছে আসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—অত ভয় কিসের, জ্বর বই ত কিছু নয়। চলুন।

মোটরে করিয়া ডাক্তারবাবু আসিলেন।

রোগী দেখিয়া তিনি খানিকক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না। মনে হইল তিনি যাহা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন তাহা নয়। এ জ্বর অন্য জাতের। এ জ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, সামান্য সেবায় ইহা শান্ত হয় না।

ঔষধ লিখিয়া তিনি যখন উপদেশ দিতে দিতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন প্রণবেশ বলিল,—রোগটা শক্ত হলেও বেঁচে যাবে, কি বলেন?

কণ্ঠস্বর শুনিয়া ডাক্তারবাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে তাকাইলেন, তারপর কহিলেন,—ভাল ক'রে দেখাশুনো করবেন, এমন আর কি ভয়ের কারণ আছে!

ভয়ের কারণ থাকিলে ভাল হইত কিনা তাহা প্রণবেশ একবার চিন্তা করিয়া দেখিল। তারপর কহিল,—বুঝলেন ডাক্তারবাবু, আপনি-ত সবই জানেন আমার, এবার আমি বিয়ে ক'রে অন্যায়ই করেছি, না করলেই পারতাম। আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইলেন, তারপর চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—একটু চোখে চোখে রাখলেই সেরে যাবে, এমন কিছু কঠিন রোগ নয়!

—নয়?—প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করিল।

—বিশেষ না!

ডাক্তার যখন চলিয়া গেলেন, তখন রাত হইয়াছে। প্রণবেশ ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সুললিতা জ্বরে অচেতন হইয়া চোখ বুজিয়া আছে। প্রণবেশ

নিঃশব্দে তাহার মাথার কাছে আসিয়া বসিল। মাথার মধ্যে তখন তাহার ঝড় বহিতেছিল।

এই নারীটির সেবা করিয়া, যত্ন করিয়া ইহাকে ঔষধপত্র খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া তুলিতেই হইবে। মৃত্যু আর সে চাহে না, সে জীবন ভিক্ষা করিতে চাহে। এই নারীটির চরিত্রে শত দৈন্য ও শত অন্যায়ের সন্ধান সে পাইয়াছে, এই নারী বাঁচিয়া থাকিলে তাহার সমস্ত জীবন দুর্বিষহ বোধ হইবে, প্রতিটি দিন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া উঠিবে, প্রতি মুহূর্তে তাহার মন ক্লেদাক্ত হইয়া উঠিতে থাকিবে—তবু সে বিধাতার কাছে ইহার জীবন ভিক্ষা চাহে। চিরদিনের অশান্তির অসহ্য বেদনায় তাহার বুক ভাঙিয়া যাক—তবু সে সুললিতার মৃত্যুকামনা করে না। সুললিতা বাঁচুক, বাঁচুক,—ভগবান, সুললিতাকে তুমি বাঁচাও।

সিংহাসন

বোম্বাই সাণ্ডহার্ষ্টে কয়েকঘর বাঙালীর বাস। পাড়াটি ছোট, তবু সিভিলিয়ান্ থেকে আরম্ভ করে' মাছিমারা কলের কেরাণী পর্য্যন্ত সবাইয়েরই মুখ দেখা যায়।

ছোট বাই-লেনটার মোড়ের বাড়ীটার আকর্ষণ অন্য রকম। নীচের তলাটায় একঘর দরিদ্র পাশী পরিবার ভাড়া থাকে। দোতলার একদিকে থাকে সস্ত্রীক এক মারাঠি ভদ্রলোক; আর একদিকে আমাদের মিণ্টার। মিণ্টারের পুরো নাম এ-এন চৌধুরী।

জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার। বয়স আন্দাজ বছর তিরিশ। সুপুরুষ। চোখ দুটো একটু কটা। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথার চুলগুলি তামাটে রংয়ের। ধুতি-পাঞ্জাবী পরাটাকে সে মনে করে তার গর্ব্বের পক্ষে হানিকর। একদিকের সমস্ত ফ্ল্যাট্‌টা ভাড়া নিয়ে সে একাই থাকে।

জাহাজে সে যখন বেরোয়, পনেরো দিন আর তার তল্লাস পাওয়া যায় না। এমনও হয়েছে, দু'মাস তার দেখা নেই। জাহাজে চড়ে' বৃহৎ পৃথিবীর দিকে সে যে মাঝে মাঝে কোথায় ভেসে পড়ে, তার আর ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না।

এডেন-এ গিয়ে একবার সে এক আরবী দস্যুকে ধরিয়ে দিয়েছিল। মাল্‌টায় গিয়ে কবে এক সময় সে ওখানকার আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্গার দেখে এসেছে। গত বৎসর এমনি সময়টার মার্সাইতে নেমে সে কিছুদিনের মতো ফ্রান্সের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। দুনিয়াটাকে নিয়ে নিজের ইচ্ছামতো সে খেলা করে।

সম্প্রতি জিব্রাল্‌টার থেকে সে দিন-তিনেক আগে ফিরেছে। ছুটি এখন তার অবাধ, অন্ততঃ কিছুদিনের মতো ত বটে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার ফ্লাট্। সবশুদ্ধ খান সাতেক ঘর। একটি মাত্র মানুষ সাতখানা ঘরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকে। অল্পের মধ্যে সংকীর্ণতায় কোণঠাসা হয়ে থাকা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। রাত্রে নিদ্রা-জড়িত দেহ দিয়েও সে কোনো কোনোদিন সাতখানা ঘরের মধ্যে একবার ছুটে গিয়ে পায়চারি করে' আসে। অথচ যেমন তার রাসভারি, তেমনি সে গম্ভীর।

আরদালি আছে, বাবুর্চ্চি আছে, একটা তৈলঙ্গী চাকরও আছে। সমস্ত দিনে অন্তত বার-দশেক তার খাবার আসে। রান্নাঘরটি তার হিন্দু-মুসলমানের মিলন-ক্ষেত্র।

অফিস ঘরে বসেছিল একখানা 'বম্বে ক্রনিকেল্' হাতে নিয়ে। টেবিলের কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সাময়িকপত্র—সায়েণ্টিফিক আমেরিকান্, হুইল, পপুলার সায়েন্স প্রভৃতি।

চায়ের পেয়ালাটা খালি, আর একটা ডিস-এ গোটাচারেক পরিত্যক্ত আঙুর, এক কুচি কলা, এক ডুমো নাশপাতি। বর্ম্মা চুরুটটা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় অ্যাশ-ট্রের ওপর রাখা। বেলা আন্দাজ তিনটে।

একটি কালো রোগা হ্যানো ছোক্‌রা, বয়স আন্দাজ পঁচিশ, একটি ধুতি ও পিরাণ পরণে,—অত্যন্ত বিনীত পদক্ষেপে সন্ত্রস্ত হয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। নিতান্তই বাঙালীর ছেলে। মুখে কোনো বিশেষ ছাপ নেই। জনসাধারণেই ভিতরকার একখানি মুখেরই মতো। নাম নরেন।

কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে মিষ্টার বল্‌ল—তিনবার তোমাকে ডেকেছি, একবারো শুনতে পেয়েছ?

মাথা হেঁট করে' ছেলেটি বল্‌ল—আজ্ঞে না।

ছিলে কোথায়?—কাগজটা সরিয়ে রেখে সোজা হয়ে মিষ্টার বসলো, ফ্যাক্টরী আজ বন্ধ, কোথায় আড্ডা মারতে গিয়েছিলে? অনুগ্রহের ওপর যে থাকে, তার এত বাড়াবাড়ি কেন? হাড়িডোমের মতন চেহারা নিয়ে যেখানে সেখানে বসতে লজ্জা করে না? কোথা গিয়েছিলে শুনি?

ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে নরেন বল্‌ল—ওপরে।

ওপরে? ওপর ত ফাঁকা! একা কি করছিলে সেখানে?

একজনরা নতুন এসেছেন, তাই—

কে? কে এসেছেন? হুইজ হি? হোয়াট ইজ হি?

রাগ আর মিষ্টারের পড়তে চায় না।

নরেন বল্‌ল—তিনি রায় বাহাদুর, খুব ভালো লোক।

রায় বাহাদুর! ড্যাম ইউ! কই দেখি কেমন লোক, চল। আমার লোককে কন্‌ফাইন করে' রাখার তাঁর কী অধিকার! চল!

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সরু বারান্দাটা পার হয়ে মিষ্টার তেতলার সিঁড়িতে উঠ্‌তে লাগল। নরেন ছিল তার পিছনে পিছনে।

তেতলায় উঠে ডান হাতি দরজায় পরদা টাঙানো। সাড়া দিতেই ভিতর থেকে জবাব এল। গর্ব্বিত পদক্ষেপে মিষ্টার ভিতরে ঢুকতেই রায় বাহাদুর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

আসুন।

নরেন পিছনে দাঁড়িয়েছিল। মিষ্টার একবার ঘরের চারিদিকে ভাল করে' তাকাল। বাঙালীর গৃহস্থালীর সঙ্গে তার তেমন পরিচয় ছিল না।

রায় বাহাদুর সস্নেহ হেসে বল্‌লেন—বসুন।

সশব্দে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে মিষ্টার বসলো; সে শব্দটা এমনিই যে পাশের ঘরের অস্ফুট কথাবার্ত্তা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

বসে পড়ে' গলাটা ঝেড়ে মিষ্টার বল্‌ল—ভেবেছিলাম আপনি বাঙালী নন।

নরেন তার কণ্ঠস্বর শুনে এবার একটু স্বস্তি অনুভব করলো। মহেশবাবু সুন্দর

একটুখানি হেসে তার কথার জবাব দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বল্লেন—বসো হে নরেন! দাঁড়িয়ে রইলে যে?

মিষ্টার একটুও ভূমিকা না করে' বলল,—নরেন বোকার মতো এসেছিল এ দেশে, একটি পয়সাও হাতে ছিল না। একটা কাজ আমি ওকে দিয়েছি, এখন য়্যাপ্রেনটিস্—আমার কাছেই থাকে।

সে যেন খুব বড় একটা অনুগ্রহ নরেনের ওপর করেছে! মহেশবাবুর কানে কথাগুলো বিসদৃশ ঠেক্ল।

—ভেবেছিলাম ভাল ছেলে, কিন্তু অত্যন্ত অকর্ম্মণ্য, ফাঁকিবাজ,—ওকি এতক্ষণ আপনারই এখানে বসেছিল?

মহেশবাবু বললেন—কল্কাতায় আমার পরিচিত লোকের ছেলে, চেনাশোনা হল. একটু আলাপ করছিলাম,—আপনার বুঝি ওকে নৈলে চলে না?

চলে কিন্তু ওকে আমি সকল সময়েই কাজ করাতে চাই! বয়সে অত কুড়ে হ'লে—

পাশের দরজাটার পরদা এবার একটু সরে' গেল। এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে একটি তরুণী মেয়ে স্মিতমুখে ভিতরে ঢুকে পেয়ালাটি মহেশবাবুর কোলের কাছে রাখ্ল। মিষ্টার সুমুখে বসে আছে সেদিকে সে গ্রাহ্যই করল না, বাইরের দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্ল—নরেনবাবু, ভেতরে আপনার চা রয়েছে, মা ডাকছেন, আসুন।

মেয়েটি চলেই যাচ্ছিল, মহেশবাবু বললেন—এখানে আর এক পেয়ালা দিতে হবে, ললিতা।

মিষ্টার এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বল্ল—থ্যাঙ্কস, আমি চা খেয়ে এসেছি—তারপর উঠে কয়েক পা এগিয়ে এসে পুনরায় বল্ল—শুনতে পেলে না? ভিতরে যাও! হাঁ করে' বোকার মতো পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নরেন ললিতার দিকে তাকিয়ে আহত পক্ষীর মতো মুখের একটা শব্দ করল মাত্র! খট্ খট্ করে' জুতোর শব্দ করতে করতে মিষ্টার নীচে নেমে গেল।

নেমে এসে সে আবার চেয়ারে বসলো। মনে হল, ওই 'আগুলি' কালো বাঁদর-মুখো ছেলেটাকে লোকে বাড়ীর ভিতর ঢুকতে দেয় কোন্ রুচিতে? স্টুপিড্, ফুল! দেখলে যাকে ঘৃণা করে, তাকে সস্নেহে কি কেউ ভিতরে ডাকতে পারে?

নিজের সম্বন্ধে মিষ্টার অত্যন্ত সচেতন। ওখানকার ভদ্রসমাজে তার অবাধ যাতায়াত। সাহেব-সুবো তার বন্ধু। ধনী বোম্বাইওয়ালা ও সমৃদ্ধ পার্শী জমিদাররা তার হাত ধরা। বড় বড় হোটেলে তার নিমন্ত্রণ প্রায় লেগেই আছে। মোটর ছাড়া সে এক পাও চলে না। লাট সাহেবের ডিনার পার্টিতে নাকি যোগ দেবার জন্য তার কাছে দু' একবার পত্র এসেছিল।

বিধাতা তাকে রূপ দিয়েছিলেন, স্বাস্থ্য ছিল তার অটুট। বিদ্যা বুদ্ধিতে সে

অনেকের অগ্রণী। জীবনে উন্নতি করবার সকল মূলধন-গুলিই তার ভাঁড়ারে মজুত ছিল।

আর নরেন!

একটি বিদ্রুপের হাসি মিষ্টার আর চাপতে পারে না। আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রং, তোবড়ানো দুটো গাল, কালো জামের মতো দুটো বিসদৃশ চোখ; রোগা,—গায়ের হাড়গুলি একটি একটি করে' গোণা যায়, হাত-পায়ের আঙুলগুলো শিকড়ের মতো—মুখখানা রং-চটা। লেখাপড়া বল্‌তে গেলে জানেই না, অল্পবুদ্ধি, অনভিজ্ঞ, অকর্ম্মণ্য, উপার্জ্জনে অক্ষম। জীবনে কোনো উচ্চ আশা নেই। ক্ষুদ্র, অবজ্ঞাত!

পৃথিবীর একটি ব্যর্থতম জীব!

নিতান্তই অনুগ্রহপ্রার্থীর মতো একটি পাশ থেকে নরেনের দিন কাটে। ঔদ্ধত্যের কাছে সে যেন মূর্ত্তিমান বিনয়।

ও কি হচ্ছে? অমনি করে' চিঠির কাগজ ভাঁজ করে? তুমি যদি লেখাপড়া জানতে, ওতে তোমার চিঠি লেখা চল্‌তো, আমার চলবে না। বাজার ফর্দ্দের কাগজে চিঠি লেখাটা ভদ্রতা নয়।

কথার কি তীব্রতা! নরেন বলে—একটু ভুল হয়ে গেছে, আচ্ছা আমি ঠিক করে' দিচ্ছি।

ভুল যা, তা ভুল। তাকে আর সারানো চলে না।

সে দিন সিঁড়ির মুখে দু'জনে দেখা। মিষ্টার তাড়াতাড়ি নামছিল।

কোথা ছিলে এতক্ষণ?

এই একটু,—এই বাজারের দিকে।

কেন?

দু' একটা জিনিস কেনবার জন্যে।

কে আনতে বললে?

থতমত খেয়ে নরেন বলল—আমার নিজেরই, আনতে বলেনি কেউ।

হুঁ, ওই যে পকেটে, ওটা কি বেরিয়ে রয়েছে, বার কর দেখি?

বার করবার পর দেখা গেল, এক শিশি সুগন্ধী তেল, এক শিশি এসেন্স, খান-দুই সাবান, দু-একটা জিনিস সে অতি কষ্টে জামার ভিতর লুকিয়ে রাখল।

এ সমস্তই তোমার? মিষ্টারের চোখ দুটো আগুন হয়ে উঠেছিল।

না, সব আমার নয়। মহেশবাবুদের কিছু কিছু আছে।

তুমি অন্যের কাজ করবে, অন্যের বাজার করে' আনবে, কি সর্ত্তে? তোমার একটু অপমান বোধ নেই?

নরেন ধীরে ধীরে বল্‌ল—এতে অন্যায় মনে হয় নি।

তা মনে হবে কেন? ভগবান তোমায় গণ্ডারের চামড়া দিয়েছে সে কি এত সহজে বেঁধে?

এমন সময়ে উপরের সিঁড়ি থেকে ললিতার স্পষ্ট গলার আওয়াজ এল—নরেনবাবু, শিগ্‌গির চান্‌ করে' আসুন, আপনার আপিসের যে বেলা হয়ে যাচ্ছে।

ললিতা গলা বাড়িয়ে ছিল, তিনজনেই একবার চোখাচোখি হলো; ললিতা তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে' গেল।

মিষ্টারের রাগ কেমন জানি একটু শান্ত হয়ে এল। বলল—আজকাল বুঝি ওপরে ও'দের কাছেই খাওয়া হয়? আমার রান্নাঘর বয়কট করলে কবে থেকে?

ও'রা যেদিন থেকে এসেছেন সেদিন থেকেই আমি—

আই সী। আমি ত আর তোমার খবর-টবর রাখি না, কেমন করে' জান্‌ব বল। অল্‌ রাইট।

মিষ্টার তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

বিকাল বেলা ফিরে এসে মিষ্টার আবার চেয়ারে বসলো। বয় এসে টেবিলের উপর চা ও খাবার রেখে দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—তার হুঁসই নেই। হাত পা ধোবার গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কলার নেকটাই অন্তত ইতিমধ্যে খুলে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করল না।

অনেকক্ষণ পরে উঠ্‌ল, বাইরে এল, বাথ্‌রুমের পাশে যে ছোট অন্ধকার ঘরটি,—ওই ঘরটিতেই নরেন কায়ক্লেশে রাত কাটায়—মিষ্টার সেই ঘরটির মধ্যে এসে দাঁড়াল। কেন? কেন তা সে নিজেই জানে না। দেখ্‌ল ঘরের মধ্যে ভাঙা একটি আধখোলা টিনের বাক্স, একখানি অল্পদামের পুরোনো বিলাতী কম্বল, বালিশের বদলে কয়েকখানি খবরের কাগজ রোলার করে' একটি ফালি দিয়ে বাঁধা, সামান্য কিছু চিঠি লেখার সরঞ্জাম—এ-ছাড়া ঘরটির মধ্যে আর কিছু নেই। দারিদ্রের চিহ্ন ঠিক নয়—একটি অখণ্ড বিরক্ত।

আজ সমস্ত দিন ধরে' একটি অতৃপ্তি তার সারা দেহের কোণে কোণে বাসা বেঁধেছিল। অনুক্ষণ রি রি করে' শরীরে যেন জ্বালা ধরেছে। এই যার গৃহসজ্জা, এমনি যার জীবন যাত্রা, অর্বাচীন অপোগণ্ড ওই কালো ছেলেটার জন্য এই গৃহস্থটির এত মাথা ব্যথা? যার কোনো পরিচয় নেই, আভিজাত্য নেই, জীবনে যার কোনো শৃঙ্খলাই নেই, এই বিদেশে যে একমুঠো অন্নের কাঙাল—সেই হ'ল এত বড় ক্ষমতার অধিকারী?

মিষ্টার নিজের ঘরে এসে বসলো। কিন্তু বসে' থাকতে সে পারল না। চাবুক মেরে কে যেন তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিল। তার অহঙ্কারে কে যেন প্রচণ্ড আঘাত করেছে।

নীচে নেমে সে রাস্তায় এল। তার নিজের ছোট মোটরখানি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' আজ প্রথম সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে হাঁটতে সুরু করল। হেঁটে হেঁটে আজ সে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেল্‌বে। আজ সে শুধু আহত হয়নি, ক্ষুব্ধ হয়নি, আজ সে নিতান্তই বিপন্ন। তার আত্মসম্মান পর্য্যন্ত আজ বিপদগ্রস্ত।

রেলের পুল পার হ'ল, বাবুলনাথের মন্দির ছাড়ালো, কয়েকটা বড় বড় হোটেল পিছনে রইল—সে এল সোজা একেবারে সমুদ্রের তীরে। এদিকটা বন্দর নয়, বেড়াবার জায়গা। বাঁ দিকে বহুদূরে ডকগুলি দেখা যাচ্ছে—জাহাজে ডিউটিতে যাবার তার আর বিশেষ দেরি নেই—দিন ফুরিয়ে এসেছে।

সমুদ্রের তীর বহুদূর পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে ঘুরে গেছে। অপরাহ্ন শেষ হয়েছে। দিকচক্ররেখাহীন মহাসমুদ্র চারিদিকে থৈ থৈ করছে। ঢেউগুলি একটু মন্থর। ফিকে সবুজ আর সোনালী আলোয় মেশানো ছলছলে জল। আকাশটা ঠিক নীল নয়, একটু ঝাপসা,—সূর্য্যের কয়েকটা রাঙা রশ্মি আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ঝড়ো হাওয়া বইছে হু হু করে'।

সমুদ্রের দিকে মুখ করে' বহুসংখ্যক বেঞ্চি সাজানো। মেয়ে, পুরুষ, বোম্বাই, মারহাটি, গুজরাটি, তৈলঙ্গী, পার্শী—বহু জাতের অগণন নর-নারী জটলা ক'রে বসে রয়েছে। ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে মিষ্টার তাদের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

এই যে আপনি কতক্ষণ?—রায় বাহাদুর নমস্কার করে' সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মিষ্টার বল্‌ল—এই মিনিট কয়েক। একটু ঘুরতে এসেছিলাম এইদিকে।

নরেন আর আত্মগোপন করতে পারল না। একটু সরে যেতেই ললিতা ও তার মা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহেশবাবু বললেন—ভাল করে' আপনার সঙ্গে আলাপ করা হয়নি সেদিন। নরেন আপনার প্রশংসা করছিল।

মিষ্টার বল্‌লে—ভুলেই গেছি, সামাজিক আলাপ পরিচয় ওসব আর আসে না। চিরকালের জন্যেই দলছাড়া।—নরেনের দিকে সে একবার তাকাল। মেয়েরা তখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন।

আচ্ছা, আসি এখনকার মতন—বলে' মিষ্টার একটি প্রতিনমস্কার করে' তৎক্ষণাৎ ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভয়চকিত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে নরেনের কানদুটো তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে।

সে রাত্রে সহজে মিষ্টারের চোখে ঘুম এল না। তার জীবনটা সত্যি অদ্ভুত। তার কোনো সমাজ নেই, ধর্ম্ম নেই শিকড় নেই, আত্মীয় স্বজন পরিজন কোথাও কিছু নেই,—বিদেশে বিভুঁয়ে নির্ব্বান্ধব অবস্থায় এতগুলি বছর তাকে কাটাতে হয়েছে। তাকে কেউ ভালোও বাসেনি, ঘৃণাও করেনি ; কাছেও টেনে নেয়নি, তাচ্ছিল্যও করেনি ; তার জীবন সুখকরও নয়, দুর্ব্বহও হয়ে ওঠেনি। সমস্ত বয়সটা খুঁজলে একটিমাত্র নারীর আস্বাদও নেই, একটিমাত্র পুরুষের বন্ধুত্বও নেই। নিজে সে ছন্নছাড়া নয়, কিন্তু কোথাও কোনো শৃঙ্খলাও নেই। তার দিন কেটেছে। সে ভবঘুরে নয়, কিন্তু সংসারচ্যুত!

আলোটা জ্বলছিল, সেই দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগ্‌ল তার মুখের চেহারাটা কেমন। তার কি কোনো আকর্ষণ নেই, সে কি কারো মোহ আনতে পারে না? এই

পৃথিবীর দিকে দিকে যে স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, মোহ ভালবাসার শোভাযাত্রা চলেছে—এর মধ্যে তার কি কোনো স্থানই নেই ?

আস্তে আস্তে সে উঠ্‌ল, ঘর থেকে অনভ্যস্ত নগ্নপদে সে বাইরে এল, বারান্দায় এসে দেখ্‌ল, নরেনের ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। এত রাতে তার ঘরে আলো ? এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বল্‌ল—কি হচ্ছে হে এত রাতে ?

হাতের বইটা বন্ধ করে' নরেন বল্‌লে—এই একটু পড়ছিলাম। কিছু বলছেন ?

মিষ্টার বল্‌ল—না, এমনি দেখতে এলাম। এত রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকো কেন ?

নরেন উঠে বসলো,—এইবার শোবো।

মিষ্টার বলল—তোমার কাজকর্ম্মে একটু অবহেলা এসেছে দেখতে পাচ্ছি, কেন বল ত' ? এসব ভালো নয়—বুঝলে ? যাকে পরিশ্রম করে খেতে হয়, তার পক্ষে ভদ্রতা সৌজন্য রাখা অচল। ও'দের নিয়ে তোমার এখন নেশা ধরেছে, ও'রা যখন চ'লে যাবেন তখন তোমার সকল কাজে অনিচ্ছা এসে যাবে। সমস্ত উৎসাহ তোমার ফুরোবে।

নরেন একটু মৃদু প্রতিবাদ করে' বল্‌ল—তা ত নয়, আমি—

তাই, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। ও'দের কথা আলোচনা করা—এ মাখামাখির ফলাফল বড় খারাপ। ও'রা বড়লোক, ওদিক দিয়েও তোমার বিশেষ সুবিধে হবে না। এই আমি শেষ কথা বলে রাখলাম। আমার হাতে থাকতে গেলে তোমাকে ও'দের ত্যাগ করতে হবে।

শেষের দিকটায় গলার আওয়াজে জোর দিয়ে মিষ্টার আবার চ'লে গেল।

বিছানায় শুয়ে সে সত্যই আনন্দ বোধ করল। রায় বাহাদুরের পরিবার থেকে সে তাকে বিচ্ছিন্ন করে' আন্‌তে পেরেছে—এই তার পরম তৃপ্তি। সে-রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুমুতে পেরেছিল।

দিন তিনেক বাদে সেদিন দুপুর বেলা সে কোথায় গিয়েছিল, ফিরে এসে শুনলো, নরেন আজ কাজে বেরোয়নি।

কেন ?

আরদালিটা বল্‌ল—সকাল বেলা তিনি ওপরে উঠেছেন, এখনও নামেননি।

রাগে একেবারে মিষ্টার অন্ধকার দেখল। কাজে যদি নরেন কামাই করে, লজ্জা যে তারই। কর্ম্মঠ, তৎপর এবং নিয়মানুবর্তী ব'লে সে যে নরেনের সম্বন্ধে পরিচয়-পত্র দিয়েছে। তার সম্মান বজায় থাকবে কেমন করে' ?

বোলাও উস্‌কো।

আরদালি ছুটলো কিন্তু মিনিট কয়েক পরে এসে জানালো, সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

জামা কাপড় না ছেড়ে মিষ্টার নিজেই গেল। হন্ হন্ করে' ওপরে উঠে গিয়ে ডাকল—মহেশবাবু ?

বার দুই ডাকবার পর দরজাটা খুলে গেল। ললিতা বেরিয়ে এসে বল্‌লে—মহেশবাবু নেই।

নেই? দরকার ছিল যে!

দরকার ছিল বল্লেই কি তাঁকে থাকতে হবে?

তা নয়—মিষ্টার বল্‌লে—আমি শুধু দরকারের কথাটা বলছি।

গোপনীয় বা লজ্জাকর যদি না হয় আমাকে বলুন।

মেয়েটির কণ্ঠে সে কী দৃঢ়তা। মিষ্টারের রাগ যেন উবে গেল।

সোজা হ'য়ে মিষ্টার বল্‌লে—নরেন কোথায়? এখানে আছে?

কি দরকার তাকে বলুন?

কি দরকার সেটা আপনার কাছে না বললেও চলবে। তার এত বড় স্পর্দ্ধা, এতখানি সাহস কবে থেকে হলো যে, আমাকে লুকিয়ে পালিয়ে এসে এখানে আড্ডা দেয়? ডাকুন তাকে।

ললিতা দীপ্ত কণ্ঠে বল্‌লে—আপনারা কত করে তাকে মাইনে দেন?

মাইনে? সে কী এমন কাজের লোক যে মাইনে পাবে? কী তার কাজের দাম যে—

ললিতা বল্‌লে—তবে যান, রেখে দিনগে আপনার চাকরী, সে করবে না—তার হয়ে আমিই জবাব দিচ্ছি। যান্‌, কি হবে তার কাছে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে! যে কাজের কোনো দাম নেই, সে কাজ সে আর করবে না।

মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ললিতা ভিতরে চলে গেল।

অপমান! তা অপমান বৈ আর কি। কিন্তু মিষ্টার যে সৃষ্টিছাড়া নিয়মের মানুষ! তাকে যে আঘাত করবে, আহত করবে, তাকে যে মুখের উপর অপ্রতিভ করবে, মিষ্টার মনে মনে তাকেই গ্রাহ্য করে, শ্রদ্ধা করে তার প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ বেড়ে যায়। ললিতা ভিতরে চলে গেল কিন্তু তার অপরূপ রূপের মাধুর্যটুকু সে যেন মিষ্টারের চারিদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

মিষ্টার যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল তখন তার মুখে অল্প একটু হাসি লেগে রয়েছে।

তারপর এ গল্পের আর একটিমাত্র অধ্যায় বাকি। দুনিয়ার নানা ঘাটে ঘুরে মিষ্টার অনেক দেখেছিল—এ হচ্ছে তার অভিজ্ঞানের শেষ পরিচ্ছেদ।

আজ সন্ধ্যায় তার যাত্রার দিন, এবার আবার অনেক দিনের জন্য দূরে সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজে তার ডিউটি পড়েছে।

দুপুর পার হয়ে অপরাহ্নে গড়িয়েছে। সাজসজ্জা তার হয়ে গেছে—এবার শুধু নরেনের অপেক্ষা। নরেনকে সে ভালো চোখে দেখতে পারে না, অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, জনসমাজে তার অবস্থার দৈন্যকে নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করে কিন্তু যাবার সময় এই ঘর-দোর, জিনিষপত্র, যথাসর্ব্বস্ব—সমস্ত কিছুর দায়িত্ব তার উপর সে দিয়ে যাবে। নরেনকে বিশ্বাস না করে গেলে তার চলে না।

আফিস থেকে ফিরতে নরেনের তখনও একটুখানি বিলম্ব আছে। মিষ্টার শিষ্ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

নরেনের ঘর খোলা, ঘরে সে চাবি বন্ধ করে না। মিষ্টার একবার ঢুকল। গত রাত্রের জীর্ণ বিছানাটি তখনো ছড়ানো রয়েছে, আজ নানা কাজের জন্য চাকরটা তার ঘরে ঢোকেনি। মিষ্টার পায়ের জুতোর কোণ দিয়ে বিছানাটাকে এক পাশে সরিয়ে দিল। এটা তার চরিত্রের জঘন্যতা নয়—এ হচ্ছে তার অভ্যাস। বালিশটা যখন ছিটকে এক পাশে গিয়ে পড়ল, তার তলা থেকে বেরোলো একখানা চিঠি। গোলাপী রঙের কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা। মিষ্টার সেখানি হাতে করে' তুলে নিল।

অন্যের পত্র পড়া তার কোনোদিনই অভ্যাস নয় কিন্তু নরেনের সম্বন্ধে এ নিয়ম পালন করে' চলা তার পক্ষে অসম্ভব।

বাঙলা ভাষা সে ভালো পড়তে পারে না, তবু হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে দেখে চল্‌ল—

শ্রীচরণেষু,

দু'দিন ধ'রে' ভেবেছি তোমাকে এ চিঠি লিখবো কি না। আমি যতবার তোমাকে বলবার চেষ্টা করেছি তুমি উদাসীন হয়ে থেকেছ। মা ও বাবা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন। আমাকে ও'রা যার-তার হাতে তুলে দেবেন, আমি সেটা পছন্দ করিনে। আমি তোমারই কাছে থাকতে চাই।

তুমি যদি আমাকে বিয়ে কর তাহলে কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না। বাবা আর মা আড়ালে সেদিন যেকথা বলছিলেন তা শুনে নিশ্চিত হয়ে তোমাকে এ চিঠি লিখতে পারলাম।

আমার ভালবাসা নিয়ো।

তোমারই ললিতা

পুঃ—কাল আমরা দেশে ফিরবো, তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। নিজেকে আর লুকিয়ে রেখো না, তোমার অবস্থা ত ভালই, তবুও এমন দীনহীন বলে' নিজের পরিচয় দাও কেন? এ যে আমারও অপমান! নিজেকে ছোট করে' দেখলে বড় হব কেমন করে'?—ইতি ল।

কিন্তু শেষ ছত্রটি পড়বার সময় আর মিষ্টার পেলে না, নরেন এসে ঘরে ঢুকলো।

চিঠিখানা হাতে করে' নিয়ে মিষ্টার উঠে দাঁড়ালো। তারপর একটু হেসে কাছে গিয়ে নরেনের একখানা হাত টেনে নিয়ে চেপে ধরল। গলাটা পরিষ্কার করে' নিয়ে বল্‌ল—মানুষ হিসেবে আমি খুব খারাপ লোক, এখনো তোমার ওপর আমার হিংসে হচ্ছে। বসো। নরেনকে জড়িয়ে ধরে' সে নিজের চেয়ারটার উপর তাকে বসালো।

তারপর চিঠিখানা তার হাতের ভিতর গুঁজে দিয়ে ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত পুরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—যদি একটু সেণ্টিমেণ্টাল্ হই কিছু মনে করো না। তোমার ওই চিঠিখানা পড়ে' আমার মনে হল, তুমি great, তোমার ভাগ্যটা যদি আমি পেতাম নরেন, তাহলে—but I should check myself.

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এসেছিল, ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। পকেট থেকে একটি সিগারেট বার করে' দেশালাই জেবলে সে যখন ধরাতে লাগলো, সেই চকিত আলোয় নরেন দেখলো, তার চোখ দুটিতে জল চক চক করছে।

সমুদ্রে ভেসে যাবার আগে—really, I was thinking of my own life—এ জীবনে কিছুই ত নেই,—infinitely alone.

হৃদয়াবেগ আপনার ভাষা আনে সঙ্গে ক'রে।

দেশালাইটা আর একবার জেলে হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিষ্টার পুনরায় বল্‌ল—যাক্‌, সময় হয়ে গেছে, আর দেরী কর্‌তে পারিনে। আরদালি—আরদালি?—All right, চললাম ভাই!—আর একবার নরেনের করমর্দ্দন করে বল্‌ল—Good bye, good luck!

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল, সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে সে আর একবার বল্‌ল—yes, my last request, ললিতাকে বিয়ে করতে তুমি অমত করো না ভাই। She is your beloved Helen.

ছড়িটা ঘুরিয়ে শিষ দিতে দিতে সে টক টক করে' সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সিড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ললিতার চোখদুটি তখন আনন্দ ও বেদনায় ভ'রে উঠেছে।

মোহ

কুড়ি বাইশ বছরের একটি মেয়ে অতি সন্তর্পণে ও সংকোচে গায়ে-মাথায় মুড়িসুড়ি দিয়ে আসছিল পথ পার হয়ে। একটি সলজ্জ ভীরুতা তার বড় বড় চোখে, মুখে একটি ম্লান দীপ্তি,—চকিত সন্ত্রস্ত পায়ে এঁকে বেঁকে হিল্ হিল্ করে' একটি ছোট বাড়ীর বারান্দায় উঠে দরজার কড়া নাড়ল। মুখখানি নধর, তবুও মনে হতে পারে, সে মুখে গত জীবনের একটি ক্লান্তি ও করুণ অসহায়তা আবছায়ার মতো লেগে রয়েছে।

একটু পরেই গেল দরজাটি খুলে'। ছোট একটি হিন্দুস্থানী ছেলে মুখ বাড়িয়ে বলল—আও, বৈঠো ভিতরমে। আভি ডাংদার বাবু আতা হ্যায়।

মেয়েটি ভিতরে এল না, দরজার কাছেই রইল দাঁড়িয়ে। কেতাদুরস্ত ডাক্তাররা খবর না দিলে যে দেখা করতে আসেন না,—মুখ দেখে মনে হ'ল, মেয়েটি বোঝে এ কৌশল।

ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেয়ালগুলিতে দেশের কয়েকজন নাম করা নেতার ছবি, তার নীচে এক-একখানি জাপানী চিক টাঙানো। ওধারে টেবিলের উপর একটি নতুন চরকা, এক দিকে ছবি আঁকবার কতকগুলি সরঞ্জাম, তার পাশে দুটি আল্মারিতে হোমিওপ্যাথী ওষুধের শিশি সাজানো। মেঝের এক কোণে একটি সেলফ-এর উপর কতকগুলি সাময়িক পত্র সযত্নে গোছানো।

ভিতরে পায়ের শব্দ হতেই মেয়েটি নিজেকে সহজ করে নেবার জন্য গা ঝাঁকুনি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

আধুনিক ফ্যাশনের মাদ্রাজী একজোড়া চটি পায়ে নতুন পাঞ্জাবী গায়ে নতুন ডাক্তার শ্রীমান দ্বিজেন লাহিড়ী এসে ঢুকলো ঘরের মধ্যে।

চোখচোখি হতেই ডাক্তার হাঁ করে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে থেমে গেল। মেয়েটি মাথা নীচু করল।

—আশ্চর্য করলে অজয়া, আমি জানি তুমি মরে গেছ। তারপর? কোত্থেকে এতদিন পরে?

মৃদুকণ্ঠে অজয়া বলল—এখানেই ছিলাম।

এখানেই? এই কাশীতেই? দেখতে পাইনি ত। তোমার লুকিয়ে বেড়াবারও অভ্যেস আছে বটে। বলি ও কি হয়েছে? ময়লা আর ওই অমন ফুটো কাপড় পরে এতখানি রাস্তা আসতে পারলে?

অজয়া না দিল উত্তর, না একটুও কাঁপল।

দ্বিজেন বলল—শেষবার যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম, তুমি ছিলে আশমানী রঙের পার্শী শাড়ী পরে', আজ তুমি মুদির স্ত্রীর চেয়েও জঘন্য কাপড় পরেছ। ছি ছি, লোকনিন্দা কি দেশ ছেড়ে গেছে?

অজয়া কথা বলল এবার—এ কি আমার সাধ?

তা জানিনে, আজকাল একদল গেরস্থ ঘরের মেয়ে দেখা যাচ্ছে—দরিদ্র বলে' পরিচয় দেওয়াটা যারা করেছে সত্যিই ফ্যাশন।—যাই হোক, ওখানে দাঁড়ালে যে? বসো না ওই ইজি-চেয়ারটায়!

অজয়া বলল—না।

কেন? কাপড়খানার অবস্থা ভেবে নড়তে লজ্জা হচ্ছে? কিন্তু লোক যে মনে করতে পারে তুমি এসেছ ভিক্ষে করতে।

সে ত' আর মিথ্যে নয়!

দ্বিজেন কথাটাকে দিল ঘুরিয়ে। বলল—তাই ত বলি, চাকরটার কাছে খবর পেয়ে ভাবলাম, এমন দুঃসাহসী রুগী কে আছে, আমার কাছে হঠাৎ যে আসবে আত্মহত্যে করতে! হবে কেন? বরাৎ কি এত সহজে ফিরলেই হ'ল? দেশের কাজে কি আর সাধে নামতে চাইছি অজয়া?—আচ্ছা, তুমি অমন উস্‌খুস কচ্ছ কেন?

অজয়া বলল—আবার একটু তাড়াতাড়ি আমায় যেতে হবে।

ও, এসেছিলে কেন সেটা একবার বল? আচ্ছা থাক, বলতে হবে না—তোমার মতো এমন মেয়ে আমার খোঁজে আসে, এইটুকু নিয়েই বন্ধুসমাজে বেশ গর্ব্ব করতে পারব!

আপনি ত জানেনই আমার আসার কারণ!

হাল্‌কা করে' কথা বলার অভ্যাসটা দ্বিজেনের হঠাৎ গেল ঘুরে। বল্‌ল—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুমি একটি কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছ, আমি দেবো আর তুমি নেবে! দুঃখ জানাবার একঘেয়ে রীতিটা তোমরা ছাড়তে পার না অজয়া? হাত পেতে ভিক্ষে করে' বার বার নিজেকে অপমান করো কেন?

একটু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে অজয়া বলল—তা ছাড়া আর কি করি বলুন। আমার এ অবস্থায় পড়লে—

তাই বটে! ভিক্ষাবৃত্তিটা তোমাদের একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অথচ তোমরা চাইতেই জানো, নিতে জান না।

অজয়ার উষ্ণতা ছিল, কিন্তু তার চেয়েও ছিল ঔদাসীন্য। সকাল বেলা কথা-কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি ছিল না তার।

দ্বিজেন বল্‌ল—এখন আছো কোথায়? কি রকম ভাবে থাকো আজকাল, বলই না?

অজয়া চুপ করে' রইল।

উত্তরও দেবে না, ঠিকানাও দেবে না—কেমন? কেমন করে' কি নিয়ে যে তোমার

দিন কাটে ভেবে অবাক হই। আজ তুমি এসেছ, জানি আবার বহুদিন তোমার দেখা পাবো না ; একেবারে দেশছাড়া রাজ্যিছাড়া নিরুদ্দেশ। সেদিন যে অদ্ভুত চেহারা নিয়ে এসেছিলে, রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি দিলেও মানুষের অমন চেহারা হয় না।

মুখ ফিরিয়ে অজয়া বল্‌ল—সকল দিন ত মানুষের সমান কাটে না।

কাটে না জানি,—দ্বিজেনের কণ্ঠে কেমন একটি কারুণ্য ফুটে উঠ্‌ল—তা বলে' তোমার এমন দুরবস্থা হবার কথা নয় ত। তুমি স্বাধীন মেয়ে, বিবাহ করনি, কারু পেট চালাতে হয় না, কেউ তোমার মুখ চেয়ে নেই, কোনো অপবাদ রটেনি,—তোমার জীবনের ধারা অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল অজয়া।

দেখতে দেখতে দু' ফোঁটা জল নেমে এল অজয়ার চোখ থেকে।

দ্বিজেন বল্‌ল—এই শহরে কত রকমে তোমাকে দেখলাম বল ত। মাঝে একবার করলে সন্দেশের দোকান। যেই সেটা লাভজনক হয়ে এল, অমনি সেটা ছেড়ে দিয়ে কালীতলার মন্দিরে পুরুতের পায়ের সেবা দিলে সুরু করে' । অমন 'বাণী-ভবনের' মাষ্টারিটা হঠাৎ একদিন তুমি ত্যাগ করলে ; কিছুদিন কাট্‌লে চরকা ; ভালো লাগ্‌ল না, একদল মেয়ে নিয়ে মাঝে দিনকতক রাস্তায় মোড়লী করে' বেড়ালে। কী মন নিয়ে যে সংসারে এলে, কিছুতেই তোমায় তৃপ্তি দিল না। তারপর সেদিন জানলাম হরিলাল সেন-এর বাড়ী রাঁধুনির কাজ নিয়েছ। বেশ ত সে জায়গা ছাড়লে কেন?

সে আপনার শুনে কি হবে?

ডাক্তার বল্‌ল একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে—ও, তা—সে কথা সত্যিই বলেছ, তোমার সকল কথা আমিই বা কেন শুনতে যাই···এম্‌নিই বল্‌ছিলাম।

অজয়া বল্‌ল—বিন্ধ্যাচলে গিছলাম, সেখান থেকে সন্নিসি ঠাকুর নিয়ে গিয়েছিলেন অযোধ্যায়—

দ্বিজেন বলল—সন্নিসি ঠাকুর?

হ্যাঁ, ফিরে এসে দেখি আমার চাকরি আর খালি নেই।

তাড়াতাড়ি উঠে দ্বিজেন একবার গেল ভিতরে, কিন্তু ফিরে এল আবার সঙ্গে সঙ্গেই। হাতে করে' সরু পাড়ের একখানা ধুতি এনে ঝুপ করে' অজয়ার গায়ের উপর ফেলে দিয়ে বলল—ভেতরে গিয়ে আগে কাপড় বদলে এস। কি চাও এবার বল শুনি। রান্নার জিনিসপত্র, না পয়সা?

ছলছলে দুটি চোখ তুলে অজয়া আবার নীচু করে নিল। কিন্তু সে সেখান থেকে এক পাও নড়লো না।

দ্বিজেন হঠাৎ কঠিন কণ্ঠে বলল—একটি জিনিস বাঙলা দেশের মেয়ে জাতের মধ্যে নেই, সেটি হচ্ছে অপমানবোধ। যতই তোমরা স্বাধীন হও, দৃঢ় হও, আমাদের কাছে তোমরা নীচু হয়ে, দুর্বল হয়ে, অসহায় হয়ে থাকতে ভালবাসো। আমাদের কাছে লাঞ্ছনা পেয়ে নির্লজ্জের মতো আমাদেরই কাছে প্রতিকারের জন্য ছুটে আসো এই হচ্ছে তোমাদের ভীরুতার পরিচয়। যাক গে।

টিনের একটা বাক্স খুলে' দুটি টাকা এনে তার হাতে দিয়ে দ্বিজেন আবার বলল—এইটি হলো খুব সম্মানের—কেমন? নিজেকে সর্বদা লুকিয়ে রাখবে, অথচ গোপনে এসে একজন বাইরের লোকের কাছে আর্থিক অনুগ্রহ নিতে তোমার বাধে না। একে বলে তোমাদের জাতীয় স্বভাব! শুধু এক মুঠো ভাতের জন্য পায়ের তলায় পোকার মতো হয়ে থাকাই তোমাদের বংশগত ধারা—নিশ্চিন্ত আরামে অপমান সইবার তৃপ্তি এ দুনিয়ায় শুধু তোমরাই জানলে। আর কি, হাত পাতা হল, এবার যাও?

অজয়া হয়ত সবই বোঝে। পা বাড়াবার আগে সে বললে—যা দিলেন, এর থেকে *আপনার সেদিনকার ওষুধের দামটা কেটে নিন। সেই যে সেবার বাকি রেখে* গিছলাম।

দ্বিজেন বলল—ওই যা দিলাম, ওর থেকে?—অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল—তোমাদের হিসেব এর চেয়ে বিশেষ উঁচুদরের নয়। মৌলিক কিছু তোমাদের নেই, আমাদের নিয়ে আমাদেরই ওপর আরোপ করো।

প্রতিবাদও করল না, এ অপমানের দান ফিরিয়েও দিল না। ধীরে ধীরে বারান্দা থেকে নেমে অজয়া রাস্তায় পড়ে একটা গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বিজেন সেখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে শরৎকালের আকাশে রংয়ের ছোপ ধরেছে। সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোর মতো মেঘ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারান্দার ধারে শিউলি গাছের পাশে এসে পড়েছিল এক ঝলক ধবধবে রোদ। ছুটির দিনের মতো একটা অনিয়মের বিশৃঙ্খলা যেন ঘুরে ঘুরে দুলে বেড়াচ্ছে আকাশে-আকাশে, জলে-স্থলে!

দরজার দিকে আর একবার নজর পড়তেই দ্বিজেন দেখল, কপাটের উপর কাপড়খানি তুলে রেখে অজয়া চলে গেছে!

প্রয়োজনের দিনে আর্থিক অনুগ্রহ সে হাত পেতে নিতে দ্বিধা করল না, কিন্তু হৃদয়ের দাক্ষিণ্যকে দিয়ে গেল ফিরিয়ে।

মাঝখানে মাত্র কয়েকটি দিন।—

হঠাৎ সেদিন আবার দেখা হয়ে গেল স্নানের ঘাটে। এক হাতে ঘটি, আর এক হাতে ভিজা কাপড়—নির্জ্জন মধ্যাহ্নে স্নান করে উঠে সবেমাত্র অজয়া পথে নেমেছে।

এদিকে যে?

দ্বিজেন বলল—রোজই ত যাই এই দিক দিয়ে। তুমি যাবে কোন্ দিকে? বাসায় যাবে ত?

একটু থতমত খেয়ে ইতস্ততঃ ক'রে অজয়া বলল—মন্দিরে।

চল একটু কথা আছে।

সরু গলিতে লোকজনের ভিড় বিশেষ নেই। দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগল। দ্বিজেন বলল—এখন চান্ করলে, রান্না হবে কখন?

অজয়া বলল—এই যাবো, এইবার গিয়ে···

তবে আর মন্দিরে কেন?

এখনো আহ্নিক হয়নি।

আহ্নিক? ঠাকুর-দেবতার সখ আবার মাথায় কবে থেকে ঢুকলো?

উত্তর দিল না অজয়া।

দ্বিজেন বলল—সত্যি কথা বলব? ঠাকুর-দেবতার ওপর এতটুকু শ্রদ্ধা তোমার নেই। নিজের মনের শুধু একটা তৃপ্তি খুঁজে বেড়াচ্ছ।

অজয়া বলল—লোকেরা এই কথাই ভাববে।

এখনকার লোকমতকে আমি শ্রদ্ধা করি।

ফুলের দোকানের কাছে এসে অজয়া থামল। আঁচল থেকে একটি পয়সা খুলে দিয়ে একপাতা ফুল নিয়ে সে আবার চলতে লাগল। তার স্বল্প কথার মধ্যে, এই ফুল কেনার মধ্যে কেমন একটি কাঠিন্য এবং দৃঢ়তা ফুটে উঠছিল। দ্বিজেনের মতো শত লোকের অবজ্ঞাও তাকে যেন টলাতে পারবে না।

মন্দিরের দরজার কাছে এসে সে বলল—কি করবেন?

দ্বিজেন বলল—কথা বলা ত হল না।

তবে জুতো ছেড়ে ভেতরে এসে বসুন, আমি তাড়াতাড়ি করে'…

দ্বিজেন আর প্রতিবাদ করতে পারল না, এ যেন অজয়ার অধিকৃত গণ্ডীর মধ্যে সে এসে পড়েছিল। জুতোটি দরজার কাছে এসে ছেড়ে রেখে সে আস্তে আস্তে গিয়ে নাটমন্দিরের চৌতারায় বসল।

বসে রইল সে অনেকক্ষণ। এক ফাঁকে সে দেখলো অজয়া দিব্যি পরিপাটি করে গুছিয়ে পুষ্পপাত্রের মধ্যে ফুলচন্দন সাজিয়ে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে বসে আছে। আবার গেল খানিকক্ষণ। এবার মুখ তুলে সে দেখল, আঁচলের ভিতর থেকে 'নিত্য-কর্ম্মপদ্ধতি' বা'র করে গভীর সুরে অজয়া স্তব পাঠ করতে সুরু করেছে। একটা তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার বক্র হাসি দ্বিজেনের মুখে ফুটে উঠল।

স্তব পাঠ সহজে আর শেষ হতেই চায় না!

শেষে একেবারে অধীর হয়ে দ্বিজেন যখন তাকে ডাকবার উপক্রম করল, দেখে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে অজয়া প্রণাম করছে। করছে ত করছেই। সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন না দিলে এমন প্রণাম মানুষের সহজে আসে না। দ্বিজেনের ঘাড় হেঁট হয়ে এল।

উঠে এক সময় আসতে হলো বৈ কি। যে-দৃষ্টি রাঙা হয়ে ফুলে উঠেছে তাকে গোপন করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা প্রকাশ পেতে লাগল।

মন্দির থেকে বেরিয়ে দুজনে পড়ল আবার টানা গলির পথে। অজয়া বলল—এইবার আপনি যাবেন ত?

কোনো কথাই হলো না যে।

ম্লান হাসি হেসে অজয়া বলল—বলবো বলেছেন তখন থেকে, বলেই ফেলুন না!

দ্বিজেন একটু আহত হল। বলল, তুমি কি ভাবছো, কোনো একটা কথা বলার ছুতো নিয়ে তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ থেকে নিচ্ছি?

তা আমি মনে করিনে।

দ্বিজেন চুপ করে রইল কিয়ৎক্ষণ। কিন্তু দুর্ব্বল মানুষের মতো খানিকটা ভূমিকা না ক'রে সে পারল না। বলল—এতক্ষণ যে কথাটা বলব বলে জোর নিচ্ছিলাম, তোমার এসব দেখে তা আর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

কোন সব ?

এই তোমার, এই ধর গিয়ে পুজো, স্তবপাঠ তা বলে মনে করো না এ সব আমি বিশ্বাস করি ?

করেন না ?

না না। বলে দ্বিজেন খানিকটা দম নিল। তারপর বলল—তুমি শৈলেনের কাছে কেন গিয়েছিলে ?

সাপ দেখে অজয়া যেন শিউরে উঠল—আপনি কেমন করে জানলেন ?

সে আমার বন্ধু।

বন্ধু ? তার সঙ্গে মেশেন আপনি ?

সে পরের কথা। তুমি নাকি টাকা ধার চেয়েছিলে তার কাছে ? কি সর্ত্তে ?

অজয়া বলল—কিছুই না। ধারও তিনি দেননি।

বিপদে কাউকে সাহায্য করবার মতো বুক তার নেই, তা জানি কিন্তু তুমি চেয়েছিলে কিসের অধিকারে ?

ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে অজয়া বল্‌লে—এ সব কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন আপনি ?

দ্বিজেন সুরটা নামিয়ে নিল। তার পর বক্তৃতা দিতে সুরু ক'রে বল্‌লে—ভালোবাসো আপত্তি নেই, কিন্তু এটা জেনো ভুল বোঝায় ভালবাসা নষ্ট হয় না, অবজ্ঞায় খোয়া যায় না, স্বার্থপরতায় ভাঙে না—ভালবাসা ধ্বংস হয়ে যায় যেখানে পয়সার কথা ওঠে। অর্থের সাহায্য চাওয়াই হচ্ছে ভালবাসার সবচেয়ে বড় শত্রু! এই যে, আমার বাড়ীর কাছেই এসে পড়েছি। এসো, একটুখানি ব'সে বিশ্রাম ক'রে যাও।

ঘরে ঢুকে চেয়ারখানা সরিয়ে দিয়ে একটা মাদুর আনতে দ্বিজেন ভিতরে গেল। অজয়া তৎক্ষণাৎ একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে মুঠার ভিতর থেকে নূতন গোটা দুই তামার মাদুলী ও ঠাকুরের প্রসাদী ফুল ও পাতা তাড়াতাড়ি আঁচলে বেঁধে ফেললো।

মাদুর এনে দ্বিজেন বল্‌লে—আমি এমন অবিবেচক নই যে তোমায় বসিয়ে রাখবো শুক্‌নো মুখে। ভেতরে খাবার ব্যবস্থা ক'রে এলাম। থাক, আর আপত্তি ক'রে পর বলে পরিচয় দিতে হবে না।

অগত্যা অজয়া চুপ করে' রইল।

খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিজেন বল্‌লে—নিজেকে অপমান করবার পথ আর আবিষ্কার করে' বেড়িয়ো না, এই তোমার কাছে আমার মিনতি। তুমি স্বাধীন হয়ে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে পারোনি। দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে যে মেয়েরা আজ ছুটে বেরোতে চাইছে তাদের চেয়ে সুবিধে তোমার অনেক অজয়া। কিন্তু সে সুবিধে তুমি নিলেনা, তুমি পথে পথে বেড়াবে, কিন্তু পথ দেখালে না। তোমার মধ্যে যে-সম্ভাবনা ছিল,

যে-কাজ তুমি করতে পারতে, তার দিকে মুখ ফিরিয়েও চাইলে না। এ দুঃখ রাখি কোথায় বল ত?

অজয়া বল্ল—আমার কোনো শক্তি নেই।

এবার তা'হলে তর্ক ক'রে বোঝাতে হয়, তোমার শক্তি আছে। তাতে তর্কই হবে শুধু।

অসহিষ্ণু হয়ে দ্বিজেন বল্ল—নিজেদের অশ্রদ্ধা করবার এই যে মজ্জাগত প্রবৃত্তি তোমাদের, এর থেকে কোনদিন নিষ্কৃতি নেই। স্ত্রীলোকই হচ্ছে স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বাধা এবং শত্রু। আজ পর্য্যন্ত যেটুকু তোমাদের উন্নতি হয়েছে, সেটুকু তোমরা নিজেদের থেকে ওঠোনি, আমরাই টেনে তুলেছি।

অজয়া বল্ল—এখানে বসে' বসে' আপনার সঙ্গে কি কেবল ঝগড়াই করতে হবে?

কাঁচা ঝাঁঝালো বক্তার মতো দ্বিজেন চেঁচিয়ে উঠল,—না, ঝগড়াও নয়, মনান্তরও নয়; তোমরা শুধু জানো গরুর মতো গিলতে, শুধু জানো সৃষ্টিকার্য্যের সহায় হতে। কী তোমরা? হৃদয়ের ধার ধারো না, প্রাণের খোঁজ পাও না, জ্ঞান-বুদ্ধির মানে জানো না—রক্ত মাংস স্থূল দেহের স্তূপ, চোখ বুজে' দিন-যাপনের গ্লানিকে এড়িয়ে চলো, অনড় আরামের দাসী, জানোয়ারের জঘন্য জীবনযাত্রার সঙ্গী!

এমন করে হাঁপাতে লাগলো যে অজয়া একটুখানি না হেসে থাকতে পারল না। বল্ল—আর কত গালাগালি দেবেন?

তা বটে! দেখতে দেখতে সহজ হয়ে এল দ্বিজেনের মুখখানা, বল্ল—একটু হেসেই বল্ল—তোমাকে দেখলে এই কথাগুলো মাথার মধ্যে ভিড় করে। ভাবলাম অনেকদিন বাদে একটু গল্প করব তোমাকে নিয়ে, কিন্তু আজকাল গল্প বলতে গেলেই আসে বক্তৃতা। সত্যি অজয়া একবার ভেবেই দেখ না, জীবনে কি তোমার কোন কাজ নেই? এমনি পুঁটুলি হয়ে তোমরা আর কত দিন কাটাবে বল ত? এ দেশের ছেলেরা আর বিয়ে করতে চাইছে না কেন জানো? তোমাদের বিয়ে তাদের অপমান। তোমরা এতই পিছিয়ে, এতই নিচু যে তারা মনে করে তোমরা বোঝা, তোমরা তাদের বাধা! তাই তোমাদের তারা পায়ে থেঁৎলায়, অত্যাচার করে, মরবার পথ ক'রে দেয়।

আর বসবার সময় ছিল না অজয়ার। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়ালো। দ্বিজেন বলল—অনুরোধ আর করব না যে তুমি আর একটু বসো। কিন্তু স্বীকার ক'রে যাও পয়সার সাহায্য আর তুমি চাইতে যাবে না! তোমার স্বামী নেই, সন্তান নেই, আপনার লোক কেউ নেই—যদি কিছু না পারো উসবাস ক'রে থেকো, এমন ক'রে নিজের মুখ আর খুড়িয়ো না! শৈলেনের কাছে দয়া নিয়ে নিজেকে দুশ্চরিত্রা ব'লে আর স্বীকার করো না।

কি যে বলেন আপনি!—বলে' মুখ রাঙা করে' অজয়া পা বাড়াচ্ছিল, দ্বিজেন পুনরায় বল্ল—আর এক কথা, সরোজিনী দেবীর ওই যে 'নারী শিল্পাশ্রম'টার কথা সেদিন তোমায় বলেছিলাম তার কি কর্লে?

মুখ তুলে অজয়া বল্ল—বলুন কি করব?

কাজে না হয় পরে নামবে, আমার সঙ্গে একদিন ওখানে যাবে যে বলেছিলে? তোমার মতন বেপরোয়া মেয়ে পেলে তারা মাথায় করে' নেবে। নিজের অবস্থা তুমি সহজেই ফিরিয়ে নিতে পারবে। বল, কবে যাবে?

অজয়া বলল—যেদিন বল্‌বেন।

এ তোমার ভাসা ভাসা কথা। দিব্যি কর।

দিব্যি করে' যদি না রাখি?

তাও তোমরা পারো। মেরুদণ্ড বলে' যে কোন পদার্থ তোমাদের আছে এ কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। তোমাদের জীবনে গভীরতাও নেই, দায়িত্ববোধও নেই। হাজার হোক, বাঙালীর মেয়ে ত! কাল একবার আসবে দুপুর বেলায়? ওগুলো কি, আচ্ছা ভালই হয়েছে, ঠাকুরের এই পেসাদী ফুল-পাতা ছুঁয়ে দিব্যি করে' যাও—আস্‌বে!

আমার ভাল করবার জন্যে আপনি একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন দেখছি। নিন—দেখুন, ছুঁলাম,—আসবো, আসবো!—বলতে বল্‌তে তাড়াতাড়ি অজয়া রাস্তায় গিয়ে নামল।

গাছ-পালায় তখন রোদ উঠেছে!

দ্বিজেন এগিয়ে এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। আজ আর অজয়া ডান দিকে গলির বাঁকে ফিরলো না, সোজা চলতে লাগলো। পিছন দিকে একটিবারও সে ফিরল না, কারণ পিছনে তাকাবার মেয়ে সে নয়। এদিকে ওদিকে কোনদিকেই সে চায় না, নিজের পথটাই হচ্ছে তার পক্ষে সত্য। হেলে দুলে, মাথায় অল্প একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে অবেলার ম্লান আলোয় তার দেহটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ দ্বিজেনের মনে হল' যে-কটূক্তি, যে-লাঞ্ছনা এতক্ষণ সে করল এ তার মনের নয়, এসব তার অন্তর থেকে উৎসারিত হয়নি। প্রশংসা করতে গিয়ে তার মুখ থেকে নিন্দা বেরিয়ে পড়েছে। কই মেয়েদের সে ত অবজ্ঞা করে না!

ভিতর থেকে তার একটি গভীর নিশ্বাস উঠে যেন অদৃশ্য অজয়ার পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

সেকি অজয়াকে ভালবাসে?

কাল আসব বলে' গেছে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই।

আর তার দেখাই নেই। কাল-ও আর এল না!

এল না যখন, তখন পথ চেয়ে বসে' থাকাও আর চললো না। দ্বিজেনের অনেক কাজ। সে ডাক্তারী করে, কংগ্রেসের চাঁদা তোলে, সভা-সমিতিতে যায়-আসে, কর্ম্মীসঙ্ঘের সে সভ্য, নারী-শিল্পাশ্রমের সে ডিরেক্টর। একজনের জন্য অপেক্ষা করে থাকার সময়ই তার নেই।

কাজের চাপে অজয়াকে ভুলতেও তার দেরী লাগল না।

রাজনীতি এই সময়টা তখন প্রবল আন্দোলন তুলেছে। ঘরে ঘরে তখনও এ ছাড়া আর কথা নেই। চারিদিকে তুমুল সাড়া পড়ে' গেছে।

কলকাতা থেকে সংবাদ এল, মেয়েরা কাজ করতে নেমে নাকি ধরা পড়েছে। খবরটা এখানকার ঘরে ঘরে দিল আগুন লাগিয়ে।

গোপনে যে মেয়েরা সঙ্কোচের সঙ্গে নেমেছিল পথে, তারা আর ভয় মানল না। চাঁদার খাতা বেরোল, দল তৈরী হল, যোগমায়া দেবীর নেতৃত্বে এক দল মেয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ী বাড়ী চরকা এবং খদ্দর প্রচারের উদ্দেশ্যে।

হৈ চৈ হ'ল সুরু। রাস্তা ঘাটে জমলো জটলা; বৈঠকখানা, তাসের আড্ডা, গানের আসর ফেলে সবাই ছুটে এল এই আজব কাণ্ড দেখতে। সহরের নাড়ীটা হয়ে উঠল চঞ্চল।

'বন্দে মাতরমের' আওয়াজে দিন রাত সহরটা ঝা ঝাঁ করতে লাগল।

মালিনী গুপ্তা, মহামায়া মিত্র প্রভৃতি এসে বললেন—মেয়ে কই ডাক্তারবাবু?

দ্বিজেন বলল—বাড়ী বাড়ী ক্যান্‌ভাস করতে হবে, মেয়ে বার করা চাই।

পাওয়া যাবে?

যেতেই হবে। বিরজা দেবীকে পাঠাবো। তিনি বেশ 'চার্ম্' করতে পারেন। 'সিচুয়েশন' বুঝিয়ে দিলে অনেক মেয়েই আসবে।

তাই ঠিক হলো। বিরজা দেবী এলেন। স্বামীপরিত্যক্তা মেয়ে,—টক্‌টকে চেহারা, বয়স আন্দাজ বছর পঁচিশ, কিয়ৎ পরিমাণে পুরুষ-বিদ্বেষী। দ্বিজেন বলল—একাই যাবেন? অবশ্য জন দুই মেয়ে থাকবেন আপনার সঙ্গে।

বিরজা বললেন—আপনি ডিরেকটর, কাছে কাছে থাকলে ভাল হত, 'এমারজেন্সীর' জন্যে। চশমার ভিতরে তিনি হাসলেন।

আচ্ছা মাঝে মাঝে থাকবো।—মনে রাখবেন, মেয়েদের এ মুভ্‌মেণ্ট্‌কে আর থামতে দেওয়া হবে না। মিট্‌মিটে যে আলোটি আমরা জ্বেলেছি, এইটি দিয়েই সব ঘরে আলো জ্বালাবো।

সময় বড় অল্প। জন দুই মেয়ে নিয়ে বিরজা দেবী বেরিয়ে পড়লেন দুপুর বেলায়। ডাক্তারবাবুও চললেন সঙ্গে সঙ্গে।

ছেলে আর মেয়েকে একসঙ্গে কাজে নামতে দেখে গঙ্গার ঘাটে বৈকালিক বৈঠকে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের নিন্দার বান ডাকতে লাগল।

দিনতিনেকের মধ্যেই যোগাড় হ'ল গুটি পচিশেক মেয়ে। অবশ্য বিরজার কৃতিত্বই বেশী। দ্বিজেন লাহিড়ী প্রশংসার দিকে পিছন ফিরে থাকে।

দুপুর বেলা। কারণ দুপুর বেলাই মেয়েদের পক্ষে কাজের সুবিধে। বিরজা বললেন—কাল যাননি, আজ আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

বেশ, আফিসে বেলা দুটোর সময় আপনাদের সঙ্গে মিট্ করবো।

সেদিন আফিসে তার অপেক্ষায় মেয়েরা বসেই রইল। বেলা আন্দাজ আড়াইটের পর ছুট্‌তে ছুট্‌তে দ্বিজেন এসে বলল—শিগ্‌গির আসুন একবার আমার সঙ্গে।

মেয়েরা ঝড়ের আগে দৌড়ায়। সবে মিলে পথে নেমে বলল—কোন্ দিকে?

আসুন ত।

গলি-ঘুঁজি, দোকান-পসারি পার হয়ে শিবমন্দিরের পাশে সোজা রাস্তাটা ধরে' একটি সংকীর্ণ আলো-বায়ু-লেশহীন অন্ধ গলির কাছে থেমে দ্বিজেন বলল—এর মধ্যে ঢুকে যান, ঠিক কোন্ বাড়ীটা হবে বলতে পাচ্ছি না।

মেয়েরা সবাই অনভ্যস্ত, পথশ্রমে হাঁপাচ্ছিল। বলল, কার কাছে?

আমারই একটি পরিচিতা মহিলা। একটু আগে এই গলির মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢুকেছেন। ভাল করে বললে আসতেও পারেন আমাদের দলে! প্রথমে আমার নাম করবেন না কিন্তু।

বিরজা বললেন—আপনিও আসুন?

না—বলে দ্বিজেন মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

বিকট দুর্গন্ধ সংকীর্ণ পথ। কিন্তু গলির মধ্যে ঐ একটি মাত্রই দরজা। মালিনীকে বাইরে রেখে খানিকদূরে চলে গিয়ে বিরজা কড়া নাড়ল।

অবরুদ্ধ জীর্ণ গৃহকোণ থেকে আওয়াজ এল—কে?

উপর থেকে দরজায় লাগানো একটা দড়িতে টান পড়তেই দোর গেল খুলে। বিরজা ভিতরে ঢুকলেন। নীচেকার আবহাওয়ায় জানোয়ারও বাস করতে পারে না। ঝুপ্সি অন্ধকার, কন্কনে ঠাণ্ডা, পচা ইট-কাঠের গন্ধ,—ভয়াবহ জীর্ণতার রূপ। বাঁ হাতি সিঁড়ি ধরে বিরজা সোজা উপরে উঠে গেল। সঙ্কোচের চেয়ে কৌতূহল তার চোখে বেশী।

গিয়ে দাঁড়াতেই অজয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হেসে ছোট একটি নমস্কার করে বলল—আসুন!

আসতে বলল, কিন্তু বসাবে কোথায়? একটি মাত্র ঘর ছাড়া যেটুক জায়গা আছে, সেখানে জঞ্জাল, ছেঁড়া নোংরা কাপড়ের টুকরো, জল প্যাচ প্যাচ করেছে, ইঁদুরে এক জায়গায় তুলেছে রাবিশ, ও দিকে এঁটো-কাঁটা!

বিপন্নের মতো কয়েক মুহূর্ত এদিক ওদিক তাকিয়ে অগত্যা অজয়া বলল—আচ্ছা, তবে ঘরেই আনুন! ওঁর বড্ড অসুখ বেড়েছে কিনা, তাই বলছিলাম।

ঘরে ঢুকে বিরজা দেখল একটি পাশে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে। খড়ের মতো পাকা দাড়িগোঁফে মুখখানা ঢাকা। বয়স পঞ্চাশও বটে, সত্তরও বটে। কাছে কতকগুলো ওষুধের শিশি, তুলো, ওপাশে কতকগুলো কাগজের ছাই, পোড়া দেশালাইয়ের কাঠি, থু থু ফেলার পাত্র ইত্যাদি। ঘরের ভিতরে চারিদিকে একবার তাকিয়ে বিরজা শিউরে উঠলো মনে মনে।

অজয়া তাড়াতাড়ি গিয়ে বৃদ্ধের কাছে বসে তার গায়ে ভাল করে কাপড় ঢাকা দিয়ে দিল। বলল—বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, ভাল করে দেখতেও পান না।

বিরজা বিশ্বাস করতে পাচ্ছিল না। বলল—কে?

অজয়া ক্লান্ত হাসি হাসবার চেষ্টা করল। তারপর বৃদ্ধের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—বলুননা আপনি যা বলেন, কানে উনি একটু কম শোনেন।

বিরজা যেন ছোট হয়ে গিয়েছিল। থতিয়ে থতিয়ে বলল—এসেছিলাম···এই আপনার কাছেই।

কম্পিত দুটি হাত তুলে বৃদ্ধ কি ইঙ্গিত করল। অজয়া হেঁট হয়ে বললে—পিঠে লাগছে বুঝি?—বলে জড়িয়ে ধরে সে বৃদ্ধকে কোলে তুলে নিলে। আঘাত একটু লাগল বোধ হয়। মুখ বিকৃত করে লোকটি নিতান্ত নিম্পরের মতো কটূক্তি করে উঠল।

আঁচল দিয়ে তার দুটি চোখ মুছিয়ে দিয়ে অজয়া বলল—এমনি খিটখিটে হয়ে গেছেন, ভারি রোগ কি না!—তারপর আবার মাথা হেঁট করে বৃদ্ধের কানের গোড়ায় মুখ রেখে বলল—ভয় কি, ভালো তুমি হবেই। আমাকে কি গালাগাল দিতে আছে? একেই একটু রুক্ষু মানুষ, তার ওপর অসুখ করেছে, ও'র আর দোষ কি!

লোকটির কপালের উপরে গাল পেতে অজয়া অনুভব করে বলল—জ্বর বোধ হয় একটু কমেছে। কাল রাতে জ্বরের যাতনায় কি আর ও'র জ্ঞান ছিল?…এপাশ ওপাশ—সমস্ত রাত আমিও জেগে রইলাম। —ক্ষিধে পেয়েছে? শুনচ, ক্ষিধে পেয়েছে তোমার?

গরম দুধ ঢাকা ছিল, ঝিনুকে করে দুধ নিয়ে পরম যত্নে অজয়া তাকে খাওয়াতে লাগল। দুধ খাইয়ে মুখ মুছিয়ে সে আঁচল দিয়ে হাওয়া করতে সুরু করলে।

বিরজা আস্তে আস্তে বলল—বিয়ে হয়েছে কতদিন?

অজয়া ম্লান হাসি হাসল। বলল—বিয়ে হলে ছেড়ে যাওয়া চলত, কিন্তু—এ কি আবার বমি করছ যে?

আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে বিরজার দিকে তাকিয়ে সে পুনরায় বলল—ছোট ছেলের মতন! রাগ করেন অথচ আমাকে নৈলেও চলে না! এমন মানুষ দুনিয়ায় আমি দেখিনি ভাই!

দেশের কাজে টানবার কথা বিরজা ভুলেই গিয়েছিল। মৃদু কণ্ঠে বলল—আপনার রান্নাবান্না হয়নি?

অজয়া আবার একটু হাসল, বলল—দিনের আলো থাকতে কি আর…মেয়েমানুষের শরীর, সবই সয়।

আচ্ছা আজ তাহলে আসি।

যাবেন? আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না! দাঁড়ান, দরজা পর্যন্ত আপনাকে…

ব্যস্ত হবেন না, একাই যেতে পারবো! আর একদিন এসে বরং কথাবার্তা কইবো।—বলতে বলতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বিরজা নীচে নেমে এল।

দরজার কাছে এসে এই সকরুণ অন্ধকারের মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ঠোঁট দুটি কেঁপে ঝর ঝর করে চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। অশ্রুজলের অনির্ব্বচনীয় আবেগে তার বুকখানি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বলল, আশীর্ব্বাদ করে যান ও'কে রেখে যেন আমার মৃত্যু হয়।

চোখ মুছে বিরজা বাইরে আসতেই দ্বিজেন বলল—কি বললে? এল না?

বিরজা বলল—না, ও'র পক্ষে দেশের কাজ করা সম্ভব নয়!

মালিনী বলল—কেন? সম্ভব নয় কেন?

অত্যন্ত স্বার্থপর মেয়ে!—আসুন ডাক্তারবাবু।—বলে বিরজা নিজেই এগিয়ে চলল।

পূরবী

পশ্চিমে পাহাড়ের চূড়োগুলি এরই মধ্যে কখন লাল হয়ে উঠেছে। জানালা দিয়ে গোধূলির আলো প্রবেশ করে ঘরের সমস্ত আসবাবগুলি একপ্রকার রঙীন দেখাচ্ছিল।

খবরের একখানি কাগজ মুখের সুমুখে ধরে রায়-সাহেব মুখ টিপে একটু হাসছিলেন। বয়স তাঁর পঞ্চাশের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বয়সের কথা সব সময় তাঁর মনে থাকে না। সুন্দর সুপুরুষ। মাংসপেশীবহুল সর্বাঙ্গে একটি বয়সোচিত গাম্ভীর্য এসেছে। চুলগুলি একটু পাতলা হয়ে গেছে—হঠাৎ মনে হতে পারে মাথায় তাঁর টাক পড়তে আর বুঝি বিলম্ব নেই। অদূরে জানালার ধারে অনেকক্ষণ থেকে সুমুখে পুরু একখানি কাগজ রেখে হাতে একটি তুলি ধরে নিরুপমা বসে বসে কি ভাবছিল। মাথায় কাপড় নেই, যে বয়সের মেয়ে তাতে সিঁথিতে সিঁদুর থাকা উচিত,—তাও না। কপালের কাছে চুলগুলিতে আলো পড়ে ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয়ে উঠেছিল। চোখের দুটি পাতা সকল সময় মনে হয় যেন জলে ভিজা,—বর্ষণক্ষান্ত উষার মতো। ঘনকৃষ্ণ দুটি আঁখিতারার নিবিড় বিস্ময় ও কৌতূহল একই সঙ্গে কোলাকুলি করে থাকে। সর্বদাই সে-দুটি চোখ যেন কি একটি বস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং পাবামাত্রই তাদের বিস্ময়ের যেন আর সীমা নেই।

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে হঠাৎ নিরুপমা বলল—দুষ্টু! হাসলো না, চোখদুটিই যেন সব কথা বলে দিতে পারে!

কাগজটা মুখের উপর সম্পূর্ণ আড়াল করে রায়-সাহেব আবার হেসে বললেন—আমি ত তোমার দিকে চাইনি, নিজের মনেই হাসছি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে নিরুপমা বসে রইল ; পরে তুলিটা রেখে দিয়ে উঠে এসে রায়-সায়েবের গলা জড়িয়ে ধরে বলল—রাগ কল্লে মেসোমশাই? ওই যে তোমায় দুষ্টু বললাম?

রায়-সায়েব বললেন, রাগ! হুঃ খুব। নতুন রায়-সাহেব হইছি, আজকাল একটু বেশি রাগ না দেখালে মানায় না! পরে নিরুপমার হাতের উপর একটু হাত বুলিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন—অনেকদিন হ'ল তোর কাছে আছি, রাগের বালাই কি আমার আজও আছে রে?

তাঁর কাঁধের উপর মুখ রেখে নিরুপমা বলল—ছবি-টবি আঁকা আমার দ্বারায় হবে না মেশোমশাই শুধু আকাশটাই আঁকতে পারি, আর কিছু না। আচ্ছা, এমন

কেন হয় বলত? আমার মনে হয় কেউ আমার চেয়ে ভাল ছবি আঁকতে পারে না, কিন্তু যেই তুলি নিয়ে বসি অমনি—

রায়-সাহেব আবার একটু হেসে তার গলার উপর হাত বুলিয়ে বললেন—আর গান? সে কথা ভুলে যাচ্ছিস যে দুষ্টু মেয়ে?

নিরুপমা একটুখানি হাসলো। পরে বলল—আচ্ছা মেসোমশাই—?

কি মা?—চুপ করলি যে?

সে কথা শুনলে তুমি হাসবে কিন্তু।—আচ্ছা যে-গান লোককে মিথ্যে মিথ্যে কাঁদায়, সে-গান তোমার ভাল লাগে না?

রায়-সাহেব বললেন—মত প্রকাশ করলে সেই লোকেরাই যে তেড়ে আসবে।—চল মা, সন্ধ্যে হয়ে এল, পাহাড়ি রাস্তায় এর পর বেড়াবার সুবিধে হবে না।

দাঁড়াও, তুমি উঠতে পাবে না কিন্তু। আমি আসি আগে।

পাশের ঘরে গিয়ে নিরুপমা শুধু সাড়ীটা বদ্‌লে এল। আয়নার কাছে গিয়ে মাথার চুলটা একবার ঠিক করে নিল। রায়-সাহেব তেমনি শান্ত ছেলেটির মতো বসেছিলেন; নিরুপমা তাঁর সার্টের উপর কোটটা পরিয়ে দিয়ে বোতাম বন্ধ করে দিল। চিরুণী বুরুষে চুলগুলি দিল বিন্যাস করে। সিগারেটের কেসটা দিল পকেটের মধ্যে। মনি-ব্যাগটাও রাখলো। মাটিতে বসে জুতোর ফিতে বেঁধে দিল। এবং শেষকালে নিজের মোজার উপর ঘুণ্টি-বাঁধা জুতোটা পরে নিল।

পাহাড়ের চূড়ায় বাঁধা ছোট্ট শহরটি। মানুষের বসতি এর চেয়ে আর উঁচুতে উঠতে পারেনি। নীচে অপরিসীম গভীরতা; দিন থাকতেও দিনের আলো পূর্ব্বেই সেখানে অবসন্ন হয়ে আসে।

পাহাড়ের মায়া চিরকালের জন্য নিরুপমার চোখে জাল বুনেছে। এদিক থেকে ওদিকে ঘাড় ফিরিয়ে প্রতিক্ষণেই এত বড় আকাশটিকে সে একবার করে দেখে নেয়। নীচে প্রশান্ত দিক্‌বলয়টাকে ঘিরে শুধু অরণ্যবহুল কতকগুলি ছায়ামূর্ত্তি পর্ব্বত-চূড়া। মাঝে মাঝে ক্ষীণকায়া কয়েকটি গিরি-ঝরণা। দেখে মনে হয় সে নিজেই যেন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, নিজেকে ধরে রাখবার খেই তার নেই।

চলতে চলতে দুজনে কথা হয়—

আচ্ছা মেসোমশাই, এমন দেশ আছে যেখানে পাহাড় নেই?

আছে বৈ কি মা, আমাদের বাংলা দেশ।

বাংলা দেশ? পাহাড় নেই সেখানে। সে কোনদিকে মেসোমশাই?—

রায়-সাহেব বললেন—সমতল বাংলা। সবুজ গ্রাম দিয়ে ঘেরা, কোলে নদী। অশথ গাছ ঝুলে পড়ে নদীর স্রোতের ওপর। বটের ছায়ায় তুলসীতলা—মেয়েরা সেখানে পিদিম দেয়। তুই ত জীবনে যাসনি সেখানে, জানবি কেমন ক'রে?

চোখ দুটি নিরুপমার ঢুলে আসে। পরক্ষণেই বড় বড় চোখে চেয়ে বলে—তারপর মেসোমশাই।

তারপর ? তারপর শালিকে আর বুলবুলিতে সোনার মাঠে চরে' চরে' ধান খেয়ে যায়। দেবদারুর ডালে বসে' ঘুঘু ডাকে, বিলের ধারে বক আর মাছরাঙা উড়ে বসে। আকাশের চাতক বলে' ফটিক জল !—রায়-সাহেব একটু হাসলেন।

মেশোমশাই, এ কি সত্যি ?

আরো আছে মা! নববর্ষার দিনে কদমগাছের তলায় ময়ূরে পেখম মেলে দেয় ! গুরু গুরু মেঘ ডাকে, দিঘীর জলের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে, আর ভীরু মেয়েরা বাঁশবনের অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে, তাদের বুক কাঁপে !

ও !—নিরুপমা বিস্ময়ে মুখ তুলে চায়।

আর আছে মুখর নারকেল-বন। বাংলার কোলে মাথা রেখে নীল সাগরের মধ্যে সে ছড়িয়ে আছে।

সাগর ? সাগর তুমি দেখেছ মেশোমশাই ? নীল জল ?

পর্ব্বতের রাজ্য ছাড়া এ জগতের সবই যেন তার কাছে বিস্ময়! সমস্তই অপরিচয়ের রহস্য দিয়ে ঘেরা।

রায়-সাহেব বললেন—সেই নীল জলের ওপার থেকে আসে মলয় হাওয়া, সে হাওয়া ভারতের আর কোথাও নেই। হাওয়াতেই ত আমাদের বাংলায় রজনীগন্ধা ফোটে, বকুলের কুঁড়ি আর শিউলি !

মেসোমশাই, এ সব কথা তুমি ত কোনোদিন বলনি ?—আনন্দের উচ্ছ্বাসে নিরুপমার চোখদুটি ঝাপসা হ'য়ে আসে। পাতলা দুখানি চকচকে ঠোঁট তার একটু একটু কাঁপে ; ভিতর থেকে ডালিম দানার মতো দাঁতগুলি দেখা যায়।

বলে—কোন্ দিকে মেসোমশাই, আমাদের সেই বাঙলা দেশ ?

হাত বাড়িয়ে রায়-সাহেব দেখিয়ে দেন। ওই দূরে, দেখছিস ? ওই যে মাটির তলা থেকে একটি তারা ফুটে উঠ্‌ছে আকাশের কিনারায়, ওই দিকে বাঙলা !

ওই দিকে ? আমি মনে করেছিলাম বুঝি পশ্চিমে, সূর্য্য যেদিকে অস্ত যাচ্ছে।

না, ওদিকে পাঠান দেশ—কাবুল। ওদিকে আসে যুদ্ধের চীৎকার ডাকাতি, লুট-তরাজ, ওদিকে মানুষে মানুষে কামড়া-কামড়ি ! খুনোখুনি !

মুখ তুলে নিরুপমা আবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকায়। দুই চোখে তার অসহায় অদম্য কৌতূহল আবার স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। বলে—যুদ্ধ ? খুনোখুনি ? মেসোমশাই, তাদের কি এতটুকু দয়া মায়া নেই !

বঞ্চিত হতভাগ্য সেই পশ্চিমের মানুষদের প্রতি অপার করুণায় তার চোখদুটি আবার ছোট হ'য়ে আসে।

রাত্রির নির্ব্বাক নিঃশব্দতায় ঘরখানি আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

শোফায় হেলান দিয়ে রায়-সাহেব গড়গড়ার নলটা এক-একবার টানেন। এবং তাঁর মুখোমুখি একখানি আরাম-কেদারায় বসে' নিরুপমা ইংরেজি খবরের কাগজখানি নাড়াচাড়া করে। টিপয়ের উপর আলোটা জ্বলে। মেয়েটির মুখে কোন রেখা নেই, চোখে যেন সেই শৈশব কালের সরলতা,—আনন্দ-বেদনার কোন দোলা সে

মুখে নেই। প্রদীপের আলো সে মুখের উপর যখন পড়ে, মনে হয় সেখানে বর্ষণ-পাণ্ডুর আকাশের আভাস আছে, পর্ব্বতকান্তারের রিক্ততা আছে, গোধূলির আলো আছে, আর আছে অরণ্যের নিবিড় ছায়া! মানব-ধর্ম্মের আর কোনো ইঙ্গিত কি সে মুখে আছে?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায়-সাহেব বললেন—তারপর নিরু'মা?

খবর?—নিরুপমা বল্‌লে—তেমন খবর আর—ওঃ, আর একটা আছে মেশোমশাই, দাঁড়াও বল্‌ছি।

সীমান্ত-প্রদেশে একটি নারী-হরণের সংবাদ! স্পষ্ট দিবালোকে অন্দরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে একটি সুন্দরী মহিলাকে মুখ বেঁধে ভয় দেখিয়ে দস্যুরা চুরি করে' নিয়ে গেছে! এখনও তার কোনো তল্লাস পাওয়া যায়নি।

হাত কেঁপে কাগজখানা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো! সহসা কে যেন তার গলার টুঁটি টিপে ধরেছে। অস্ফুট ক্লান্ত কণ্ঠে সে শুধু বলতে পারলো, মেসোমশাই?

রায়-সাহেব চোখ বুজে একটুখানি ক্ষীণ হাসি হাসলেন। বললেন—কি মা?

স্ত্রীলোককে চুরি করে' নিয়ে গেল! মানুষ মানুষকে চুরি করে?—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বাইরের কালো আকাশের দিকে চেয়ে সে আবার বল্‌লে—মেসোমশাই, চুপ করে' আছ যে? তুমি বুঝি আশ্চর্য্য হওনি? এ কি তাদের পাপ নয়?

রায়-সাহেব বল্‌লেন—মানুষ এর চেয়েও বড় পাপ করে নিরু' মা!

এর চেয়েও? ও!—নিরুপমার কম্পিত দুটি দৃষ্টি ছলছল করে' আসে। এবং আরও কিছু বলতে গিয়ে তার আওয়াজ রুদ্ধ হ'য়ে আসে।

সংসার যেন তার চোখে দুর্ভেদ্য অজ্ঞতায় ভরা। আকাশের মেঘ আর পথের ধুলো দুইই তার কাছে সমান জটিল এবং পরম রহস্যময়!

দিনের বেলায় সে যা শোনে এবং ভাবে, রাত্রে তাই আবার স্বপ্ন দেখে। সেদিন দেখলো চারিদিকে যেন তার কোলাহল করে' উঠেছে। ভয়ার্ত্ত তাড়নায় পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। মদমত্ত বলদৃপ্তের পরস্পর হানাহানি, যুদ্ধ, মারি-মড়ক, মন্বন্তর! আর দেখলো বহুদূরে—হয়ত এ পৃথিবীর বাইরে, একখানি শস্য-শ্যামল ছায়া-শীতল ভূমিখণ্ড। উৎপীড়িত মানবজাতির প্রলোভনের মতো,—সেখানে বন-বনান্তের বসন্তশোভা, হরিৎক্ষেত্রে হরিণের দল ছুটছে, আর বুলবুলিতে খেয়ে যাচ্ছে ধান, তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে লাজুক ভীরু মেয়েটি প্রণাম করছে! এমন সময় এল মূর্ত্তিমান নির্ম্মম দস্যুতা, ঝড়ে গেল আলো নিবে, দয়াহীন কঠিন বাহু দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে গেল। নদ-নদী প্রান্তর পার হল। তারপর···

তারপরেই তন্দ্রা ছুটে গেল। বেতস পত্রের মতো সে তখন থর থর করে' কাঁপছে। পদ্ম-পলাশের মতো চোখ দুটি তখন তার সত্যিই ভয়বিহ্বল হয়ে' উঠেছে। আর একটু হ'লেই সে হয়ত চীৎকার করে' উঠতো। কম্পিত রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলো—মেসোমশাই?

কি মা?

তাড়াতাড়ি নিরুপমা উঠে দাঁড়ালো। বলল—অ্যাঁ, তুমি জেগে ছিলে এতক্ষণ? আমি মনে করি বুঝি—

একটু হেসে রায়-সাহেব বললেন—জেগে আছি শুধু ত আজ নয় মা, বহুদিন থেকে তোর মাথার কাছে এমনি করে'ই জেগে আছি। ভয় হয়েছিল বুঝি নিরু'মা;

অপরিসীম শ্রদ্ধায় এবং কৃতজ্ঞতায় গলা বুঁজে এল। কাছে গিয়ে হেঁট হ'য়ে তাঁর কপালের উপর মাথাটি রেখে গলা জড়িয়ে ধরে' গদগদ কণ্ঠে বললে—তুমি আমার জন্য অনেক করেছ মেসোমশাই। আমার জন্যে তুমি—

এমন সময়ে বাড়ীর নীচের দিকে পাথর-বাঁধানো গড়ানে রাস্তাটা—যেটা অনেক দূরে গোরস্থানের কাছে গিয়ে মিশেছে—সেখানে এক-সঙ্গে অনেকগুলো জুতোর শব্দ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

মুখ তুলে নিরুপমা বললে কে ওরা মেসোমশাই? এত রাতে…অন্ধকারে…

এ পথ দিয়ে ওরা রোজই যায় মা।

রোজ যায়? দেখি ত'। উঠে গিয়ে নিরুপমা জানলার কাছে দাঁড়ালো।

পথের মুখে একটা সরকারী গ্যাসের আলো জ্বলছে। গলা বাড়িয়ে সেই দিকে তাকিয়ে ভীত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে বলতে লাগলো মেসোমশাই, ওরা সব গোরা সৈন্য, হাতে সকলের এক একটা টর্চ্চের আলো—

অ্যাঁ, সকলের সঙ্গেই যে এক একটি মেয়ে! স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে এত রাতে… এবং তারপর হঠাৎ কি যেন লক্ষ্য ক'রে লজ্জায় দুহাতে মুখ ঢেকে নিরুপমা তাড়াতাড়ি সরে' এল। তার অপরাধই যেন সব চেয়ে বেশি!

মিনিট কয়েক নিঃশব্দে কেটে গেল। এক সময় মুখ ফিরিয়ে নিরুপমা বলে' উঠলো, তোমার কি কিছুই বলবার নেই, মেসোমশাই?

শান্ত, সংযত, সস্নেহ কণ্ঠে রায়-সাহেব বললেন—ওসব কিছুই নয় মা, ওরা অমনি গোরস্থানের দিকে রোজই যায়। রাত অনেক হয়েছে, তুমি শুয়ে পড়গে। আচ্ছা থাক, আমিই আলোটা নিবিয়ে দেবো'খন।

পুষ্প-স্তবকের মতো দুলতে দুলতে নিরুপমা গিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো।

দিন কয়েক বাদে একদিন সকাল বেলা। ন'টা-দশটার সময়।

ডাক শুনে নিরুপমা বেরিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। রায়-সাহেব বললেন—অতিথি এঁরা, কাশ্মীরের ফেরত দিল্লী যাবেন, ও-বেলায় মোটর ছাড়বে। রাস্তা থেকে ধরে' নিয়ে এলাম নেমন্তন্ন করে'।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অল্পবয়সী। ঘোমটা-টানা বউটি এসে নিরুপমার হাত ধরলো। স্বামীটির হাত ধরে' রায়-সাহেব বললেন—বহুভাগ্যে অতিথি মেলে, এসো ভায়া, ঘরে বসে' ততক্ষণ চা খাওয়া যাক্।

ঘরে-বাইরের অনড় নিবিড় শান্তিটা তবু যা হোক একটুখানি মুখর হ'য়ে উঠলো।

চমৎকার অতিথি! ঘণ্টাখানিক দেরি লাগলো না সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে

যেতে। রায়-সাহেব বললেন, না, না, কোনো লজ্জা নেই, সতীশকে ভায়া বলে' ফেলেছি, সুতরাং—তুমিও আমার সঙ্গে কথা কইবে সুলতা।

সুলতা লাজুক মেয়ে নয়। বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এইবার তাহ'লে মুখ ফিরিয়ে চলে যান, ভাসুরের সঙ্গে বাঙালির মেয়ে কথা কয় না।

সতীশ হো হো করে' হেসে উঠলো। নিজের সুন্দরী স্ত্রীর সম্বন্ধে তার একটুখানি দুর্ব্বলতা আছে; সচরাচর যা হ'য়ে থাকে। বললে—দেখলেন দাদা দেখলেন, ওর সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা শক্ত!

আত্মীয়তাটা যেন উভয় পক্ষের মনে লুকিয়ে ছিল।

রায়-সাহেব বললেন—তা হলে শোনো সুলতা দিদি, ভারিক্কে ভাসুর হ'তে গিয়ে আনন্দের পথ বন্ধ করতে চাইনে। সুতরাং মা বলাটা আপাতত স্থগিত রেখে দিদি চালাই। রাজি আছো তো ভাই?

খুব—বলে সুলতা হাসতে লাগলো।

তবে ভাই এ বেলা আমাদের পরিবেশন করে' খাওয়াও। বাঙলার লক্ষ্মী তুমি, তোমার হাতে বহুকাল অন্নগ্রহণ করা হয়নি।—

রান্না-বান্না চড়লো; বেশ খানিকটা গোলমাল সুরু হ'য়ে গেল।

হাতে চুড়ি, তাগা, বালা, গলায় হার, কানে দুল, সীঁথিতে সিন্দুর পরণে বেনারসী শাড়ী—তার পিছনে আছে গৃহস্থালীর মাধুর্য্য; স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা।

নিরুপমা নিঃশব্দ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। এরা যেন তার কাছে অপরিচিত মানব মানবী। চোখ দিয়ে শুধু দেখতেই পারে কিন্তু মন দিয়ে আপনার বলে' গ্রহণ করতে পারে না।

হাত ধরে সুলতা বললে—কি ভাই, কথা বলচো না যে?

কথা! কি কথা সে বলবে? কেমন করে' আরম্ভ করবে? কথা শুনে কথার উত্তর দেবে কি করে? সুলতার হাতের মধ্যে অবশ শিথিল হাতখানি তার একান্ত সংকোচে কাঁপতে লাগলো। কম্পিত কণ্ঠে বললো—আমি জানিনে।

গলা ধরে' সুলতা বললে—বাঙলা কথা ত জানো?

পিছন দিকে মাথাটা একটু সরিয়ে নিয়ে নিরুপমা বললো—হুঁ, আমি যা বলি সবই মেসোমশায়ের কথা, তিনি আমায় শিখিয়েছেন—

সুলতা ছাড়ে না। বলে—আমার কাছে তুমি চুপি চুপি নিজের কথা বলবে ত?

নিজের কথা?...সে কি?

এমন সময় সতীশ এসে ঢুকলো। এদিকে ওদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বিস্ফারিত ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে নিরুপমা তার দিকে তাকালো। সুলতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করলো না, অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টির কাছে নারীসুলভ কোনো লজ্জাও তাকে স্পর্শ করলো না,—শুধু ভয় ব্যাকুলতার মর্ম্মান্ত উত্তেজনায় সুলতার দুটি নিটোল বাহুর মধ্যে বার বার তার সর্ব্বশরীর ঘেমে উঠ্‌তে লাগলো।

সতীশ বিস্ময়ে ও লজ্জায় আরক্ত মুখে সেই পথেই আবার বেরিয়ে চলে গেল।

সুলতা তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল—আশ্চর্য্য মেয়ে ত তুমি?

সতীশের পথের দিকে নিরুপমা তেমনি করেই তাকিয়েছিল। একবার মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে সে বলল—খবরের কাগজ আপনি পড়েন?…'নারী-হরণের' সেই খবরটা—

সে কথাটি বোধকরি আজও সে ভুলতে পারেনি। পুরুষ জাতির প্রতি তার বিতৃষ্ণা নয়—কেমন যেন একটা বিভীষিকা জন্মে গেছে!

কিন্তু সুলতা কিছুই জানে না। বল্লে—তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায় ভাই? বাঙলা দেশে নয় বুঝি?

ঘাড় নেড়ে নিরুপমা জানালো—না!

তোমার স্বামী?…নেই? ও—

রায়-সাহেব এসে ঘরে ঢুকলেন। কথাগুলি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন—বিয়ে হয়েছিল ভাই একদিনের জন্যে। পরদিন বিধবা হয়ে…দশ বছরের মেয়ে! ভাবলাম ভাগ্যের ইঙ্গিত হচ্ছে আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় সত্যি!

নিরুপমা চেয়ে রইলো এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে। কোনো ঔদাসীন্যও নেই, বিষণ্নতাও নেই,—নিজের জীবন সম্বন্ধে কোনো স্মৃতিই যেন তার মনে জাগে না!

রায়-সাহেব আবার বল্লেন—সেই থেকে বুঝলে দিদি, আমি ওকে ছাড়তে পারিনি। অনাথা বলে' নয়, আমি ছাড়া ওর কেউ নেই সে জন্যেও নয়,—ওকে আমি চিনি তাই জন্যে। ও আমার চিরকালের বন্ধু হয়ে গেছে।

সুলতার চোখে জল এল। নিরুপমা তেমনি করেই রায়-সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে তার যেমন মমতা, অপরিমিত শ্রদ্ধা! সে চোখদুটি প্রতিনিয়তই যেন অন্তরের ভাষাটি প্রকাশ করে' বলে—মেশোমশাই, তুমি আমার অনেক করেছ!

বেলা বেশি হয়ে যাচ্ছিল। খাবারের আয়োজন হল।

সুলতা আহার এবং রায়-সাহেব রস পরিবেশন করলেন।—খেতে বসে' সতীশ বল্লে—ঋণী রইলাম দাদা।

একটু হেসে রায়-সাহেব বললেন—সত্যি? তা হ'লে ভায়া আমি একটু বেশি ব্যবসাদার, মনে করে' কোনো এক সময় তাড়াতাড়ি এসে আমার ঋণটা পরিশোধ করে' যেয়ো। ধার আমি ফেলে রাখিনে।

সতীশ এদিক ওদিক চেয়ে হাসতে লাগলো। সুলতাও হাসলো। কিন্তু দেখা গেল, অজ্ঞ শিশুর মতো সহজ স্মিতমুখ নিয়ে নিরুপমা একধারে বসে' রয়েছে। তার নির্ব্বোধ দৃষ্টিতে রসালাপের কোনো ছায়াই পড়েনি!

কুণ্ঠিত-সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে সতীশ তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। এ মেয়েটি যেন তার কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে রইল।

সুলতা বলল—আর কি দেশে আপনারা ফিরবেন না?

দেশে ?—রায়-সাহেব বললেন—ফিরবো বৈকি, আর বেশি দেরি নেই, বছর পনেরো বাদে পেন্সন হ'য়ে গেলেই দেশে চলে যাবো।

সুলতা বা সতীশ কেউই এ কথায় হাসলো না। বিস্মিত ও ব্যথিত দৃষ্টিতে রায়-সাহেবের দিকে তাকালো। এ'দের এই দীর্ঘ পনেরো বছর কেমন ক'রে যে কাটবে তা যেন স্পষ্ট চোখের সামনে ফুটে উঠলো। সে পনেরো বছরের প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি দিনের মতই নিরানন্দ, বিষণ্ণ ও শ্লথগতি!

সতীশ বলল—হয়ত এই ক'বছরের মধ্যে আরো দু'একজন অতিথি আসবে, কি বলুন দাদা?

নিরুপমার দিকে একবার তাকিয়ে রায়-সাহেব বললেন—আসতেও পারে, আর হয় ত তোমাদের মতোই তারা এক একবার এসে জিজ্ঞাসা ক'রে যাবে, আর কতদিন বাকি! সময় কি তোমাদের হয়ে এল? আর আমরা বলবো, না, দিন আমাদের এখনও ফুরোয় নি! পেন্সন এখনও নেওয়া হয়নি!

সুলতা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চোখের জল চেপে রইল। আর সতীশ দেখলো, দরজার পাশে নিরুপমা ঠিক তেমনিই বসে' আছে। এতক্ষণ কি কথাবার্ত্তা যে হ'য়ে গেল, তাতে যেন তার কিছুই যায়-আসে না!

বিদায় আসন্ন হ'য়ে এল। পঞ্চাশ মাইল প্রায় এখান থেকে মোটরে গেলে তবে একটি পাহাড়ি রেল-ষ্টেশন পাওয়া যাবে। সকাল সকাল বেরোনো চাই।

চুপি চুপি সুলতা বলল, তুমি ও'র সঙ্গে একটি কথাও কইলে না ভাই!

অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা কইতে হবে শুনেই নিরুপমা যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়লো। সে বরং সতীশের কাছে গিয়ে চুপ করে' দাঁড়াতে পারে কিন্তু কথা কেমন করে সে বলবে? সুলতার কাছে দাঁড়িয়ে সে মাথা হেঁট করে রইল।

সুলতা তার কাঁধের উপর হাত রেখে বলল—ডাকবো?

ভীত দুটি বড় বড় চোখ তুলে সে বলল—ভয় করে!

ভয়! তবে থাক। সুলতা একটু অপ্রস্তুত হয়ে আড়ালে গিয়ে যাবার আয়োজন করতে লাগলো।

জিনিস পত্র বাঁধাই ছিল। পাহাড়ি কুলিটা সেগুলো পিঠের উপর বেঁধে নিয়ে হেঁট হয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলতে লাগলো।

রায় সাহেব বললেন—চল ভায়া' 'সানি ব্যাঙ্ক' পর্য্যন্ত যাই তোমাদের সঙ্গে, ওখানেই ভাড়াটে মোটর গাড়ী দাঁড়ায়। চল পেঁছে দিয়ে আসি।

যাবার সময় সুলতা শুধু বলল—কিছু মনে করো না ভাই, তোমার নিজের কথা জিজ্ঞাসা করে হয়ত তোমাকে দুঃখ দিয়ে গেলাম!

নিরুপমা বলল—কই না, তা ত' আমার মনে হয় নি।

সকলে মিলে পথে গিয়ে নামলো। নিরুপমা গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালো। বিদায়ের সময় না পড়লো তার নিশ্বাস, না এলো মুখে কোন সম্ভাষণ,—নিঃশব্দ, নির্ব্বিকার দৃষ্টিতে পথে সে চেয়ে রইল।

খানিক দূর গিয়ে—বোধ হয় অন্যায় হবে এই ভেবে—সতীশ একবার ফিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে ছোট একটি নমস্কার জানালো !

কিন্তু সে-ভদ্রতার প্রতিদানে নিরুপমা তার বোবা ও নিরর্থক দৃষ্টি মেলে শুধু দাঁড়িয়েই রইল—এক চুল নড়লো না পর্যন্ত।

সতীশের মনে হল, সে কি পাথর !

সন্ধ্যার পর রায় সাহেব ফিরে এসে চেয়ারের উপর বসে পড়লেন। নিরুপমা তাড়াতাড়ি এসে তাঁর জামার বোতাম খুলে দিতে লাগলো। পরে জামাটা খুলে একটা হুকে যত্ন করে টাঙিয়ে রেখে জুতোর ফিতে ও মোজা খুলে দিল।

রায় সাহেব বললেন—একলা আমাকেই শুধু তোর ভাল লাগে—না নিরু' মা ? সঙ্গে কেউ থাকলে বোধ হয় তোর অসুবিধে হয় কি বলিস ?

নিরুপমা একটু হাসলো। পরে উঠে একবার ঘরের মধ্যে গেল এবং পুনরায় বেরিয়ে এসে বলল—এই রুমালখানা ওঁরা যাবার সময় ফেলে গেছেন মেশোমশাই ! বোধ হয় ভুলে কোনোরকমে—

রুমাল !—কই দেখি ?

রুমালখানি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রায়-সাহেব বললেন—সিল্কের রুমাল দেখছি, এই যে সতীশের নাম লেখাও রয়েছে এই কোণে !—অনেকদূর এতক্ষণ চলে গেছে, ঠিকানাও রেখে যায় নি।

তা হ'লে কি হবে ?

তুলে রেখে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি মা ? যদি কোনো দিন আবার দেখা হ'য়ে যায়—

রুমালখানি আবার হাতে করে নিয়ে নিরুপমা ঘরের মধ্যে গেল। রায়-সাহেব তার পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

কুড়িটি বছর তারপর পার হয়ে গেছে।

বাঙলার এক নিভৃত পল্লীতে,—চারিদিকে শাল-বন, কাছেই ছোট কাসাই নদী, পিছনে দিগন্ত-বিস্তার ধানের ক্ষেত, সেখানে শালিক আর বুলবুলির ঝাঁক চরে বেড়ায়। মাঠের ধার দিয়ে বনের কিনারা দিয়ে গ্রাম্যপথখানি প্রায় নদীর কোলে গিয়ে মিশেছে। নদীতে খেয়া চলে। শীতের শেষে চর জেগে ওঠে, ওপারে চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা বসলে এপারের যাত্রীরা হেঁটেই পার হয়ে যায়।

সমাজ-বিচ্ছিন্ন দুটি সঙ্গীহীন নরনারীর আবার এইখানে দেখা মেলে। রায় সাহেব এখন বৃদ্ধ। অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে মাথার চুলগুলি শাদা হয়ে গেছে, ললাটে তাঁর সায়াহ্ন দিনের রেখা, চোখে অবসন্ন বার্দ্ধক্য।

পল্লীর ধূসর সন্ধ্যা আজও তাঁদের কাছে তেমনি বাণীহীন বিষণ্ণ বিধুর। নির্ব্বান্ধব নিঃসঙ্গ ঘরখানির মধ্যে আজও তেমনি অবিচ্ছিন্ন শান্তির কণ্ঠ রোধ হ'য়ে আসে। এবং আজও তাঁর পদতলটী আশ্রয় করে, একান্ত মমতাময়ীর মতো নিরুপমা ম্লান প্রদীপ-শিখার দিকে চেয়ে বসে' থাকে। মাথার চুল তার কয়েকগাছি শাদা হ'য়ে

গেছে, কপালের-মুখে প্রৌঢ়ত্বের জীর্ণতা, সুন্দর দুখানি হাতের মাংস ঝুলে পড়েছে। চোখদুটি অকম্পিত, আত্মসমাহিত! শাড়ীর বদলে পরণে শুধু শাদা থান। তপঃক্লিষ্টা, বিশীর্ণদেহা—তাপসী নিরুপমা!

রায়-সাহেব মাঝে মাঝে তার দিকে তাকান। ভাবেন এ তিনি কি করেছেন? নারীর আশ্রয়দাতা হ'তে গিয়ে তিনি যে তিলে তিলে তার শৃঙ্খলাবদ্ধ যৌবনকে হত্যা করেছেন! এ যে অন্যায়, এ যে পাপ! পরম যত্নে তিনি তাকে লালন-পালন করেছেন, কিন্তু ওই একান্ত নির্ভরশীলা মেয়েটির সারা জীবনের আনন্দটুকুকে নির্বাসিত করে' দেবার অধিকার কে তাঁকে দিয়েছিল?

ধীরে ধীরে উঠে তিনি বাইরে চলে' যান। বারান্দায় পায়চারি করে' বেড়ান। অন্ধকার রাত্রির দিকে তাঁর ক্ষয়ক্ষীণ শীর্ণ দৃষ্টি মেলে দিয়ে হয়ত ভাবেন—প্রতিদিন প্রতি পলে ঐ মেয়েটি তাঁর দেওয়া মরণের রস ক্রমাগত অঞ্জলি ভরে' পান করেছে। এ তিনি কি করলেন?

তিমির-রাত্রির পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নিরানন্দ মূক জীবনের অভিশাপের মত তাঁকে চেপে ধরে।

কে ও? নিরু' মা?

নিরুপমা সরে এসে একটি হাত তাঁর ধরে' বললো—ঠাণ্ডা লাগবে যে মেসেমশাই? ভেতরে এসো।

ভিতরে নিয়ে গিয়ে কাছে বসিয়ে নিরুপমা হঠাৎ বলল—এ কি? চোখ দিয়ে তোমার জল পড়চে যে মেসোমশাই? দিনরাত আজকাল তুমি যেন—

রুদ্ধকণ্ঠে রায়-সাহেব বললেন—ক্ষমা চাইতে যে লজ্জা করে মা, তাই ত চোখে জল আসে।

নিরুপমা চুপ করে' রইল; আজও যেন সে নিঃশব্দে বলছে—তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ মেসোমশাই!

খানিকক্ষণ পরে রায়-সাহেব বললেন—বুকের কাঁপুনিটা আজ আবার একটু বেড়েছে মা, সেই ওষুধটা যদি একবার—

বলতে বলতেই নিরুপমা উঠে দাঁড়ালো। বলল—ও ঘরে বাক্সের মধ্যে আছে, এখুনি এনে দিচ্ছি! খেলেই কমে যাবে।—বলে' সে বেরিয়ে গেল।

সেই যে গেল আর আসে না—আলোটাও হাতে করে' নিয়ে গেছে,—ঘর অন্ধকার!

গলা বাড়িয়ে রায়-সাহেব বললেন—খুঁজে না পাস্ ত থাক্ না আজকের মতো; একটু কমে' গেছে! কাল সকালে বরং—

কোনো সাড়া এলো না। তিনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। দরজা পার হ'য়ে বারান্দা দিয়ে এ-ঘরে এলেন। দেখেন বাক্স খোলা, কতকগুলো জিনিষপত্র এলোমেলো ভাবে মেঝের উপর ছড়ানো,—আলোর দিকে চেয়ে নিরুপমা নিঃশব্দে বসে' রয়েছে। ঠিক পাথরের মতো!

বললেন—রাত অনেক হয়েছে মা, এরপর খাওয়া দাওয়া কল্লে···থাকগে ওগুলো পড়ে, কাল সকালে গোছালেই হ'বে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার তিনি বললেন—আজ তোমার মুখখানি কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়েছিস—না মা? শরীরটাও যেন তোর ক'দিন থেকে···কথা কচ্ছিসনে যে?

নিরুপমা তবুও কথার উত্তর দিল না। রায়-সাহেব বললেন ওখানা কি মা তোর হাতে? রুমাল? সিল্কের মনে হচ্ছে যেন···ভারি চমৎকার ত? দিবি মা আমাকে নতুন বছরের উপহার,—ও কি রাগ করলি বুঝি ছেলের ওপর? নিরু'মা?

নিরুপমা ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালো। আলোয় দেখা গেল, বড় বড় দু'ফোঁটা জল তার চোখে চক্‌চক্‌ করছে।

প্রেতিনী

সব সাধ আহ্লাদ ঘ্চে যায়—তখন তের বছরের মেয়ে। বিয়ের তিন দিন না : স্বামী হ'ল দেশত্যাগী। কপালের সিঁদ্রের চিহ্নটুকু রইল কিন্তু হাট গেল ঙে। সে ভাঙা-হাটে আসর আর জমলো না। সধবা. বিধবা ও কুমারীর একত্র াবেশে চন্দ্রময়ী হ'য়ে রইল সকলের চোখে একেবারে অপ্র্ব !

সংযম এবং সতীত্বের পরীক্ষা চলল বছরের পর বছর। চন্দ্রময়ীর হৃদয়াবেগ ছিল , ব্যর্থতার বেদনা ছিল না, স্তরাং পথ চলতে গিয়ে পা তার এতটুকু টলেনি। সে-খেলে, ভালমন্দ খেয়ে, ঝগড়া-ঝাটি ক'রে, পরের সেবা ক'রে, তীর্থে তীর্থে রে, রামায়ণ, মহাভারত প'ড়ে দিব্যি বয়সটা গেল কেটে।

যেটুকু চঞ্চলতা ছিল থেমে গেল' আগ্ন যেটুকু ছিল ধ্ইয়ে ধ্ইয়ে গেল ছাই হ'য়ে। ক্তর মধ্যে জল মিশে পাতলা হয়ে গেল, ব্দ্ধিব্ত্তিটাকে আচ্ছন্ন করল আসন্ন-র্ধক্যের একটি অস্পষ্ট ছায়া !

চন্দ্রময়ীর বয়স এই সবেমাত্র চল্লিশ পার হ'য়েছে। জীবনে তার একটিও ভালো-সা হ'য়েছিল কি না কে জানে ! হয়েও থাকতে পারে ! স্ত্রীর মতো ক'রে একজনও উ ভালবাসেনি—বয়স্থা কোনো মেয়ের পক্ষে এ কথা যে অতিরিক্ত সম্মানহানিকর ! লবাসিনি এ কথা অনেক মেয়েই বলতে পারে, কিন্তু ভালবাসা পাইনি এ কথা বলতে য়েদের ম্খে কেমন যেন আটকায়।

চন্দ্রময়ীর বাসস্থানটি—বাড়ীটি নিতান্ত ছোট নয়। কিন্তু কে যেন কর্ত্তা এবং কে যে বাস করে তা আজও পর্য্যন্ত জানা যায়নি। তিনটি তলায় সবশ্দ্ধ অনেকগ্লি রান্দা এবং দালান, ধর্ম্মশালা ব'লে ভুল হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নয় ; আতিথ্য বার এমন অবাধ স্বিধাও সহজে মেলে না। মাঝের তলায় যে ঘরখানি এতদিন লিই পড়েছিল, সেদিন দেখা গেল একটি স্বামী ও স্ত্রী এসে সেখানি দখল ক'রে সছে।

বউটি ছেলে মান্ষ। নিজেই রাঁধে বাড়ে, নিজেই সব কাজকর্ম্ম করে ; এবং মীর অন্পস্থিতিতে দেখা যায় যে ঘরের মধ্যে খিল এঁটে দিয়ে নিঃসাড়ে ঘণ্টার পর টা কাটিয়ে দেয়। যে প্র্ষ মান্ষের ভিড় চারিদিকে !—লোকজনের যাতায়াত দণ্ডও কামাই নেই।

তেতলা থেকে চন্দ্রময়ী একদিন নেমে এল, দরজার কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে টি দরজা খ্লে দিল, চন্দ্রময়ী একটুখানি হেসে জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কি ?

এমন আকস্মিক কৌতূহলের সঙ্গে বউটির পরিচয় ছিল না। আস্তে আস্তে বলল—নিরুপমা।

নিরুপমা? বেশ নাম। আচ্ছা নিরু ব'লেই ডাকবো।—ও-কি অবেলায় মাথার চুল এলো কেন? চুল তোমার একেবারে মেঘের মতন বাছা! ব'সো বেঁধে দিয়ে যাই।

নিরুপমা আর প্রতিবাদ করতে পারল না। কাঁটা চিরুণী ফিতে বা'র করে আনল। চন্দ্রময়ী ভিতরে ঢুকে তাকে কোলের কাছে নিয়ে চুল বাঁধতে ব'সে গেল।

কি করেন তোমার স্বামী, হ্যাঁ বৌমা?

দোকান আছে।

ও।—ছেলেপুলে ক'টি?

—এখানো কিছু হয় নি।

চুল বাঁধতে বাঁধতে চন্দ্রময়ী এদিক ওদিক তাকায়। বদ্ অভ্যাস একটি তার ছিল বৈ কি! ভ্রূ-কুঞ্চিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার কেমন একটা পীড়াদায়ক সন্দেহ আর উদ্বেক দেখা যেত।

ও-ছবিটি কার বৌমা? ওই যে জানলার পাশে?

উনি আমার বড়কাকা।

ও, সেলাইয়ের কাজ রয়েছে দেখছি; সেলাই কর?

হুঁ!

আচ্ছা; বাসিফুল অতগুলো জমিয়ে রেখেছ কেন? তোমার স্বামী বুঝি এনে রেখেছেন?

হুঁ।

তা বেশ বেশ, বলি হ্যাঁ মা, ঘরটা ঝাঁট দাওনি?

বউটি বলল—দেবো এইবার।

চুলের মধ্যে কাঁটা গুঁজে দিয়ে চন্দ্রময়ী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। পরে বলল—তোমরা বুঝি কলাইয়ের বাসন ব্যাভার কর বৌমা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওগুলো কিসের কৌটো? মসলা-পাতি থাকে বুঝি?

প্রশ্নের পর প্রশ্নে নিরুপমা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠেছিল। চন্দ্রময়ী বুঝতে পারল কি না কে জানে। উঠে যাবার আগে বলল—দেখি বৌমা, একবার এদিকে ফেরো ত!

নিরুপমা ঘুরে বসতেই তার মুখখানি ধ'রে চিবুকটি নেড়ে আদর ক'রে চন্দ্রময়ী বলল—বেশ বৌ, খুব পছন্দই। তারপর উঠে চ'লে যাবার সময় ব'লে গেল—তুমি আমার মেয়ের বয়সী! আচ্ছা মা, আবার আসব'খন।

নিরুপমা অবাক হ'য়ে তার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাড়াতাড়ি সে তেতলায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দরজার কাছে গিয়ে ... দাঁড়িয়ে সে খুব হাসতে লাগল। এ হাসির মধ্যে নারীর অন্তর-মাধুর্য্যের তীব্র তীক্ষ্ণতাই ছিল পরিমাণে কিছু বেশী। এ হাসি দেখলে জয়ের হাসকেই শুধু মনে পড়ে।

চন্দ্রময়ী জীবন-যাত্রার যে কোনো শৃঙ্খলা নেই তা বেশ বোঝা যায় তার গোছালো ঘরখানির চারিদিকে তাকালে। কাপড়ের কুটি, ভাঙা টীন, ছেঁড়া বানা, পুরানো, হাড়ি ফুটো থালা,বাসন প্রভৃতিতে ঘরখানি একেবারে বোঝাই। মকাঠের একটা খোলা মাঝারি সিন্দুকের মধ্যে আরশোলা গিজগিজ করছে, পায়া াঙা জলচৌকী চিৎ ক'রে তার উপর রাজ্যের জঞ্জাল জড়ো করা, কাঁচকড়ার কটা তোবড়ানো পুতুল মাথা-কাটা অবস্থায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। চন্দ্রময়ী এসব কোনদিন খেয়ালেই আসে না। সে যে রান্নাবান্না ক'রে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে াকে কেমন ক'রে এটি ভাববার কথা!

সারাদিন চন্দ্রময়ীর কাজ ফুরোত' না, অবসর ছিল না তার এতটুকু, কিন্তু ী যে সে কাজ, সমস্তক্ষণ ঘুরে ঘুরে কেন যে সে শশব্যস্ত থাকত,—বিশেষরূপে র্য্যবেক্ষণ না করলে তার হদিস পাওয়া যেত না। সকলের সঙ্গে একটু-আধটু ড়িয়ে থাকলেও তার কোনো স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব নেই; সকলের মাঝখানে থেকেও সকল ানুষের থেকে দূরে ছিল তার স্থান। রাসভারীও ছিল না তার, হাঁটলে বা ছুটলে ার পায়ের শব্দও হ'ত না! চোরের মতো গোপন আনাগোনায় সে ছিল তিরিক্ত অভ্যস্ত।

নিচের তলার ঘরগুলি বিশেষ বাসযোগ্য ছিল না, দু'-তিনখানি নোঙরা অন্ধকার র এই সেদিন পর্য্যন্ত খালিই প'ড়ে ছিল। অনেকদিন অনেক সময় এই ঘরগুলি বকে চন্দ্রময়ীকে চট্ ক'রে বেরিয়ে চলে যেতে দেখা গেছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে ল্‌ত—এমনি, যদি কেউ আসে···ঘর-দোর পরিষ্কার থাকলে ভাল দেখায়।

অনুমান তার মিথ্যে নয়, লোকজন এল। গুটি তিন-চার যুবক ছুটিতে পশ্চিমে হাওয়া খেতে এসেছে। থাকবে কিছুদিন।

চন্দ্রময়ী কার একটা ফুটো-সারানো বালতি নিয়ে উপর থেকে নেমে এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল—কুলোবে ত বাবা, দু'খানি ঘরে তোমাদের চলবে? কাশীর বাড়ী সব এমনিই বাবা, সব জায়গাতেই অন্ধকার!

একটি ছেলে বলল—চ'লে যাবে কোনরকমে। এটা ত আপনার বাড়ী, নয়?

আর বাবা, আমার জিনিষ কি আর বলা চলে? এসব তোমাদেরই, আমি শুধু আগুলে দরোয়ানের মতন ব'সে আছি। তোমার নাম কি?

ভূপতি। আর এই আমার বন্ধু দয়ানন্দ, আর উনি নিখিল।

চন্দ্রময়ী গিয়ে কল থেকে এক বালতি জল এনে রাখল, পরে জলের উপর ঢাকা দিয়ে ঝাঁটা এনে ঘর ঝাট দিতে সুরু ক'রে দিল। ছেলেরা নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তার

দিকে একবার তাকালো, পরে বলল—কি করছেন? এ কি ভালো হ'চ্ছে? এত করলে আমাদের এখানে থাকতে লজ্জা হবে যে।

চন্দ্রময়ী একটুখানি হাসল শুধু। এবং সে হাসি এমনিই যে এ কাজে যেন আর কারো অধিকার নেই, এ শুধু তারই একার!

এমনি ক'রেই হ'ল আত্মীয়তা, এমনি মুখ-থাবা দিয়েই নিল চন্দ্রময়ী পরের উপর অধিকার! অনাত্মীয়ের সেবার এই যে অনাহত আতিশয্য—এর টান ছিল চন্দ্রময়ীর ভয়ানক বেশী।

দোতলায় যিনি থাকেন তিনি একজন প্রবীণ ডাক্তার, বয়স আন্দাজ বছর-পঞ্চাশ। কাঁচা-পাকা চুল। বিপত্নীক। একটি তরুণী প্রমুখ কয়েকটি ছেলেপুলে নিয়ে তিনি বেশ শান্তিতেই বসবাস করেন।

মেয়েটির বিবাহের কথা চলছিল। তা' বয়স হ'য়েছে বৈ কি! চন্দ্রময়ী একদিন তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল,—কলঘরের মধ্যে। এক হাতে গলাটা জড়িয়ে আর একহাতে চিবুকটি ধ'রে বলল—বিয়ে হবে, হ্যাঁ রে বিনীতা?

বিনীতা লেখাপড়া-জানা মেয়ে, সুতরাং তার চেহারায় একটি গাম্ভীর্য্যের ছায়া আছে। বলল—এমন আড়ালে ডেকে চুপি-চুপি জিজেস কচ্ছেন কেন? হ'লে ত আর লুকিয়ে হবে না।

না, তাই বলছি—চুপি চুপি চন্দ্রময়ী বলল—সত্যি হবে?

মেয়েরা আর কবে চিরকাল আইবুড়ো থাকে, মাসিমা?—বিনীতা গড়গড় করতে করতে উপরে উঠে এল।

কোনো মানুষের অবজ্ঞা চন্দ্রময়ীকে আহত করে না।

ভূপতি এবং তার বন্ধুরা বাড়ী ছিল না, চন্দ্রময়ী একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল। কি তার উদ্দেশ্য তা শুধু সে-ই জানে। ফিরে এসে উপরের সিঁড়িতে পা দিতেই তার নজর পড়ল কতকগুল এঁটো বাসনের উপর। বাসনগুলি ভূপতিদের। চন্দ্রময়ী নেমে এসে সেগুলো কলতলায় নিয়ে গিয়ে মাজতে ব'সে গেল। বামুনের মেয়ে—কিন্তু জাতিভেদের সংস্কার তার তখন মনেই এল না।

কাজ হ'য়ে গেলে ধোয়া বাসনগুলি এনে দরজার কাছে গুছিয়ে রেখে তৃপ্ত মনে সে উপরে উঠে এল। হঠাৎ সুমুখে ডাক্তার বাবুকে দেখেই লজ্জায় ও সরমে মাথার কাপড় আর একটু টেনে দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে সে আবার তেতলায় উঠে গেল। ডাক্তার বাবুকে দেখলে তার বুকের রক্ত বুকের মধ্যেই দাপাদাপি করে!

নিজের ঘরে এসে সে হাঁপাতে লাগল। উত্তেজনায় মুখখানা তার রোমাঞ্চ হ'য়ে এসেছিল। ডাক্তার বাবু কি তার মুখের চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন?

রূপ? চন্দ্রময়ীকে দেখলে গা ঘিনু ঘিনু করে। বিরলকেশ; দাঁত উঁচু সাপের চোখের মতো দুটো ছোট ছোট চোখ, হাত-পাগুলি কদাকার, চির-উদাসীর মতো এক-খানি শীর্ণ দেহ,—চন্দ্রময়ী যেন বিধাতার সৃষ্টির ব্যর্থতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অপরাহ্নের আলো ম্লান হ'য়ে এসেছে। চন্দ্রময়ী আবার আস্তে আস্তে নেমে এল। দোতলার সিঁড়ির কাছে দরজাটার একটু ধাক্কা দিল, দরজা গেল খুলে। নিরুপমা নীচে তখন কাপড় কাচতে গেছে।

ঘরে ঢুকে চন্দ্রময়ী দেখল দু' তিনখানি ধুতি ও সাড়ী মেঝেয় লুটোপুটি খাচ্ছে, সেগুলি সে গুছিয়ে রাখল। বিছানাগুলো একজায়গায় জড়ো করা ছিল, সেগুলি অতি যত্নে বিন্যাস করে' মেঝের উপর ছড়াতে লাগল। আগে মাদুর; তারপর সতরঞ্চি, সতরঞ্চির উপর তোষক, তার উপর একখানি ধব্‌ধবে চাদর। চাদরখানি পেতে পাশ-বালিশ সাজিয়ে রাখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ফিরতেই একেবারে নিরুপমার সঙ্গে মুখোমুখি। নিরুপমার মুখখানি তখন বিছানার দিকে তাকিয়ে রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

এই যে বউ মা, এই নাও বাছা তোমার ঘর-দোর...তুমি একা আর কত পারবে মা?

নিরুপমা বলল—রোজই ত করি।

চন্দ্রময়ী একটু হাসল। বলল—ইচ্ছে হ'ল, ক'রে দিয়ে গেলাম। আমার ত আর হাতে কোন কাজ নেই মা! দাঁড়াও বাছা, রাতের জন্য তুলে এনে দিচ্ছি।

না, না, থাক—কেন এত কষ্ট করবেন আপনি?

দরজার বাইরে এসে চন্দ্রময়ী কয়েক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়াল, তারপর নীচে নেমে এসে যাবার সময় তার সেই কদাকার মুখে একটুখানি হেসে বলল—তা হোক বৌমা, দয়া ক'রে একটু আধটু কিছু আমাকে করতে দিয়ো। এতে ত তোমারই লাভ মা?

চন্দ্রময়ী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। নীচের ঘরে তখন আলো জ্বলছে। ভূপতিরা ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে গল্প করছিল। রান্না-ঘরের ভিতর একটি হিন্দুস্থানী ছেলে রাতের খাবার তৈরী করছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে চুপি চুপি বলল—এই?

ছেলেটা মুখ তুলে তাকালো। চন্দ্রময়ী বলল—চেঁচামেচি করিস্‌নে। তোর মশলা পিশে দেবার দরকার আছে ত?

ঘাড় নেড়ে ছেলেটা জানালো আছে। বাস্‌ তখন আর কি, চন্দ্রময়ী ভিতরে ঢুকে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ব'সে গেল বাটনা বাটতে। অতি যত্নে, অতি সাবধান এবং অতি গোপনে সে একে একে লঙ্কা, হলুদ, ধনে, জিরা-মরিচ চমৎকার মিহি ক'রে বেটে দিতে লাগল। মনে হচ্ছিল, তার হৃদয়ের সমস্ত দাক্ষিণ্য, মমতা, মায়া—যত কিছু হৃদয়-বৃত্তি তার গুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়েছিল, সেগুলি একে-একে জেগে উঠে এই সব ছোট-ছোট কাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে।

—কে তোকে ডেকে আন্‌ল রে?

ছেলেটা বল্‌ল—ভূপতি বাবু।

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—মাইনেটা একটু কম ক'রে নিস্‌ বাছা। ভূপতির এখন অনেক খরচ।

ছেলেটা চুপ ক'রে রইল। চন্দ্রময়ী পুনরায় বল্‌ল—শরীরটা আমার ভাল নেই না, তাই তোকে রাখতে হ'ল। বাবুকে একটু যত্ন-আত্তি করিস, মাইনে বাড়িয়ে দেবো।

বাইরের ঘরে তখন কি একটা কথার হাসির ধুম প'ড়ে গেছে। ছেলেগুলি ঠিক শিশুর মতো উচ্ছল, চঞ্চল,—প্রাণের প্রাচুর্য্যে তারা যেন টলমল করছে। চন্দ্রময়ীর কান-দুটো সেইদিকে খাড়া হ'য়ে ছিল। বল্‌ল—যে বয়সের যা, বাইরের লোক কি আর এ সব বুঝবে? একটু হাসি-তামাসা না করলে শরীর ভাল থাকবে কেন?

ছেলেটা এবার বলল—বাবু ত এ শহরে এসেছেন!

তুই থাম্! তুই ত সবই জানিস্। কলকাতাতেই বাবুর সব কাজ, এখানে তাই জন্যে সব সময় থাকা চলে না। বলি ও কি হচ্ছে অমনি ক'রে কি মাছ সাঁত্‌লায়। মাছগুলো ত পুড়িয়েই ফেললি! নে, স'রে বস।

হলুদ-মাখা হাত দু'খানা ধুয়ে এসে চন্দ্রময়ী ছেলেটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে রাঁধতে ব'সে গেল। বলল—দু'একদিন দেখিয়ে শুনিয়ে না দিলে পারবিনে দেখতে পাচ্ছি। দাঁড়া দাঁড়া, যাসনে এখন কোথাও, শোন বলি।

ছেলেটা ফিরে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী উঠে গিয়ে বাজার থেকে আনা মিষ্টি তার হাতে দিয়ে বল্‌ল—গালে দিয়ে এইখানে ব'সে জল খা, যাসনে কোথাও—বুঝলি?

ছেলেটা তাকে বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বিবেচনা ক'রে নির্বিচারে তার এই আদেশ মেনে নিয়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

ও ঘর থেকে আওয়াজ এল—এই গিরধারী, বেটা ভাত চড়িয়ে দে না,—পেট যে চুঁই চুঁই করছে!

গির্‌ধারী উঠে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী চঞ্চল হ'য়ে উঠে বলল—এইখান থেকে উত্তর দে 'ভাত চড়ানো হ'য়েছে বাবুজি!'

খুন্তিটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে সে একবার বাইরে এসে উঁকি মারল, তারপর বল্‌ল—দেখিস, আমি এখানে আছি একথা ভূপতি শোনে না যেন। আমার অসুখ হ'য়েছে কি না তাই নীচে নামতে বারণ ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু তার এই চৌর্য্যবৃত্তি গির্‌ধারীর ভাল লাগছিল না। সে ভারি অস্বস্তি বোধ করছিল।

আত্মগোপন করবার শক্তি যার অনেকখানি, মানুষের মনের কথা জানবার একটা বিধিদত্ত ক্ষমতা তার আছে। চন্দ্রময়ী একবার বাইরের দিকে তাকাল; রাত্রি অন্ধকার কি না কে জানে; হয় ত চন্দ্রোদয় হ'য়ে থাকতে পারে, কিন্তু নীচেটা ঘুটঘুট অন্ধকার, আলো নেই, হাওয়া নেই, আকাশ নেই অবকাশ নেই,—নিরুদ্ধ নিশ্বাসের মধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ ছেঁড়া তব্‌লার শব্দের মতো ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ করে চন্দ্রময়ী ঘাড় ফিরিয়ে গির্‌ধারীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে বলল—ভূপতি আমার ছেলে কিনা তুই তা জান্‌বি কি ক'রে, সবে এসেছিল বৈ ত নয়! বত্রিশনাড়ী ছেঁড়া যে ছেলে, সে তার মায়ের শরীর দেখবে না?

গির্‌ধারী এ কথা আগেই বুঝেছিল।

ভাত নামিয়ে খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে চন্দ্রময়ী লুকিয়ে চ'লে গেল। ছেলেরা যখন খেতে এসে বসল, সে তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে চোরের মতো তাদের দিকে তাকাতে

াগল, গিরধারীর পরিবেশনের মধ্যে কতটুকু যত্ন আছে তার নজর এড়ালো না। নিজের াতে সে যদি ভূপতিদের খাইয়ে দিতে পারত তা হ'লেই হ'ত ভাল !

চন্দ্রময়ী নেমে এসে পা টিপে তাদের ঘরে গেল। বিছানাগুলি ঝেড়ে-ঝুড়ে অতি ক'রে পেতে দিল। ঘরের মধ্যে সিগারেট ও দেশলাইয়ে কতকগুলি কুচি ছড়ানো, সেগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিল। পাছে ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিলে শব্দ হয়, এজন্যে আঁচল দিয়ে সমস্ত ঘরের মেঝেতে সে পরিষ্কার করল।

পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে সে যখন নিঃশব্দে উপরের সিঁড়িতে উঠে গেল, ছেলেরা তখন সোৎসাহে আহার সাঙ্গ ক'রে উঠেছে। উল্লাসে চন্দ্রময়ী সর্ব্বাঙ্গ একবারে কেঁপে উঠল। সন্তানের ভোজন-তৃপ্ত মন মাকে কি আনন্দিত করে না ?

ঘরের মধ্যে স্বামীকে খেতে বসিয়ে নিরুপমা এসে দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। চন্দ্রময়ীকে এমনি ভঙ্গীতে আসতে দেখে বলল—অন্ধকারে এতবার যাতায়াত করছেন, একটা আলো হাতে রাখুন না !

আর মা, আলো !—চন্দ্রময়ী বলল—সময় কই ? ছেলে হ'লে মায়ের যে কত জ্বালা, তা ত' আর তুমি এখনও জানলে না !—ব'লে সে তেতালায় চ'লে গেল।

কথাটা ঘরের মধ্যে খেতে খেতে স্বামীর কানে গিয়েছিল। তিনি ভ্রূ কুঁচকে নাক সিঁটিয়ে তুক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—মাগীটা কেন কথা কয় যখন-তখন তোমার সঙ্গে ? বদমাইস্—'আর্গালি' !

নিরুপমা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার দৃষ্টি নত করে দ্বার ফিরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। জীবনকে মানুষ কি ঠিক এমনি ক'রেই বিচার করবে ?

উপরে উঠে চন্দ্রময়ী ঘরে ঢুকে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল। ভূপতির রান্না করতে পেয়ে আজ সে যেন ধন্য হ'য়ে গেছে। আজ এই রাত্রিটিতে দুঃখের একবিন্দু চিহ্ন যেন তার মধ্যে নেই ! চোখে আজ তার হয় ত ঘুম আসবে না, মনের নিত্য নিয়মিত ক্লান্তি আসবে না—সমস্ত রাত আনন্দে উত্তেজনায় আজ হয় ত তাকে ছাদের ওপর ঘুরে ঘুরেই বেড়াতে হবে !

জানলা-দরজাগুলো খোলাই রইল, বিছানা হ'ল না, না হ'ল ঘর পরিষ্কার,—আলোইবা সে কি জন্যে জ্বালাবে,!

কিন্তু তার সমস্ত মন বিশৃঙ্খল, জীর্ণ ও মলিন গৃহসজ্জাগুলির দিকে তাকিয়ে অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভ'রে উঠতে লাগল। আজ তার সমস্ত দৈন্য সার্থক ক'রে দীপশিখা জ্বলে উঠেছে !

সারাদিন পরিশ্রমের পর তার চোখ বুজে এল। কিন্তু চোখ বুজে সে দেখল্যে শিশু-ভূপতিকে। ফুটফুটে দু' বছরের ছেলে, অশান্ত পাথরের কুচির মতো কঠিন, স্তন্য পিপাসায় শিশু-ব্যাঘ্রের মতো সে যেন চন্দ্রময়ীর বক্ষস্থলে প্রথম দাঁতের আঘাতে জর্জ্জরিত করছে !

ভাবতে ভাবতে চন্দ্রময়ীর গা ভোল হ'য়ে এল।

মাদুরের উপর ব'সে নিরুপমা কি একখানা মাসিকের পাতা ওলটাচ্ছিল ; চন্দ্রময়ী ঘরে এসে ঢুকলো।

—এসে যে দুদণ্ড বসবো বৌমা, তার সময়ই পাইনে। তোমার সেই যে সেলাই ফোঁড়াইয়ের কাজ ছিল, শেষ হ'য়ে গেছে বুঝি ?

হ্যাঁ, সে সামান্যই !

সেলাইটাও যদি শিখতাম !—চন্দ্রময়ী বলল—কোনো কাজই হাতে থাকে না কি না তাই কোনো কাজের সময়ও করতে পারিনে। চির কালটা ভূতে পেয়েই রইলাম মা।

কণ্ঠস্বরের মধ্যে তোষামোদের যে ঈষৎ আভাসটুকু ছিল, তা নিরুপমার লক্ষ্য এড়ালো না। কিন্তু সে ব্যথিত দৃষ্টিতেই চন্দ্রময়ীর দিকে তাকিয়ে বলল—ভগবানের রাজ্যে এমন যে কেন হয় বোঝাই যায় না।

চন্দ্রময়ী বলল—সেই প্রথম দিনটি থেকে তোমাকে আমার ভাল লেগেছে বৌমা ; মনে মনে তোমাকে নিয়ে অনেক কথা ভেবেছি।

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বলল—কি রকম ?

চন্দ্রময়ী বলল—না তা নয়, এই ধর পেটের মেয়ের মতন তোমাকে আমি ভাবতে পারিনে বৌমা ! যদি তোমাকে আমি এ জন্মেই ছেলের বউ ক'রে পেতাম !

ও কথা বলে আর লাভ কি বলুন ? ইচ্ছে মানুষের অনেক রকমই থাকে। ভেবে শুধু দুঃখই বাড়ানো !

তাই বলছি।—মেঝের উপর আঙুল দিয়ে দাগ টানতে টানতে চন্দ্রময়ী বলল—ভাগ্যবতী নৈলে ভূপতির মতন ছেলে পেটে ধরা যায় না। যেমন রূপ, তেমনি গুণ তিনটে পাশ করেছে, কলকাতায় কারবার—দেশে জমিদার। বালকের মতন সরল বিনয়ী—বাছা আমার দুঃখের ধন বৌমা !

পরের ছেলের প্রতি এমন একান্ত মমতা এবং তাই নিয়ে এমন মনোহর স্বপ্নজাল রচনা করা,—নিরুপমা একটুখানি অবাক হ'য়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল !

চন্দ্রময়ী বলল—অনেক জিনিস ঘটে না বৌমা, যা ঘটলে ভালো হ'তো। স্বামী নিয়ে তুমি ঘর করছো অথচ ভূপতি আজও বিয়ে করল না, একথা কি কেউ ভেবেছিল ? সংসারে অনেক জিনিষেরই আমরা হদিস্ পাইনে মা।

অর্থাৎ—?

নিরুপমা ঘাড় ফিরিয়ে তার প্রতি তাকালো। কোথাকার কে ভূপতি বিয়ে করেনি সে আলোচনা তার কাছে কেন ? ভূপতির বিয়ে না করার সঙ্গে তার স্বামী নিয়ে ঘর করার সম্পর্ক কি ?

চন্দ্রময়ী বলল—তা ধর মা, ভূপতি আমাদের কিছু অপছন্দর নয়। ভূপতির হাঁড়িতে চাল দিলে কোনো মেয়েই কি অসুখী হবে তুমি মনে কর মা ?

আপনার কাছে কি কোনো পাত্রী ? নিরুপমা বলল।

সে কথা বলছিনে বৌমা—একটু হেসে চন্দ্রময়ী বলল—পাত্রী কোথা পাবো আমার হাত দিয়ে ত কেউ মেয়ে পার করতে চাইবে না। বলছি মা তোমার কথা..... তোমাকে দেখে অবধিই আমি এহ কথা ভাবছি।

নিরুপমা বড় বড় চোখে তাকালো।

হ্যাঁ, তোমার কথাই বলছি বৌমা…তোমার যে স্বামী আছে বৌমা একথা আমি ভাবতেই পারিনে! তুমি ত কুমারী মেয়ে! আচ্ছা, চুপি চুপি বলত বৌমা সত্যি ক'রে…আমাকে মা পাগল মনে করো না…বল ত ভূপতিকে তোমার পছন্দ না? সত্যি বলছি মা, ভূপতি তোমার স্বামী হ'লে বুঝতে যে—"

আহত ক্রুদ্ধ সর্পের মতো নিরুপমা উঠে দাঁড়াল। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—চ'লে যান—যান্ শীগ্গির বলছি…এক মিনিটও আর এ ঘরে বসবেন না!

তার মুখের চেহারা দেখে চন্দ্রময়ী আর বসতে পারল না, উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ঢোক গিলে বললে—অন্যায় হ'য়েছে বৌমা?

বৌমা তার উত্তরে বললে—কই এখনও বেরোলেন না ঘর থেকে? উনি যা বলেন মিথ্যে নয়, উনি মানুষ চেনেন। খবরদার আমাকে আর বৌমা বলে ডাকবেন না! আপনার কি ধর্ম্মভয় নেই? যান্ এ-ঘর থেকে। আপনার বাড়ীতে ভাড়া ক'রে আছি ব'লে, অপমান করেন কোন সাহসে?

মাথা হেঁট করে চন্দ্রময়ী বেরিয়ে চ'লে গেল।

গেল বটে কিন্তু একটুকু আঁচ তার গায়ে লাগল না। উপরের ঘরে গিয়ে সে যখন আবার প্রতিদিনের কাজকর্ম্মে মন দিল, মনে হ'লো, অপমানিত হওয়ার অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। আঘাত পেয়ে আহত হ'ল না, সামাজিক নীতিকে পদদলিত করতে সে কুণ্ঠিত হ'ল না—স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিকার চিত্তে সে ঘরের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল।

নিরুপমার ঘরের পাশ দিয়ে আনাগোনা করে কিন্তু কথা বলতে আর সাহস করে না। এ ঘরটি চিরকালের জন্য তার মুখের উপর বন্ধ হ'য়ে গেছে।

দোতলায় নেমে ডাক্তার বাবুর ছেলে-মেয়েগুলির সঙ্গে সে হেসে হেসে কথাবার্ত্তা কয়। একটু আধটু খেলাও করে। ছেলেমেয়েগুলি তার বড় প্রিয়। বিনীতা প্রায়ই লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে,—এই কদাকার স্ত্রীলোকটার গতিবিধির প্রতি নজর দেবার প্রয়োজন সে মনেই করে না।

চন্দ্রময়ী যে লুকোচুরিও খেলতে পারে একথা ছোট ছেলেমেয়েগুলির জানা ছিল না। সুতরাং এই পরম স্নেহময়ী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে মিলেমিশে তারা চমৎকার আমোদ পায়। হুড়যুদ্ধ ক'রে সারাদিন বেড়াতে পারলে তারা আর কিছু চায় না।

এক একবার একটু থেমে কোনো একটা ছেলে কিম্বা মেয়েকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রময়ী অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে।

—তোর বাবা খুব হো হো ক'রে হাসেন, না রে মণ্টু?

মণ্টু বলে—হুঁ, খুব। খুব হাসে মাসিমা, হা হা ক'রে।

বাবা তোর কি খেতে ভালবাসেন রে?

মেজ মেয়েটা ব'লে উঠল—পুঁই শাক মাসিমা, ইলিশ মাছ দিয়ে। ইলিশ আর পুঁই-চচ্চড়ি!

ও,—চন্দ্রময়ী খানিকক্ষণ উদাসীন হ'য়ে রইল। পরে বলল—রাত্তিরে কি খান?

রাত্তিরে? লুচি।

ডাক্তারবাবু তোদের খুব ভালবাসেন, না রে?

হুঁ—আমাকে সব চেয়ে বেশী!

ব্যস্ অমনি গোলমাল সুরু হ'ল। সবাই চীৎকার ক'রে বলে উঠল—আমাকে বাবা সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসে, মাসিমা, আমাকে!

চন্দ্রময়ী বলিল—আচ্ছা লটারী ক'রে দেখি দাঁড়া।

লটারি হ'ল—উঠল কিন্তু ফোকা! চন্দ্রময়ী বলল—থাক লটারি—যাক গে আচ্ছা, রাত্তিরে ডাক্তার বাবুর কাছে কে শোয়?

মণ্টু তখন বীরের মতো এগিয়ে এল। বলল—আমি।

চন্দ্রময়ী তাকে ভুলিয়ে কোলে তুলে নিয়ে উপরে চ'লে গেল। উপরে গিয়ে তার হাতে সন্দেশ দিল, ঠাকুরের প্রসাদী কিস্‌মিস্ দিল। কোলের মধ্যে বসিয়ে তাকে আদর করল, আষ্টেপৃষ্ঠে চুম্বন করল। তারপর তাকে তুলে এনে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বলল্—লাট্টু কিনবি মণ্টু! কত দাম বল দিচ্ছি।

মণ্টু বলল—চার পয়সা।

আচ্ছা দেবো, আগে আমি যা বলব শুনবি?

হুঁ, শুনবো।

উত্তেজনায় এবং দুরন্ত উল্লাসে চন্দ্রময়ী থর-থর ক'রে কাঁপছিল—রক্তের তরঙ্গ প্রচণ্ড আকারে উদ্দাম হ'য়ে তার বুকের মধ্যে মাতামাতি করছিল। বলল—ডাক্তার বাবু তোর কে হয়?

বাবা।

আমি তোর কে হই?

মাসিমা।

চুপ!—ব'লে সে মণ্টুর মুখটা হাত দিয়ে টিপে ধরল। বলল—খুন করবো এখুনি। বল—'তুমি আমার মা হও!' বল লক্ষ্মীটী, এখুনি লাট্টু কিনতে দেবো—বল?

মণ্টু সাত বছরের ছেলে। মা মরেছে ত এই বছর দুই হ'ল—বেশ মনে আছে তবু ভয়ে ভয়ে বলল—মা!

আঁচল খুলে চারটি পয়সা তার হাতে দিয়ে চন্দ্রময়ী বলল—যা, পালা এইবার এবার থেকে হাতের মধ্যে পয়সা টিপে দিলেই কিন্তু চুপি চুপি ওই ব'লে ডেকে যাবি—কেমন?

মণ্টু ঘাড় নেড়ে নীচে নেমে গেল।

কিন্তু এই ক্লেদোক্ত জঘন্য কৌশল, বিকৃত চিন্তাধারার এই কুৎসিত প্রকাশ, এর মধ্যে তার যে ক্ষুধাই প্রকাশ পাক—আপনার আনন্দে আপনি বিহ্বল হ'য়ে এই মনোবিলাসিনী নারীটি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। স্বামী, পুত্র, সন্তান

সন্তাতি থাকার আনন্দ যে কেমন—ঠিক এই রকমটি কি না—চন্দ্রময়ী হাসতে হাসতে কেবল এই কথাটাই বারে বারে ভাবতে লাগল।

গভীর রাত পর্য্যন্ত ডাক্তারবাবু লেখাপড়া করছিলেন। বারান্দার সুমুখেই খোলা জানালার ধারে একটি টেবিল—চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়ানো—মাঝখানে একটি উগ্র উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ডাক্তার বাবু চোখে চশমা লাগিয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আলো পার হ'য়ে বাইরে তাঁর নজর আসার উপায় নেই, বাইরের সমস্তই অন্ধকার দেখায়।

রাত বোধ করি অনেক। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিচে ভূপতিদের আর কোন সাড়া-শব্দ নেই,—নিরুপমার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। নিস্তব্ধ দূরে কোথায় একটা মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ তখনও ভেসে ভেসে আসছিল।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে!

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে বিনীতা এসে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী থতমত খেয়ে বলল—বিনীতা?…ঘুমোওনি এখনো?

কটুকণ্ঠে বিনীতা বলল—না, বেশ শাদা চোখেই আমি জেগে ছিলাম। আলোর সামনে ছায়া পড়ছে দেখে…জানালার ভেতরে চেয়ে কি দেখছিলেন শুনি? রোজ রাত অবধি বাবাকে কাজ করতে হয়, এখানে এসে দাঁড়িয়ে আপনার কি লাভ?

ভিতর থেকে ডাক্তারবাবু সাড়া দিয়ে বললেন—কি হ'ল রে বিনু?

কিছু না বাবা, আপনি কাজ করুন—বিনীতা বলল।

মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে একটুখানি স'রে এসে অপরাধীর মতো চন্দ্রময়ী বলল আলো নিভে গেছে মা, তাই একটা দেশলাইরের জন্যে—

দেশলাই আমার কাছে চাইলেই ত হ'ত? হাতড়ে হাতড়ে একটি দেশলাই বার করে ঠক্ ক'রে ফেলে দিয়ে বিনীতা বলল—যান, যদি কিছু দরকার হয় ত দিনের বেলায় সকলের সুমুখে আমাদের কাছে চাইবেন, দেবো। নইলে অমন চোরের মতন রাতের বেলা—ছিঃ!

হাতে করে দেশলাইটা নিয়ে চন্দ্রময়ী আবার উপরে উঠে গেল। ঘরে আলো জ্বলছে। এঁটো-কাঁটা, আহারের সামগ্রী চারিদিকে ছড়ানো। আঁচলের ভিতর থেকে একবাটি তরকারী সে মেঝের উপর নামিয়ে রাখ্‌ল—ইলিশ মাছ এবং পুঁইশাকের তরকারী!

ব'সে প'ড়ে সে খানিক চুপ ক'রে রইল। মনে হ'ল, বহু কষ্টে ও যত্নে নিতান্তই আগ্রহে সারাদিন ধ'রে সে আজ রান্না-বান্না করেছে। এই বাড়ীর সমস্ত লোককে সযত্নে খাওয়াতে পারলে নিতান্ত মন্দ হ'ত না!

অনেকক্ষণ অনেক রকম ক'রে সে ভাবল। মনে হ'ল, তার সে চিন্তার কূল নেই, অতীত নেই, বর্ত্তমান নেই!—আজকের এই সামান্য ব্যর্থতায় মনে হ'ল তার জীবনের পরিপূর্ণ স্পষ্ট ছবিটি ফুটে উঠেছে। এ চিন্তায় রাতই হয় ত শেষ হ'য়ে যাবে।

আলোটা সরিয়ে এনে সারাদিনের পর ভাত বেড়ে সে যখন ইলিশ মাছ ও পুঁইশাকের তরকারী দিয়ে গ্রাসের পর গ্রাস তুলতে লাগল, তখন ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ দু'টো দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল নেমে এসেছে।

বিনীতা কিন্তু এ চৌর্য্যবৃত্তিকে ক্ষমা করতে পারল না।

পরদিন চন্দ্রময়ী সম্বন্ধে একটি অস্ফুট গুঞ্জন অগ্নির মতো ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করল। বেলা তখন অবেলা।

নিরুপমার স্বামী খগেন হঠাৎ এমন একটি মন্তব্য ক'রে বসল, ডাক্তার বাবু যার প্রতিবাদ না ক'রে পারলেন না। বিনীতা আগুন হ'য়ে উঠেছিল, নিচে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় ভদ্রভাষায় রীতি মতো চন্দ্রময়ীকে সে অপমান করতে সুরু করে দিল।

খগেন তার উত্তরে ঘৃণিত কণ্ঠে বলল—ঠিক বলেছেন…ভদ্রঘরের মেয়ে হোক কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, মাগীটা যে-কোনো অন্যায় অনায়াসে করতে পারে। ওকে দেখলে শুধু গা ঘিন্ ঘিন্ করে না, গা ছম্‌ছমও করে! 'ফেরোসাস্ উয়োম্যান্'!

চন্দ্রময়ী নেমে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল! এতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্তই সে নিঃশব্দে শুনেছে। নির্ব্বিচার অপমান তাকে এতটুকু আহত করে না!

নিরুপমার উদাসীন মুখখানির দিকে তাকিয়ে বিনীতা বলল্—একটুকু ওকে আমি বিশ্বাস করিনে, বৌদি? কাশী হ'চ্ছে এই সব মেয়েমানুষদের উপযুক্ত জায়গা—মাকড়সার মতন এরা নানা জায়গায় জাল বেঁধে ব'সে থাকে। মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের কাছে নিজের কথা লুকিয়ে রাখবে—এত বড় ওর সাহস!

নীচে ভূপতি এবং তার বন্ধুরাও এবার সোরগোল ক'রে উঠল। খগেন এসে বারান্দায় দাঁড়াল। নীচে থেকে ভূপতি বল্‌লে—ওই বাড়ীওয়ালীর কথা বলছেন ত আমরাও বলব মনে করেছিলাম। মাগীটা ইতরের একশেষ! দিন নেই, রাত নেই আমাদের আশেপাশে কি মতলবে যে ঘুরে বেড়ায়—ভাবতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে আসে! বুড়ো মাগী, চুরি ক'রে খায়; তা ছাড়াও অনেক গুণ—বুঝলেন না?

খগেন বলল—'ফার্ষ্ট ক্লাস ককেট্'!—আমরা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করি ভূপতি বাবু, এ বাড়ী ছেড়ে দোবো!

বিনীতা বল্‌ল—বাবাকে দিয়ে আজ সকালেই আমি বাড়ী ঠিক করছি, কালই আমরা চ'লে যাব।

ভূপতি বলল—আমাদেরও কনশেসন টিকিটের সময় হ'য়ে এসেছে, শীগ্‌গির কলকাতায় রওনা হচ্ছি!

চন্দ্রময়ী একে একে সমস্তই শুনলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাবার সময় একটুখানি ম্লান হেসে ব'লে গেল—কি আর বল্‌ব মা, উঠে যাবে…তা যেতে ধ'রে ত আর রাখতে পারব না। তা ব'লে বাড়ীও কখনও খালি প'ড়ে থাকবে না… ছেলেপুলের মেয়ে-পুরুষে আবার ভর্ত্তি হ'য়ে যাবে! পরকে নিয়েই ত আমার ঘর কন্না!…কত মানুষ এখানে এল, কত মানুষই চ'লে গেল। বাড়ী আমার ধর্ম্মশালা।

অবসন্ন দিনের পাণ্ডুর আলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিরুপমার চোখে যে জল চক্ চক্ ক'রে উঠেছে। নিরুপমা মানুষের হৃদয়ের বিচার করে।

মনিব

পাশের ঘর থেকে বউটির কলকণ্ঠ দিনে অন্তত একশো বার শোনা যায়। হাসির উচ্ছ্বসিত আওয়াজটিই তার রূপ—তার ব্যক্তিত্ব। আর সরু ক'গাছি সোনার চুড়ির শব্দ তার লীলায়িত অঙ্গভঙ্গীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। ওই হাসি শোনা যাচ্ছে আজ তিন মাস—দিনে রাতে অনর্গল।

একই বারান্দায় দুটি ঘর। মাঝখানে কাঠের আয়তনের মধ্যে শুধু একটি চিক টাঙানো। ওই হাসির শব্দে চিকের এ-ধারে বড় ঘরটির মধ্যে একা বসে বাবু-সাহেবের ভারি কাজের ব্যাঘাত হয়। সমস্ত দিনের গোলমালের মধ্যে ও-হাসি যদি বা এড়ানো যায়—রাত্রির নির্জনতায় কিন্তু সে একটি বিচিত্র অপরিচিত বার্ত্তা নিয়ে কানে আসে! সরকারি 'সার্ভেয়ার' বাবু-সাহেব তখন কাগজের প্ল্যানের উপর থেকে মুখ তুলে চোখের উপর আলো রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে অনুচ্চ-স্বরে—আঃ!

বিরক্তির প্রকাশ এইটুকুর চেয়ে বেশি আর কোনোদিন শোনা যায় নি।

চিকটি তুলে একটি মেয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় দু'পেয়ালা চা এনে দেয়। মেয়েটি ওই বউটিরই ঝি। কিন্তু ঝি-গিরি তার পেশা নয়। টেবিলের উপর পেয়ালাটি রেখে বলে—দিদি পাঠিয়ে দিলেন।

প্রতিদিন শুধু এই তিনটি কথা। কিন্তু প্রতিদিনকার এই নিরর্থক কৈফিয়ৎ বাবু-সাহেবের প্রয়োজনে আসে না। প্ল্যানের উপর তার সুগভীর মনোযোগ এতটুকু ক্ষুন্ন হয় না, কথাও বলে না। অথচ পরদিন সকালে পেয়ালাটি খালিই দেখা যায়। মেয়েটি হয়ত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিঃশব্দে দাঁড়ায়, হয়ত মনোযোগী যুবকটির মুখের দিকে একবার তাকায়—হয়ত বা নিজের এই ধন্যবাদবিহীন কাজটুকুর জন্য নিজেরই উপর একটু রাগ করে, তারপর আবার নিঃশব্দের ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। তিনটি মাস ঠিক এমনি করেই মুখ বুজে চলে গেছে।

একদিন বলেছিল বটে—দিদি আবার কি! মনিবের বউকে কেউ দিদি বলে না। নিজের বড় বোন ছাড়া কাউকে—

মেয়েটি সেদিন কিছুই উত্তর দেয় নি, বরং কথাটা শেষ হবার আগেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল।

যাহোক, বউটি আজ চলে যাচ্ছে। স্বামীটি উচুঁদরের; তাই হাওয়া বদলাতে সস্ত্রীক এ-দেশে এসেছিলেন। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা হ'লে গাড়ী ডাকতে পাঠিয়ে বউটি চিকের পরদাটি সরিয়ে এ-ধারে এল। ঘরের ভিতর মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল—প্ল্যান আঁকা হচ্ছে বোধ হয়, ভেতরে একবার প্রবেশ কর্ত্তে পারি কি?

বাবু-সাহেব কাগজের উপর থেকে মুখ না তুলেই বললে—দরকার থাকলে আসবেন বৈ কি।

বেশ, আজ যাবার দিনেও এই কথা! দরকার আপনার সঙ্গে আমাদের শেষ হয়ে গেছে, মনে নেই? শুধু বিদায় নিতে এসেছিলাম।

গাড়ী তখন দরজায় এসে গেছে। সৌখীন চশমা-পরা স্বামীটি স্ত্রীর অপেক্ষায় ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে অন্যদিকে চেয়ে বোধ করি প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছিলেন।

বউটি ঘরের ভিতর এসে একখানি চেয়ারের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে—কলকাতা ছেড়ে অনেকদিন বিদেশে রইছি, এইবার তাই—সত্যি আপনাকে কিন্তু অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।

বাঃ সে কি, আপনারা আমায় চা খাওয়াতেন রোজ, সে কথা কি ভুলতে পারবো?

কথাটিতে আঘাত পাওয়া উচিত। কিন্তু ওই সুন্দর প্রশান্ত যুবকটির কথা-গুলো নাকি বরাবরই এমনি আখ্‌কোটা এ-কথা বউটি প্রথম আলাপ থেকেই বুঝতে পেরেছিল। তাই আস্তে আস্তে বললে—আপনার মেজাজ আজ যে রকম তাতে 'প্রফুল্লবাবু' না বলে আপনাকে বাবু-সাহেবই বলা উচিত!

আমাকে সকলে তাই বলেই ত ডাকে।—মুখের উপর হেসে প্রফুল্ল বললে।

আসি তা হলে—নমস্কার—মেয়েটি বেরিয়ে যাচ্ছিলো, প্রফুল্ল উঠে গিয়ে বল্লে—শুনুন, একটু দাঁড়ান। একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। ঘরভাড়ার বাকি হিসেবটা—ওঃ না না, মনে পড়েছে। টাকা কড়ি সমস্তই বুঝে পেয়েছি বটে।

বউটি যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে বল্‌লে—এই জন্যেই আপনাকে আমাদের এত ভাল লাগতো। দর কসাকসি করে ভাড়া আদায় করলেন, তাও বুঝি ভুলে যেতে হয়?

বউটি পুনরায় শুধু বললে—হেসেই বটে—আপনি একটি বিয়ে করুন প্রফুল্লবাবু, নৈলে আপনার এ মাথার রোগ সারবে না। বলে সে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। এই ক'টি কথা বলবার অধিকার বউটি হয়ত নিজের হাতেই করে নিয়েছিল।

স্বামীটি প্রফুল্লর দিকে চেয়ে একটুখানি বিদায়ের হাসি হেসে বউটির অনুসরণ করলেন। গাড়ী ছুটে চললো।

কোনো কারণে বউটি যখন হাসতো, মনে হত সে হাসির মধ্যে সংযম আছে, শৃঙ্খলা আছে; কিন্তু অকারণ অনাবশ্যক খেয়ালি হাসি—সে যেন ঝড়, তার না-ছিল সীমা, না-ছিল বাঁধ। প্রফুল্ল ভাবতে লাগলো, সেই প্রাচুর্যটাই আজ শুধু নিঃশেষে থেমে গেল। তা ছাড়া আর কি!

ফিরে এসে সেই শূন্য ঘরটিতে প্রফুল্ল তালা বন্ধ করছিল, পিছন থেকে সেই মেয়েটি বললে—ঘরে চাবি দিচ্ছেন, ভেতরে আমার জিনিসপত্তর রয়েছে যে।

মুখ ফিরিয়ে প্রফুল্ল বললে—এ কি, তুমি গেলে না ও'দের সঙ্গে?

আমি যাবো কোথায়, আমি যে এখানেই থাকি। ওদের কাজ করবার লোক ছিল না তাই আমায় রেখেছিলেন।—সরুন পুঁটলিটা বার করে নিয়ে আসি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে প্রফুল্ল বললে—ঝিয়ের আবার জিনিসপত্তর কিসের?

হেসে মেয়েটি বললে—বা রে, সে কি মানুষ নয়?—ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি পুঁটলি বার করে নিয়ে এল। পরে পা বাড়াতেই প্রফুল্ল বলে উঠলো—চলে যাচ্ছ নাকি?

তা আর কি করবো বলুন। চাকরি গেল; এবার—

যাও তবে।—বলে প্রফুল্ল ঘরে ঢুকে নিজের কাজে মন দিল। মেয়েটি চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়ালো, পরে একটি নিশ্বাস ফেলে নেমে এক-পা এক-পা করে চলতে লাগলো।

বেশী দূর যায় নি—ফিরে দেখে তারই উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে প্রফুল্ল ডাকছে।

মেয়েটি আবার ফিরে এল। প্রফুল্ল বললে—চলে যে যাচ্ছ, আমার চা দেবে কে?

চা কি আমি দিতাম? তাঁরাই ত পাঠাতেন।

তা জানি, তবু তুমিই এনে দিতে কিনা, তাই বলছি।

তা কি করবো বলুন? দুবেলা আপনাকে চা খাওয়াবার মতন পয়সা ত আমার নেই।

হুঁম—তুমি রাঁধতে জানো?

রান্নাই ত আমার কাজ।

বয়স কত তোমার?

মেয়েটি এবার হাসল। বললে—বয়স যতই হোক, রাঁধতে আমি ভালই জানি।

তবু শুনি, আমার চেয়ে কত ছোট সে হিসেবটা করে রাখি। উনিশ।

উনিশ? এত? আমি মনে করি সতেরো-আঠারো। আমার বয়েস পঁচিশ হ'ল। অনেক বড় তোমার চেয়ে। আমায় মান্য করে চ'লো।—নাম কি তোমার?

মেয়েটি নত মস্তকে বললে—দামিনী।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ বললে—দেখ দামিনী, আমার সুবিধের জন্যই তোমাকে রাখবো। কাজ কর্ম সমস্তই আমার করা চাই। খাওয়া-পরা পাবে। মাইনে কিছু দিতে হবে না কি? ওরা কি তোমায় মাইনে দিত?

নৈলে আমি থাকবো কেন; দশ টাকা করে পেতাম।

দশ টাকা! এমন বেহিসেবী কেন তুমি? মাইনে পাই পঞ্চাশ টাকা তার মধ্যে দশ টাকা যদি তোমায় মাসে দিই তা হলে তুমিই বা কি খাবে, আমি বা কি ছাই খাবো? ভবিষ্যতের জন্য জমাবোই বা কি!

তা হলে পাঁচ টাকা করে দেবেন।

না,—তোমার কথাও থাক্ আমার কথাও থাক্—সাড়ে চারটি করে টাকা মাসে পাবে, আর আট আনা করে বক্‌শিষ মাসে দেবো।

পুঁটলিটি নামিয়ে দামিনী হেসে রাজি হ'ল। প্রফুল্ল বললে—যাও রান্নাবান্না

করগে—আগে এক পেয়ালা চা এনে দাও। চা তুমি ভালই কর্ত্তে পারো—আর একটা কথা বলে রাখি, আমি কোনদিন ঝি-চাকর রাখি নি। আজ মনিব হতে পেরে আমার বেশ লাগছে দামিনী।

দামিনী বললে—শুনে খুশি হলুম। কিন্তু ওদিকে ঘরে যে আপনার কিছুই নেই! রাঁধবোই বা কি, চা করবোই বা দিয়ে? আপনাকে দুবেলা বাজারে গিয়ে খেয়ে আসতে হয়, তা মনে আছে ত?

আছে।—তারপর ভুরু কুঁচকে প্রফুল্ল বললে—আচ্ছা ঘরে যে আমার কিছু নেই তা তুমি খবর পেলে কি করে? যারা গোয়েন্দাগিরি করে তারা লোক ভাল নয় দামিনী। যা হোক এবারের মতন তোমায় ক্ষমা করলাম। বাজারের এখন কি কি আনতে হবে—না না, ঝিয়ের কাছে কোনও পরামর্শ, আমি—বুঝে-সুজে আনতে পারবো। বলে প্রফুল্ল ভিতরে ঢুকে বাক্স খুলে পয়সা হাঁটকাতে লাগলো।

একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে দামিনী বাইরেই দাড়িয়ে ছিল, প্রফুল্ল আবার বেরিয়ে এসে বললে—মাসের শেষে কিনা, পয়সা আর থাকবে কোথা থেকে? তোমার কাছে কিছু আছে দামিনী?

দামিনী বললে—আছে দশ টাকা।

দাও দেখি?

টাকা কটা হাতে নিয়ে প্রফুল্ল বললে—তোমার কাছে হাত পেতে যে আমি টাকা নিলাম তার জন্য কৃতজ্ঞ থেকো।

দামিনীর রাগ হয়েছিল। বললে—তবে দিন আমার টাকা ফিরিয়ে আমি বাড়ী চলে যাই।

প্রফুল্ল একটু দমে গিয়ে বললে—ফেরত দিই যদি তাহলে বাজার করবো কি দিয়ে! দুজনে আমরা খাবোই বা কি!

তবে যা খুসি করুন।—বলে দামিনী রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বাঙলার বাইরে এই পার্ব্বত্য দেশে প্রফুল্ল দে বরাবর থাকে তা নয়—জেলা-বোর্ডের রাস্তা তৈরী হচ্ছে, সে এসেছে সার্ভেয়ার হয়ে। এর আগে কোথায় যে ছিল—তার কথা মনে করাও তার কাছে ভারি কঠিন।

দামিনী বলে—ঘর আপনার কি নোংরাই হয়েছিল, সাতজন্মে পরিষ্কার করবার কথা বোধ হয় আপনার মনেই হত না?

এ-কথার উত্তর দেবার প্রয়োজন প্রফুল্ল মনেই করে না। কাগজের উপর পেন্সিল আর স্কেল্ দিয়ে কি আঁকে—সেই দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে।

দামিনী চা এনে টুলের উপর রেখে দেয়। পরে রান্নাঘরে গিয়ে উনুনের উপর তরকারি চাড়িয়ে যখন সে ফিরে আসে, দেখে—যেমন চা তেমনই পড়ে আছে। চৌকাঠের কাছে খানিকক্ষণ চুপ করে সে বলে থাকে, পরে একটু অসহিষ্ণু হয়েই বলে—চা যে জুড়িয়ে গেল আপনার, গরম চা খাবার অভ্যেস।

উহুঁ—কেন কথা কও কাজের সময়?—প্রফুল্ল এইবার মুখ তোলে। বলে—

কাল একটা ঘণ্টা কিনে এনে দেবো, দরকার হলে আমার সঙ্গে কথা না কয়ে ঘণ্টা বাজাবে।

মুখ ভার করে দামিনী বলে—ঘণ্টা ত' রোজই আপনি একটা করে এনে দিচ্ছেন! তা বলে আমি ত আর জেল খাটতে আসি নি।—উঠে ফর ফর করে সে চলে যায়।

যায় বটে কিন্তু একা রান্নাঘরে চুপ করে বসে থাকতে তারও ভাল লাগে না। নিঃশব্দে চৌকাঠের একটু আড়ালে পুনরায় এসে চুপ করে প্রফুল্লর কাজের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

যে ঘরে বউটি থাকতো সেই ঘরটিতেই রাত্রে দামিনী শোয়।

প্রফুল্ল হঠাৎ একদিন সে ঘরে ঢুকে বললে—বাঃ! দিব্যি নিজের ঘরটি সাজিয়েছ ত? ছবি, ক্যালেণ্ডার, আয়না—এ সব আমারই ঘর থেকে আনা হয়েছে দেখছি। না বলে কয়ে পরের জিনিসে হাত দেওয়া—তা ভালই করেছ—এ সব জঞ্জাল আমার ঘরে থাকবার দরকার নেই। কিন্তু যেদিন ছেড়ে যাবে, সেদিন এ সমস্ত আবার আমায় ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো দামিনী।

দামিনী তখন লজ্জায় রান্নাঘরে পালিয়েছে। মুখটি তার নাঙা হয়ে উঠেছিল?

প্রফুল্ল বলতে লাগলো—এর মধ্যে কোনোদিন আমার ভাড়াটে যদি আসে তা হলে কিন্তু তোমায় এ ঘর থেকে সরিয়ে দেবো। এ কি, বিছানাটা যে বেশ ধবধবে। আমার মতো ভালো বিছানা তোমার নেই বটে কিন্তু ঝিয়ের বলে ত ঠিক মনে হচ্ছে না! এ সব কোথা থেকে এল!

রান্নাঘরের কাছে পুনরায় বললে—দেখ দামিনী, তোমার চাদরখানা তুলে আমার বিছানায় পেতে দিয়ো—বুঝলে? অত ফরসা চাদরের ওপর শোয়া তোমার ভাল দেখায় না। লোকে দেখলে মনে করতে পারে, আমিই দিইছি।

দামিনী বললে—গরীব লোকের এমনি দুর্ভাগ্যই বটে।

সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে নিজের চাদরখানি প্রফুল্লর বিছানায় পাতবার আগে দামিনী বললে—আমার চাদর আপনার বিছানায় পাতলে আপনার আপত্তি হবে না?

কেন? অমন ধব্‌ধবে—

ধবধবে হোক—তবু ঝিয়ের চাদর ত—

প্রফুল্লর মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল! একটা ঢোক গিলে বল্‌লে—তাই তো দামিনী, এ কথাটা ঠিক আমার মনে ছিল না। তা হ'লে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তোমাকে সকল বিষয়ে ছোট করে দেখবো আর তাচ্ছিল্য করবো—এ দুটো কথা আমার নোটবুকে না লিখে রাখলে আর চলে না দেখছি। রোজ সকালে নোটবুক দেখবার যময় যেন—

দামিনী একটু হেসে বল্‌লে—আমার কথা লিখে লিখে আপনার নোটবুক যে ভরে উঠলো—বলে সে চাদরখানি আবার নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে ভিতরে ঢুকে চাদরখানি কোলের ভিতর নিয়ে অকারণে দামিনীর চোখে জল এল। সে অশ্রু একান্ত নিঃশব্দে, নির্জন রাত্রির গোপনতায়—সবার চোখের আড়ালে।

অনেকক্ষণ পরে উঠে দরজা বন্ধ করে সে শুয়ে পড়লো।

রাত তখন ঘন-গভীর। প্রফুল্লর ডাক শুনে সে ধড়মড় করে উঠে আবার দরজা খুললে। দেখে কাঁধের উপর একরাশ কম্বল, বিছানা, লেপ নিয়ে মনিব দাঁড়িয়ে। দোরের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রফুল্ল বললে—এইগুলো পেতে আজকের মতন শোও, কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা করে দেবো।

দামিনীর চোখে তখনও ঘুম ছাড়ে নি। বললে—আমার জন্য এত রাতে এ সব কেন আনতে গেলেন?

আনবো না? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে যদি?

আমাদের অসুখবিসুখ করে না।

যদি করে তা হ'লে আমি ত আর ঝিয়ের জন্যে ওষুধের টাকা খরচ করতে পারবো না দামিনী? বলে প্রফুল্ল নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সমস্ত রাত্রি সেদিন খোলা দরজার কাছে দামিনী চুপ করে বসে রইলো।

রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল বলে—কি হয় কি এ ঘরে তোমার বসে বসে?

কথা শুনলে গা যেন জ্বলে উঠে। দামিনী প্রথমে কথা কয় না।

চুপ ক'রে রইলে যে? কথার জবাব দেওয়া দরকার মনে কর না বুঝি?

কটুকণ্ঠে দামিনী বলে—কি হয় এখানে দেখতে পান না?

যেটা দেখতে পাই সেটার কথা হচ্ছে না, দেখতে যেটা না পাই তার কথাই বলছি।

মুখ তুলে দামিনী বলে—আপনার ওসব হেঁয়ালি আমি বুঝিনে।

তা বুঝবে কেন—চুরি ক'রে খাওয়াটা কিন্তু খুব বোঝ—কেমন?

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দামিনী অকস্মাৎ যেন পাথর হয়ে গেল।

প্রফুল্ল বলতে লাগলো—মেয়েমানুষ রান্নাঘর এত ভালবাসে কেন তা আমি জানি। কিন্তু এক মাসের ভাঁড়ার যা এনে দিয়েছি তা যেন দু' মাস হয়, এই আমি বলে রাখলাম। দামিনী, পরের বাড়ীতে থাকতে গেলে চুরি করে খাওয়াটা ছাড়তে হয়।

প্রফুল্ল আবার এসে নিজের ঘরে বসলো এবং মুহূর্ত্ত পূর্বেকার কথাগুলো সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নিজের কাজে তন্ময় হয়ে রইলো।

মিনিট কয়েক পরে ঘরে ঢুকে দামিনী বললে—মাইনে পত্তর আপনার কাছে কিছু চাইনে, ধারের দরুণ দশটা টাকা চুকিয়ে দিন, এখুনি আমি চলে যাবো।

প্রফুল্ল যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—কেন?

আমার এখানে থাকা হবে না।

সে কি! আমি থাকতে পারি আর তুমি পারো না?

না। চুরি করে খাওয়ার বদনাম কোনো মেয়েই সহ্য করতে পারে না।

ওঃ সেই কথা। এই ত তোমাদের দোষ, সত্যি কথা বললেই তোমরা রেগে যাও। যাই হোক, এতে তুমিও যে রেগে যাবে এ কথা আমার মনে হয় নি। তোমার মতি-বুদ্ধি যাতে ভাল থাকে সেই জন্যই বলছিলাম। আর এই দ্যাখো, পয়সা কড়ি যেখানে সেখানে রেখে আমি ভুলে যাই, তুমি পাছে চুরি করো এ জন্যে কত সাবধানই করি কিন্তু—

আমাকে চোর জেনেও এতদিন রেখেছেন কেন?

তা কি আর জানি—শুনেছি, এদেশের সব মেয়েই চোর, পুরুষরা ভাল।

ফুলতে ফুলতে দামিনী বললে—মানুষকে ডেকে এনে আপনি এমনি অপমান করেন?

অপমান! এতে অপমানের কথা কি আছে শুনি? আর মনিবে অপমান একটু করলে সেটা কি গায়ে মাখা উচিত? দামিনী তুমি ভারি ছেলেমানুষ।

দামিনী তেমনি ভাবেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদে খাবার সময় হলে প্রফুল্ল গিয়ে দেখে, রান্না-বান্নার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। উনুনে জল ঢালা, কাঁচা তরকারী ছড়িয়ে রয়েছে, চাল ভিজানো—চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। এ ঘরে এসে দেখলে—দামিনী চলে যাবার জন্য প্রস্তুত—পুঁটলি—বাঁধছে।

মুখ বাড়িয়ে বললে—যাচ্ছো তা হ'লে? বেশ, সাবধানে সুখ-স্বচ্ছন্দে থেকো। এখানে একটু কষ্টই পেয়ে গেলে বৈ কি। খাওয়ার কষ্টই পেয়েছ, সময়ে খেতে পাও নি।—একটু থেমে আবার বললে—আর একটা লোক আমায় দেখে শুনে রাখতে হবে আর কি? এবার আর ঝি নয়—চাকর, নইলে যখন তখন ধমকানো চলে না—দেখা যাক্। কিন্তু দামিনী, যাবার আগে রেঁধে-বেড়ে এক পেয়ালা চা করে দিয়ে···আর ওই ঘরের জঞ্জালগুলো—আর যদি নাই পারো, জোর করবার কি আছে!

প্রফুল্ল একবার বেরিয়ে গেল। একটু পরেই আবার ঘরে ঢুকে বললে—এই নাও সেই টাকা দশটা—ভারি অসময়ে দিয়েছিলে।—ভাল কথা, খুব সাবধান, তোমার পুঁটলির মধ্যে আমার জিনিষ পত্র যেন কিছু বেঁধে নিয়ে যেয়ো না—বুঝলে? দাও—ও-গুলো সবই আমার, এগিয়ে দাও এদিকে।

দামিনী সেগুলো হাতে করে ঠেলে দিয়ে বললে—আমার পুঁটলিটা না হয় একবার দেখে নিন যদি সন্দেহ থাকে।

সন্দেহ আর কি! মনিবের কাছে তুমি কি আর মিছে কথা বলবে?

দামিনী বললে—এ-দেশের মেয়েরা তা বলতে পারে। আমরা যেমন চোর তেমনি মিথ্যেবাদী।

প্রফুল্ল বললে—তুমি ত এ দেশের মেয়ের মতন নও দামিনী?—একটু হেসে আবার বললে—এ কিন্তু বেশ আমার লাগছে। আমার জিনিষ তোমার কাছে ফেরৎ নিচ্ছি আর তোমার জিনিষ তুমি আমার কাছে ফেরত নিলে!

আপনার কাছে আমার কিই বা ছিল যে ফেরত নেবো ?

চিন্তিত মুখে প্রফুল্ল বললে—সত্যি, কিছু ত ছিল না। গরীব লোক তুমি, আমার কাছে তোমার কিই বা থাকবে। অথচ একবার কি মনে হচ্ছিল শুনবে? শুনে কিন্তু হাসবে তুমি !

দামিনী পুঁটুলিটি নিয়ে বেরিয়ে এল। বললে—শোনবার আমার দরকার নেই। বেলা যাচ্ছে—বলে পথে গিয়ে নামলো।

প্রফুল্ল বারান্দার উপর থেকে বললে—আমার জন্যে ভেবো না, বেশ থাকবো। বরং তোমারই জন্যে আমার চিন্তা! এতদিন আমারই আশ্রয়ে তুমি ছিলে।

বলে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে একমনে নিজের কাজে বসে গেল।

চোখের জলে দামিনীর সুমুখের রাস্তা তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

সার্ভেয়ারী কাজের ঝকমারী। অঙ্ক কসো আর প্ল্যান আঁকো। কিন্তু এই কাজ প্রফুল্লর ভাল লাগে। অঙ্কে তার মাথা ভারি খেলে। সম্প্রতি সম্মান এবং অর্থের দিক দিয়ে এ জন্যে তার উন্নতিই হয়েছে।

পড়ন্ত বেলা। গাছে-পালায় রোদ আই-ঢাই করছে। সারাদিন উপোস করে কাজের যেন আর কামাই নেই। আর কাজ কি তাই সদর রাস্তার উপর? মাপের ফিতে নিয়ে হাতে নিয়ে লোকের আনাচে কানাচেও ঘুরতে হয় বৈকি। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে অখণ্ড মনোযোগের সহিত প্রফুল্ল মাপ কচ্ছিল, জায়গাটা কত ফুট লম্বা, কত ফুট চওড়া।

এমন সময় সুমুখের চালা ঘর থেকে দামিনী বেরিয়ে এল। দেখে ত প্রফুল্ল অবাক। বললে—এইখানে থাকো? বেশ ফুলগাছ দেয়া বাড়ী ত? ভাল আছ? অনেক দিন দেখি নি। ভারি রোগা হয়ে গেছ কিন্তু।

দামিনী এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি বললে—এত বেলা অবধি না খেয়ে কাজ করেন আপনি ?

কি আর করি বল! তা তোমার আসবার পর থেকে আমি বেশ আছি। তেমনি বাজারে গিয়ে খাই, একা একাও বেশ থাকতে ভাল লাগে—এসো দেখি একবার এদিকে, ফিতেটা একবার ধরলে তাড়াতাড়ি কাজটুকু হয়ে যাবে। কুলি বেচারা সব ক্ষিধের চোটে পালিয়েছে। আমার কাছে কোনো কুলিই থাকতে চায় না, কেন বল তা দামিনী ?

দামিনী ফিতেটা ধরে বললে—বোধ হয় ভাল লোকের কাছে টেঁকতে পারে না! ছোট জাত যে !

আমি ভাল লোক !—প্রফুল্ল হেসে বললে—এবার তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছ দামিনী, —তোমার চলে আসবার পর থেকে নিজেকে আমি খানিকটা চিনতে পেরেছি! আমি হিসেবি লোক বটে কিন্তু ভালো লোক নই।

মাপ-জোকের কাজ হয়ে গেলে দামিনী সরে দাঁড়িয়ে বললে, এত জায়গা থাকতে

আমারই দোরগোড়ায় আপনার কাজ পড়ে গেল? এর বোধ হয় দরকার ছিল না, তাই কুলিরা চলে গেছে।

প্রফুল্ল রেগে উঠলো। বললে—তবে কি বলতে চাও তোমাকে দেখবার ছল করে এখানে এসেছিলাম!

জিব কেটে দামিনী বললে—ছি ছি, আপনি কি সেই ধাতের লোক? না কি আমারই এত বড় সৌভাগ্য।—যান—বেলা পড়ে গেছে, বোধ হয় হাট থেকে আপনাকে খাবার কিছু নিয়ে যেতে হবে যাবার সময়!

প্রফুল্ল হঠাৎ বললে—তোমাকে আর ঝি বলে মনে হয় না দামিনী।

তবে?

মনে হচ্ছে তোমাতে-আমাতে কোনো তফাৎ নেই।

মুখ ফিরিয়ে অন্যদিক চেয়ে দামিনী বললে—যান আপনি।

একটুখানি গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল বললে—তোমার হাতে খাওয়ার পর থেকে আমার বাজারের আর রোচে না দামিনী, তা বলছি।

তা আর কি করবেন বলুন।

প্রফুল্ল বললে—সেই কথাই বলছিলাম—বুঝলে? এই ধর এখন আবার চা খাবার সময়। ঘরে গিয়ে আবার কি চা খাবার জন্যে এতদূরে—দামিনী, আমার ঘরে গেলে দেখতে পেতে এক হাত উঁচু জঙ্গল জমে আছে। সব অগোছালো কোথায় কি থাকে কিছুই খুঁজে পাই না। এত কাজ আমার কেই বা করে!—যাবে দামিনী আমার ওখানে? বকশিস না দিয়ে বরং আট আনা তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেবো—কেমন?

দামিনী বললে—আমার মাইনেও চাইনে—বকশিসেও দরকার নেই—আপনি কথাগুলো একটু বুঝে-সুঝে কইবেন, তা হলেই—

মাইনে চাইনে?—ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল বললে—তবে থাক, তোমার গিয়ে কাজ নেই—মতলব তোমার ভাল নয়। পরিশ্রম করে যারা পয়সা নেয় না, বড় স্বার্থ কিছু তাদের থাকে—এ আমি জানি।

দামিনী মুখ টিপে হেসে বললে—এত বড় হিসেবী লোক আপনি, না জানেন কি!

প্রফুল্ল বললে—মাইনে তোমায় নিতেই হবে দামিনী—তোমার পরিশ্রমের পয়সা না দিলে আমিই কি সুখে থাকতে পারবো মনে কর? আমি ঝগড়াটে, আমি এক-গুঁয়ে আমি নির্বোধ কিন্তু সাধারণ বিষয়বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে খুব বেশী খাটো নই।—পাঁচটা টাকা মাইনে তোমার উপযুক্ত মোটেই নয়, কি জানি কেন হাত তুলে দিতে আমার হাত কাঁপে; তবুও তা নিতে অমত করো না লক্ষ্মীটি।—এসো, আর দেরী ক'র না, অন্ধকার হলে আর পথ চিনতে পারবো না হয় ত।

ভয় নেই, আমি চিনিয়ে নিয়ে যাবো।—দাঁড়ান, পরনের কাপড় দুখানা চট করে নিয়ে আসি।

দামিনী ভিতরে ঢুকে একটু পরেই বেরিয়ে এল। পথ চলতে চলতে নিজের চাকরির দুর্ভোগ সম্বন্ধে প্রফুল্লর কত কথা। পরে এক সময় মুখ ফিরিয়ে বললে

দামিনী, তোমার কথাই ঠিক, তোমার দরজার কাছে আমার বিশেষ কিছু কাজ ছিল না। এমনিই এসেছিলাম।

স্বল্প অন্ধকারে পিছন থেকে দামিনীর হাসির শব্দ শোনা গেল।

গম্ভীর হয়ে প্রফুল্ল বললে—হাসলে যে? এ ত হাসবার কথা নয়। আমার চেয়ে বয়সে তুমি ছোট—আমার ঝি! মনিবকে মান্য না করে তার মুখের ওপর হাসলে কি বলে?

মুখের হাসি দামিনীর মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আঘাত পেয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললে—আপনাকে আর মনিব বলে মনে হয় না!

প্রফুল্ল বললে—বাঃ। এ দেখছি আমারই কথা চুরি করেছ।—জানি আমি নিজের কথা চেপে রেখে মেয়েরা পরের কথা চুরি করে বলে। মেয়ে জাতটা হচ্ছে পাকা চোর!

তাড়াতাড়ি প্রফুল্ল পথ চলতে লাগলো!

দামিনীর আবার ঘরকন্না। এ ঘরের সঙ্গে যেন তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ক'দিন যেন বেড়াতে গিয়েছিল—আবার ফিরে এসেছে! দু'জনের দু'খানি ঘর আবার পরিপাটি করে সাজালে।

প্রফুল্ল তারিফ করে। বলে—মেয়েমানুষের কি হাত! চারদিক যেন হাসছে। আমি ত এত পরিশ্রম করি কিন্তু এমন ত—

দামিনী টুলের উপর দাঁড়িয়ে ছবি টাঙাতে থাকে। পিছন থেকে তার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রফুল্ল বলে—সত্যি বলছি দামিনী, মেয়েরা থাকলে ঘর যেন ভরাট থাকে—এই তুমি কদিন ছিলে না, আমার মনে হচ্ছিল—

হাতখানা ঘুরিয়ে দামিনী পিঠের কাপড়টা কাঁধের উপর টেনে দেয়। পরে ছবি টাঙানো হলে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকায়। বলে—কেমন হ'ল এবার বলুত ত?

প্রফুল্ল বলে—কার জন্য টাঙালে তার ঠিক নেই—আমার ত মুখ তোলবারই সময় হয় না!—আচ্ছা, এত ঠাণ্ডায় তুমি একটি জামা গায়ে দিতে পারো না দামিনী? অসুখ করবে যে! তখন ত আমাকেই—

হাত দুটির উপর কাপড় ঢাকা দিয়ে দামিনী তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

খেতে খেতে মুখ তুলে প্রফুল্ল বলে—বয়স হলে মেয়েদের বিয়ে হয় জানি। তোমার হয় নি কেন দামিনী?

দামিনীর মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে। বলে—জানি না ত।

আমরা বোধ হয়, গরীব লোক বলে তাই। কিন্তু চেহারা ত তোমার নেহাৎ—

মুখ ফিরিয়ে হেসে দামিনী তাকায়।

না, সে কথা বলতে নেই।—বলে আহার অসমাপ্ত রেখেই প্রফুল্ল উঠে চলে যায়।

বিকালে খাটের উপর বসে সে চা খায়, আর দামিনী বসে বসে তখন ঘরে ঝাঁটা

দেয়। দামিনী বলে—টেবিলের ওপর ওই যে সব কাগজ ছড়ানো রয়েছে, ওতে আপনি প্ল্যান্ আঁকেন বুঝি?

হ্যাঁ, প্ল্যান্ আঁক্তে হয় আর আঁক্ কস্তেও হয় অনেক। ড্রয়িংও আছে।

ছবি-টবি আঁক্তে হয় না?

চায়ের ঢোক গিলে প্রফুল্ল বলে—দূর পাগল। ছবি আঁকার কি দরকার?

এইবার দামিনী মুখ ফিরিয়ে বলে—তবে কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে অতগুলো মেয়ের ছবি এঁকেছেন কেন?

মেয়ের ছবি এঁকেছি? কক্ষণো না।—কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই উত্তেজিত হয়ে প্রফুল্ল বলে উঠলো—জেলা-বোর্ডের কত রকম ফরমাসি কাজ আছে তুমি তার কি জানবে?

তারা বুঝি মেয়েদের ছবি আঁক্তে বলে?

তা বলে না? নিশ্চয় বলে।—চল বরং ভজিয়ে দিচ্ছি, চল আমার সঙ্গে।

দামিনী কাজ সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ উঠে রাগ করে কাগজগুলো ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিলে, পরে বললে হিংসে, ও সব হিংসে। মেয়েদের ছবি পর্যন্ত কাছে থাকা মেয়েরা সহ্য করতে পারে না।

পরে মুখ বাড়িয়ে বললে—কাল থেকে আমার ঘরে আর তুমি ঝাঁটা দিতে এস না দামিনী।

কথাটা হাওয়ায় ভেসে গেল।—

প্রফুল্লর কিন্তু রাগ পড়ে না। বিকালে আফিস থেকে এসে চেয়ারে বসে পড়ে বলে—সারাদিন খেটে-খুটে এলাম, কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখা নেই। সব কাজ যদি আমার না-ই করবে তবে ঝি রাখা কি জন্যে?

দরজার পাশেই দামিনী দাঁড়িয়ে থাকে। ভিতরে এসে বলে—কি চাই আপনার, বলুন?

সব কথাই বলতে হবে তোমায়? বুঝে নিতে পার না? এই যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এলাম—হাতপাখাটা নিয়ে একটু বাতাস দিলেও ত পারো? তোমার আর কি দামিনী, বসে বসে খাওয়া বৈ ত নয়।

দামিনী বলে—এত ঠাণ্ডায় বাতাস খেতে ইচ্ছে হয়?

হয়। সারাদিন পরিশ্রম করে এসে—আচ্ছা, না হয় বাতাস নাই দিলে, তা বলে এই জুতোর ফিতেটাও ত খুলে দিতে পারো?

পরিশ্রম আপনাকে কত কর্ত্তে হয় তা আমার জানা আছে—বলে দামিনী সরে এসে তার পায়ের কাছে বসে জুতোর ফিতে খুলে দেয়।

প্রফুল্ল বলে—মোজাটা অমনি খুলে দিতে কি তোমার হাতে ব্যথা হয়?

মোজা খোলা হয়ে গেলে বলে—গলায় আমার পৈতে আছে, পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলে তোমার জাত যাবে না দামিনী।

দামিনী বসে বসে মুখ তুলে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি হেসে ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে

স্বরে। পরে বলে—বেশ ত আপনি? এ রকম সেবা করবার কথা ত ছিল না আমার সঙ্গে?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রফুল্ল বলে—মেয়েমানুষ এমনিই বটে। কেবল দোকানদারী। কতটুকু কথা ছিল আর কতটুকু ছিল না—এ নিয়ে ত তোমার সঙ্গে আমারও লেখাপড়া হয়নি? তা' ছাড়া তুমি ত আমার সেবা করছ না—কাজ করছ। পায়ে হাতে বুলোনোও একটা কাজ। সেবা করবার অধিকার তোমার নেই।

তবে সে কাজ আমার শেষ হয়েছে!—বলে দামিনী উঠে বেরিয়ে যায়।

প্রফুল্ল বলে ওঠে—ওঃ! নরম হাতের কি অহঙ্কার! মেয়েমানুষ কিনা!

দামিনীর চোখে ততক্ষণে জল দেখা দিয়েছে।

অনেক রাত অবধি আলো জ্বেলে প্রফুল্ল কাজ করে। প্ল্যান আঁকে, ড্রয়িং করে—আঁকও কসে। ওদিকে দামিনী রেঁধে বেড়ে দোরের কাছে চুপ করে বসে থাকে।

চুপ করেই থাকতে হবে, কথা বল্‌বার নিয়ম নেই। কিন্তু সে নিয়ম মনিব যদি ভাঙে ত আলাদা কথা।

হয়ও তাই। প্রফুল্ল তার হাতের কাগজখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে—আলোটা বাড়িয়ে দেয়। পরে বলে—দেখো ত দামিনী, সরে এসে একবার দেখ ত'।

উঠে গিয়ে দামিনী বলে—কি দেখবো?

কাগজখানা দেখিয়ে প্রফুল্ল বলে—ধর, রাস্তাটা ঠিক সোজা যেতে যেতে হঠাৎ এক সময় বাঁক নেয়—একেবারে হঠাৎ—

তারপর?

কিন্তু হঠাৎ মোড় ফেরানো ত চলে না, তাই রাস্তাটা সোজাও থাক্‌বে অথচ এঁকেবেঁকে যাবে। এই দ্যাখো, এদিকে পাঁচ ফুট আর ওদিকে ধর তিন-তিরিক্‌খে—আঃ এত স'রে আসতে তোমায় কে বললে? একেবারে গায়ের ওপর পড়ছ যে—

দামিনী পিছিয়ে গিয়ে একটু দাঁড়ায়—মুখের দিকে একবার তাকায়, পরে বলে—খাবার ঢাকা রইলো। আমার ঘুম এসেছে—চললাম।

খাবে না? এর পর তোমার খাবার নিয়ে আমায় বসে থাকতে হবে নাকি?

দামিনী নিঃশব্দে চলে যায়।

খাওয়া দাওয়ার পরে খানিক রাতে প্রফুল্ল গিয়ে তার হাত ধ'রে তুলে আনে। বলে—এর চেয়ে বেশী অনুরোধ করলে আমার আর এতটুকু আত্মসম্মান থাকবে না দামিনী—তা বলছি।

খাবারের কাছে দামিনীকে বসিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

সেই রাতেই। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো শিশু-গাছের ফাঁক দিয়ে খানিকটা জানলার কাছে এসে পড়েছে। এই চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে পদ্মের কোরক কাঁপে—বকুলের ঘুমন্ত পুরী প্রথম পলক মেলে।

রাত বোধ হয় আর বাকি নেই। কিসের যেন খস্‌ খস্‌ শব্দে প্রফুল্ল আচমকা

জেগে উঠলো। ঘুম তার ভারি সজাগ—চোরের ভয়ে রাতে তার ঘুম হয় না। মাথার কাছে টিমটিমে আলোটা বাড়িয়ে সে দ্রুতপদে উঠে বাইরে এল।

দামিনী ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কচ্ছে। ছুটে গিয়ে প্রফুল্ল ডাকলে—দরজা খোল দামিনী।

এ কণ্ঠের সঙ্গে দামিনীর পরিচয় ছিল না। ভয়ে ভয়ে আবার দরজাটা খুলে মাথা হেঁট ক'রে সে দাঁড়ালো।

প্রফুল্ল বললে—মশা মাছির শব্দে আমি জেগে উঠি তা জানো?

দামিনী চুপ।

এত রাতে আমার ঘরে ঢুকেছিলে কি জন্যে? রাগে প্রফুল্ল ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো। বললে—চুরি করবার আর জায়গা পাও নি? অবশেষে আমার ঘরে? প্রথম থেকেই চোর বলে যে তোমায় সন্দেহ করছিলাম সে কি আমার ভুল? অঙ্ক ক'সে ক'সে মাথা আমার জলের মতন পরিষ্কার তা জানো? এক চাউনিতেই মানুষকে চিনে ফেলতে পারি।—এদিকে এসো।—বলে সে সরে এলো।

—না না, শুধু এলে হবে না, যা কিছু তোমার আছে, পুঁটলি-পোঁটলা সব নিয়ে এসো।

একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দামিনী তার কাপড় দু'খানি নিয়ে বেরিয়ে এলো।

চেয়ারের উপর বসে প'ড়ে প্রফুল্ল বললে—ঢেঁকিকে লাথি না মারলে সে কথা শোনে না। দুধ-কলা দিয়ে এতদিন সাপ পুষেছিলাম।—যাও, দরজা খুলে দিয়েছি—সোজা চলে যাও। চুলের মুঠি ধরে' তোমাকে আমার শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু চোরকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে।—যাও, চলে যাও। ওকি, বসলে যে দেয়ালের ধারে?

আলোটা হাতে করে প্রফুল্ল আবার উঠে এল। পরে বললে—এখন তোমাকে পথ দেখিয়ে দেয়া ছাড়া আমার আর কোনো বিবেচনা নেই। যাও, চলে যাও, দূর হয়ে যাও—কোনোদিন আর এ চোখের সুমুখে এসো না, তা হলে যে অপমানটুকু আজ বাকী রইলো তাও হবে।

ধরা গলায় দামিনী বললে—অন্ধকারে কোথায় যাবো?

চুরি করবার বেলা ত অন্ধকার মনে হয় নি?—ওকি, কান্না হচ্ছে যে ফোঁস্ ফোঁস্ করে! তা হোক—দয়া মায়ার বালাই আমার নেই।

প্রফুল্ল আবার এসে চেয়ারে বসলো। পরে অন্য দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—অথচ কি যে চুরি করতে এসেছিলে তা তুমিই জানো। আজ সকালেই ত তোমার কাছে একটা টাকা ধার করে চালিয়েছি কিন্তু তা বললে কি হয়, চোর যারা তারা নিজের স্বভাব ছাড়বে কেন? কই, গেলে না যে এখনো?

দামিনী তবুও বসে রইলো। চোখ দিয়ে তখন তার দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। প্রফুল্ল বললে—মেয়েদের চোখের জল কোনোদিন দেখি নি। কি জানি

কেন, তোমার দিকে চেয়ে মনটা নরম হয়ে আসছে। জীবনে তোমার কী সুখ বলতে পারো দামিনী? এক মুঠো ভাতের জন্যে পরের দোরে দোরে চিরদিন ঘুরে বেড়িয়েছো; মেয়ে হয়ে সংসারী হও নি কোনোদিন; নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নও,—পরের বস্তুতে লোভ। দামিনী, কী সুখ তোমার?

দামিনী কাঠের মতো বসে রইলো; নিঃশব্দ—নিরুত্তর।

তা সে যাই হোক,—কাল তোমায় যেতেই হবে। কিন্তু মনে রেখো, কাল যাবার সময় তোমায় ওই চোখের জল···হ্যাঁ, ও চোখ যেন আর না দেখি,—

জানলার বাইরে স্বচ্ছ অন্ধকারের দিকে চেয়ে হঠাৎ এক সময় একটু হেসে প্রফুল্ল আবার বললে—তোমার কথা ভাবতে গিয়ে, তোমার বিচার কর্ত্তে গিয়ে আমার নিজের কথাও মনে পড়ে' গেল দামিনী। কেবল কি তোমার জীবনেই সুখ নেই।

অগ্নিশিখা

প্যাসেঞ্জার ট্রেন সবেমাত্র একটা ষ্টেশন ছাড়লো। অত্যন্ত একঘেয়ে তার পথ, পীড়াদায়ক অসহনীয় একঘেয়েমি, গতিটা যেন তার ক্লান্তিতে ভরা। এই নিরুদ্বেগ অবসন্নতা নিয়ে এ গাড়ী যে কেমন করে' কলকাতায় গিয়ে পেঁছিবে ভাবলে অবাক হতে হয়। মাত্র আশী মাইল রাস্তা, একখানা এত বড় ট্রেনের পক্ষে কিছুই না, কিন্তু পনেরো মাইল পথ পার হতেই একে চারবার থামতে হয়েছে। এমন অনুগত, এমন বাধ্য গাড়ী আর দু'টি নেই। লাল নিশানার হাতছানি কোথাও দেখলেই থামবে। যতক্ষণ চলে তার চেয়ে বেশিক্ষণ থামে, থামতেই তার উৎসাহ।

থামতে তাকে হবেই। প্রখর জ্যৈষ্ঠের রোদ হা হা করে জ্বলছে। মাঠ জ্বলছে, আকাশ জ্বলছে। না থামলেই তার চলবে না। যাত্রীরা সরবৎ খাবে, জল নেবে, পান কিনবে, নামবে কেউ, কেউ বা উঠবে—যার এত তাগিদ তার পক্ষে এক দৌড়ে পথ পার হওয়া চলে না। তা ছাড়া 'লাইন ক্লিয়ার' তার ভাগ্যে ক্বচিৎ ঘটে, কেউই তাকে অগ্রসর হয়ে যেতে দেয় না, তার আগে চলবার কথা নয়। সংসার-ভারাক্রান্ত দরিদ্র কেরানীর মতো সে কুণ্ঠিত, সশঙ্কিত। সবাইকে পথ ছেড়ে দিয়ে সকলের পিছনে চলাই তার স্বধর্ম। ডাক গাড়ীর মতো ক্ষাত্রতেজ তার নেই।

গরমে ঘামে আর অবসাদে যাত্রীরাও নেতিয়ে পড়েছে। তারা জানে এক সময় পেঁছিবেই, পেঁছিতে পারলেই তারা খুসি। সন্ধ্যার আগে কিন্তু গাড়ী কলকাতায় পেঁছিবে না। সময়ের সঠিক হিসাব নিয়ে মেয়ে-কামরায় তুমুল আলোচনা উঠেছে।

নিছক বাঙালী স্ত্রীলোকের মজলিস। নির্ব্বুদ্ধিতা ও গ্রাম্যতায় তারা বাংলার স্ত্রীজাতির হুবহু প্রতিনিধি। যে কয়জন মেয়ে আলোচনায় যোগ দেননি, তাঁরা ওর মধ্যে একটু ভদ্র, একটু ভব্য, খুব সম্ভবত তাঁরা বর্ণপরিচয় পর্যন্ত পড়েছেন,—অন্ততঃ তাঁদের চেহারা ও পরিচ্ছদের পালিশ দেখে তাই মনে হয়। যে মেয়েটি এতক্ষণ একান্তে জানলার ধারে বসেছিল, তার সঙ্গে আর সকলের চোখাচোখি হলেও এই মহামূল্য আলোচনায় কেউ তাকে আকর্ষণ করেনি। করবার কথা নয়। তার নির্বোধ চাহনি আলাপে বাধা দিয়েছে। চোখে তার কোনো ভাষা নেই, কৌতূহল নেই। সে ট্রেনে চড়ে চলছে কিনা, তার কাছাকাছি এতগুলি স্ত্রীলোক আছে কিনা—তার মুখ দেখে কিছু মনে হবায় জো নেই। সম্ভবত কানে শুনতে সে পায় না। কিন্তু আশ্চর্য তার সাজসজ্জা, গলা থেকে সুরু করে হাতের কব্জি পর্যন্ত জামা আঁটা, তার উপরে কাপড় জড়ানো। এক রাশ মাথার চুল খোলা। চুল সে কোনো-দিন যে বাঁধে এমন চিহ্ন মাথায় কোথাও নেই। তিনটা ষ্টেশন আগে সে গাড়ীতে

উঠেছে, সঙ্গে একটা চামড়ার ব্যাগ,—এতক্ষণ নিঃশব্দে এতটা পথ সে চলে এসেছে। এই নিঃশব্দতাই যেন তার একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। বিস্ময়কর তার ঔদাসীন্য।

গরম হাওয়ার জন্য গাড়ীর জানলাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ভিতরে কেউ কেউ হাতপাখা চালাচ্ছে। তাদের ভিতর একজন এবার একটু এগিয়ে এল। মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, হ্যাঁগা বলি অ মেয়ে—

মেয়েটি ফিরে তাকালো। এক প্রৌঢ়া প্রশ্ন করছেন।

তুমি কোন ইস্টিশানে নামবে গা ?

প্রথমটা উত্তর পাওয়া গেল না। আবার প্রশ্ন করায় মেয়েটি বললে, শিয়ালদায়।

ওমা, তবে ত আমাদের সঙ্গেই। ক'টার সময় পেঁছিবে জানো মা ?

এবারেও উত্তরটা ছোট। খুব ছোট আর স্পষ্ট ; বললে জানি।

নির্ভুল সময়টা শোনবার জন্য সবাই তার দিকে একযোগে ফিরে তাকালো। কিন্তু আবার সে উধাও হয়ে গেল নিজের প্রকৃতির মধ্যে। তার সঙ্গে কথা কইতে গেলেই যেন তার ঘুম ভাঙাতে হয়। বোঝা যায় না, ঘুমোয় কিম্বা ধ্যান করে, কিম্বা স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার এই নিরাসক্তিতে কয়েকজন মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। জানে— এইটুকুই উত্তর, এইটুকুই তাদের শোনবার। এর চেয়ে বেশি তারা জানতে চায়নি, চাইলে হয়ত শুনত। অথচ মেয়েটির আশ্চর্য ধৈর্য। এই অসহ্য গরমে তার কোথাও চাঞ্চল্য নেই, প্রশান্ত, অকম্পিত। কপালে ঘাম গড়াচ্ছে, গলার কাছে জামাটা ভিজে উঠেছে,—ভ্রূক্ষেপ নেই। এক গোছা চুল মুখের উপর দিয়ে নেমে এসেছে, গ্রাহ্য করছে না।

একজন বর্ষীয়সী এবার একটু সরে এলেন। বললেন, চুপ করলে কেন বাছা, ক'টার সময় শ্যালদায় পেঁছিবে বললে না ত ?

মেয়েটি আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। বললে, ছটা চব্বিশে।

একেবারে তার কণ্ঠস্থ হিসাব, কাঁটায় কাঁটায়। আবার মুখ চাওয়াচায়ি। ওর বয়সটা কত, কাপড় জামার জটলায় বোঝবার উপায় নেই। কেবলমাত্র মুখ দেখে বাঙালী মেয়ের বয়স বোঝা যায় না। স্বাস্থ্যটা ভাল। হাতের আঙুলে বয়সের চিহ্ন নেই। পায়ে ঘুণ্টি বাঁধা শু। মাথার চুলে বয়স নেই। দাঁতগুলি চাপা। পিছন দিকটা আড়াল করা। বয়সটার ইঙ্গিত না পেলে অনান্য মেয়েদের মনে স্বস্তি নেই। তারা সবাই আপন আপন বয়সকে স্পষ্ট প্রকাশ ক'রে বসে রয়েছে। তাদের কাপড় পরা দেখলে নারীর দেহ সম্বন্ধে আর কোনো কৌতূহল থাকে না। আপন আপন দেহের প্রচারকার্য করবার জন্য তাহা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সকলের চেয়ে সত্য যে, তারা স্ত্রীলোক।

তোমার সঙ্গে কে আছে, হ্যাঁগা মেয়ে ?

এবার সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল। একটু নড়ে চড়ে বসে' বললে, কেউ নেই।

একলা যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

বোঝা গেল না তার এই স্মিত মুখখানা স্বাভাবিক কি না। চোখের তারার ভিতরে তার কোথায় যেন একটি হাসির ছায়া আছে। চাপা ঠোঁটের ভিতরে কি বিদ্রূপ রয়েছে? তার এই স্বাভাবিক বৈরাগ্যের পিছনে কি তাচ্ছিল্য? মেয়েদের ভিতরে দেখতে দেখতে আবরণ ও কৌতূহল কানাকানি চলতে লাগলো। তাদের সব আলোচনা ও সমালোচনা একটি কেন্দ্রে এসে দাঁড়ালো।

গাড়ী কখন থামছে আর কতক্ষণই বা চলছে কে জানে। থামবার সময় বাঁশী বাজে, চলবার সময় নয়। তিন মাইলের পরেই তাকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়াতে হয়। এমন ভদ্র এবং বিনয়ী ট্রেন আর কোনো লাইনে চলে না। বাঙালী মেয়ের চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়েছে।

তোমার নাম কি মা?

নূতন প্রশ্নে মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকালো। সে যেন অগাধ চিন্তায় পড়েছে, চোখে মুখে তার কূল-কিনারা নেই। নির্বোধ, সত্যি সে নির্বোধ, নিজের নামটা পর্যন্ত সে মুখস্থ রাখেনি, নিজের নামটা প্রকাশ করতে তার লজ্জা। মুখের উপর থেকে সে চুলের গোছা সরালো, সজাগ হয়ে তাকালো, সচকিত হয়ে বসলো। বললে, আমার নাম সুশীলা।

সুশীলাই বটে। শান্তি, নমিতা, অমিতা, কমলা এবং ওই জাতের নামগুলোও তার গায়ে জুড়ে দেওয়া চলে। অবলা হলে আরো ভালো। তাদের শিথিল ক্ষীণাঙ্গের দৌর্বল্যের মতোই তাদের নামগুলো এলিয়ে-পড়া। সুশীলা শুনে সবাই আশ্বস্ত হল। যাক এ মেয়ে তাদেরই দলে। নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগ্রামের মেয়ে। কোনো অপগণ্ড গণ্ডগ্রাম। সুশীলাকে ঘিরে সবাই বসলো, সে যেন তাদের আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ, বহুপরিচিত। সুশীলা? বাঁচা গেল। তাদের মধ্যেও একজন সুশীলা আছে। ওই নেপুর মা, ওর পোষাকী নাম সুশীলা, ছেলেপুলে হবার পর থেকে ওকে নাম ধরে অবশ্য আর কেউ ডাকে না। যাক তাদের সব কৌতূহল মিটলো। লক্ষ লক্ষ সুশীলার এও একজন।

হ্যাঁ গা সুশীলা, একলা যাচ্ছ কলকাতায়, মেয়েমানুষ, সাওস ত তোমার কম নয় মা? কে আছে সেখানে?

সুশীলা এবার প্রশ্নকর্ত্রীর প্রাঞ্জল ভাষা শুনে হাসলো। খুব সম্ভব এবার সে একটু সহজ হতে পেরেছে। আঘাত না করলে বৈরাগ্যের খোলস খসে না। বললে, সবাই আছে।

তবে একলা যাচ্ছ কেন?

একলা ত নয়, আপনারা রয়েছেন।

অদ্ভুত উত্তর বটে। স্পষ্ট ধারালো। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির মুখ দিয়ে আর কথা ফুটলো না। অল্পবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক এবার বললে, অত জামা পরেছ গরম লাগছে না?

লাগছে বৈকি।

তবে বোতামগুলো খুলে দিলেই ত হয়।

সুশীলা হঠাৎ হাত দিয়ে নিজের জামাটা চেপে ধরল, তারপর গলা নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, না, ভেতরে সেমিজ নেই—

তার লজ্জা দেখে ত ওরা অবাক। এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মেয়েদের মধ্যে না হয় কিছু জানাজানিই হবে। মেয়েদের কাছেও যে মেয়ের লজ্জা. বিয়ে হ'লে তার উপায় ? এই সব মেয়েরই 'হুড়কো' হয়।

তোমার বে হয়নি ?

সুশীলা হাসলো। ততক্ষণে দুটি মেয়ে তার একটু অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। একটি মেয়ে উঠে এসে তার গা ঘেঁসে বসলো। অন্যটি বিবাহিতা। সেটি সুশীলার জামার হাতার বোতাম খুলতে খুলতে বললে, অত লজ্জা করে না, হাত দুটোয় তোমার ভাই একটু হাওয়া লাগুক, ঘেমে যে নেয়ে উঠেছ!

অপ্রত্যাশিত স্নেহ, অনাহুত আত্মীয়তা, অস্বীকার করবার আর পথ নেই। ছোয়াছুঁয়ি না হ'লে মেয়েদের বন্ধুত্ব তৃপ্তি পায় না, মাটীর মতো কণায় কণায় লেগে থাকা তাদের প্রকৃতি। কুমারী মেয়েটি উঠে সুশীলার চুল ফিরিয়ে বেঁধে দিতে লাগলো।—ওমা, তোমার হাতে চুড়ি কই ভাই ? কিছু নেই যে।

যেন অলঙ্কার না থাকলে স্ত্রীলোক ব'লে প্রমাণ হয় না। কিন্তু তার কথায় সবাই চকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। চক্ষের নিমেষে দেখা গেল সুশীলার সর্ব্বাঙ্গে কোথাও আভরণের চিহ্নমাত্র নেই। নাক কান গলা হাত সব খালি। বিস্ময়ের কথাই বটে। রহস্যটা এতক্ষণে উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেল।

নেপুর মা বললেন, আহা তাই ত বলি, মুখ ফুটে মেয়ে কথা বলে না কেন। বাছা রে, এইটুকু বয়সে—কপাল পুড়েছে কদ্দিন মা ?

সুশীলা কপালে একবারটি হাত বুলোল। তারপরেই মনে পড়্‌লো, প্রশ্নটা কপালের প্রতি নয়, ভাগ্যের প্রতি। কুমারী মেয়েটি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে সমস্ত গাড়ীর সকল স্ত্রীযাত্রীর নিকট থেকে অজস্র স্নেহ ও সহানুভূতি অবিরত বর্ষিত হতে লাগলো। মাথায় এয়োতির চিহ্ন না দেখে প্রথমেই যিনি নাকি সন্দেহ করেছিলেন তিনি তাঁর সুদূর অতীত জীবনকে স্মরণ করে অশ্রু পর্যন্ত মুছলেন। তারপর কানাকানি আর জটলা আর আন্দোলন। তারপর চলতে লাগলো কত বিধবা হওয়ার গল্প। অল্পবয়সে বিধবা হবার বিপদটাই ওরা জানে, আনন্দটা জানে না।—কত দিন স্বামী গেছে মা ?

কৌতুকে সুশীলার চোখ নেচে উঠল, মন ভরে উঠল। বললে, তা কি আর মনে আছে!

আহা, মরে যাই, মনে থাকবার কি কথা ? সেই এতটুকু বয়েস···কচি মেয়ে— এমন সমাজের মুখে ছাই!

যে দুটি মেয়ে অন্তরঙ্গ তারা বসলো কাছাকাছি। যেটুকু যত্ন ও যেটুকু মমতা তারা ইতিমধ্যে প্রকাশ করে ফেলেছে তার জন্য তারা লজ্জিত,—এগুলি কী

অকিঞ্চিৎকর। স্বামীহীন যারা, নিজেদের কাছেও তাদের মূল্য নেই। তুচ্ছ প্রসাধন, তুচ্ছ আভরণ। আগেকার সতীদাহ ঢের ভালো ছিল, সেই প্রথা উঠে গিয়েই ত মেয়েদের এত দুঃখ। সতী বটে তা'রা।

বউটি চুপি চুপি বললে, সত্যি তোমার মনে নেই তাঁকে ?

কা'কে ?

আহা, এ বুঝি ঠাট্টার কথা ? তোমার স্বামীর কথা হচ্ছে।

সুশীলা হেসে বললে, ও, তার কথা। মনে রেখে কী হবে ? আমার মনে অত জায়গা নেই।

ওকি কথা ভাই, পাপ হবে যে।

তা বটে, এ কথাটা সুশীলার মনে ছিল না। কে জানে, পাপ এত সহজে হয়।

এদেশে পায়ে পায়ে পাপ। ওদিকে যাঁরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলেন, তাঁদের একজন বললেন, কি জাত মা তোমার ?

সুশীলা বললে, হিন্দু।

তা ত জানি। বলি, বাউন না কায়েত ?

ব্রাহ্মণ।

তবে ত একাদশীও করতে হয়। আহা, অতটুকু মেয়ে—একবেলাই ত হাত-মুখের কাজ ? তা ত বটেই, বাঁউনের ঘর, দুবেলা খাওয়া ত আর চলে না।

সুশীলা বললে, কোনো কোনোদিন একবেলাও খাইনে।

আহা, খাওয়া যে ভগবান উঠিয়ে দেছে মা। পোড়া কপাল আমাদের। ইনি গেছেন আজ চল্লিশ বছর, কাঁচকলা আর মটরডাল খেয়ে হাড়ে ঘুণ ধরলো। বিয়ে পৈতের মুখ দেখবার হুকুম ছিল না। তুমি মা এবার থেকে একখানি চাদর ব্যাভার করো, বিধবা মানুষ গায়ে ত জামা দিতে নেই।

সঙ্গিনী দুটির সঙ্গে চোখচোখি করে' সুশীলা হাসিমুখে বললে, জামা গায়ে দিলে বুঝি পাপ হয় ?

তারা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। সুশীলা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বললে, স্বামী মরবার পর গা খুলে বেড়াতে হবে ? তিনি ছাড়া কি দেশে আর পুরুষ নেই ?

বউটি তার স্পষ্টবাদিতায় শঙ্কিত চোখে তাকালো, চোখ-ইসারায় কুমারী মেয়েটিকে সরে যেতে বললে। এই মেয়েটির ভিতরে কোথায় যেন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত আছে, হঠাৎ গৃহস্থ বধূর কাপড়ে চোপড়ে আগুন ধরে যাবার ভয় রয়েছে। তার কাছ থেকে দূরে থাকাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।

গাড়ীখানা যেন খুঁড়িয়ে চলছে, পেঁাছবার নামটি নেই। পশ্চিম দিকে রোদ নেমেছে। বেলা অপরাহ্ণ। সময়টা সুশীলার মন্দ কাটলো না। এমন সঙ্গিনী পেলে দিনরাত সে টেুণে ভ্রমণ করতে পারে। ভাগ্যি বিধবা বলে সবাই তাকে জানল

নৈলে এই আনন্দটুকু থেকে তাকে বঞ্চিত থাকতে হোতো। আর তার কোনো সংকোচ নেই, বাধা নেই, সে খুসি হয়ে উঠেছে।

বয়স্কা স্ত্রীলোকদের কৌতূহল মিটে গেছে, তাদের জানা হয়ে গেছে, চিনে নিয়েছে তারা সুশীলাকে, আর কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো আগ্রহ নেই। তাদের আগ্রহ দুর্ভাগ্যের সংবাদটি শোনা পর্যন্ত—ব্যস্, ওজন করা একটু সহানুভূতি প্রকাশ করেই তারা কাজ সারলো। সুশীলা সব চেয়ে চেয়ে দেখল, দেখল তাদের চেহারার দ্রুত পরিবর্তন। তারা আর বন্ধু নয়, সঙ্গিনী নয়, তারা কেবল মাত্র সহযাত্রী, তাদের আগ্রহ আর কৌতূহল ফুরিয়ে গেছে। তাদের সকলের সঙ্গে সুশীলার জীবন কোথাও না কোথাও মিলেছে, এতেই তারা পরিতৃপ্ত। সুশীলার আর কোনো বৈচিত্র্য নেই, আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, জলের মতো সে স্বচ্ছ, শাদা কাগজের মতো সে সুস্পষ্ট।

কিন্তু বউটির মনে যেন স্বস্তি নেই, মাঝে মাঝে সে উসখুস করে উঠছে। বার বার এড়াতে গিয়েও সে মায়া ছাড়তে পারছে না। একসময় বললে, বাড়ীতে তোমাকে থান্ কাপড় পরতে বলে না?

সুশীলা হেসে বললে, বললেই কি পরতে হবে?

নিয়ম কিনা তাই বলছি।

ওপাশের বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকটি কান পেতে এদের কথা শুনছিল। এবার বললে, তা ত বটেই মা, এ যে নিয়ম। নিয়মের ওপরেই ত সব। তুমি মা জুতোটা পায়ে দিয়ে ভাল করনি।

সুশীলা বললে, হাঁটতে পারিনে শুধু পায়ে।

ওমা, তা বললে কি হয়। জুতোই যদি পায়ে ওঠে তবে আর বাকি কি থাকে মা? সোয়ামী যার অকালে মরে তার শরীরে যত্ত··শাস্তরটা মানতে হবে ত!

শাস্ত্রের পরে আর কথা চলে না। সুশীলা নাস্তিক নয়। সবিনয় শ্রদ্ধায় সে চুপ করে রইল। মনে হোলো আজ থেকে সে জুতো পরা একেবারে ত্যাগ করবে।

এবার বউটি চুপি চুপি বললে, তোমার স্বামী কিসে মারা গিছলেন?

সুশীলা এদিক ওদিক তাকালো। সকলকে সে লক্ষ্য করলো। তাকালো বাইরের দিকে, চলন্ত ট্রেনের কামরাটা সে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর হঠাৎ নিশ্বাস ফেলে বললে, ওঃ সে অনেক বড় গল্প।

বউটির চোখে মুখে কৌতূহল জ্বল জ্বল করতে লাগলো। কুমারী মেয়েটি আবার কাছে ঘেঁষে এল। মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে আপনার ছেলেপুলে হয়নি?

সুশীলার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। অনাবশ্যক, নিতান্ত অনাবশ্যক প্রশ্ন।

কাঁটায় কাঁটায় ইতিমধ্যে সে যেন ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠেছে। অসহ্য গরম, অসহনীয় সংসর্গ। এরা তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পরীক্ষা করছে, তাকে তলিয়ে বিশ্লেষণ করছে, তার লজ্জাকে পর্যন্ত হরণ করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু রাগ করা চলবে না। হাসিমুখে কোমল কণ্ঠে সে কুমারী মেয়েটির মুখের উপর বললে, সন্তানের জন্মদান করবার আগেই তিনি মারা গেছেন।

দ্রুত, নিষ্ঠুর উত্তর। ছুরির মতো তীক্ষ্ণ, বিষাক্ত। ওরা স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে গেল।···তারপর সুশীলা হাসলো। হেসে বললে, মৃত্যুর গল্পটা শুনতে চান?

বউটি ভয়ে ভয়ে বললে, শুনতে ইচ্ছা করে।

ওঃ! সে কথা ভাবলে আজো গায়ে কাঁটা দেয়। একদিন দুজনে নৌকায় চড়ে এক ছোট নদীর ভেতর দিয়ে যাচ্ছি—

কোথায়?

তাঁর পাখী শিকার করার সখ ছিল। হ্যাঁ, নদীর দুধারে গভীর বন, কত জন্তুর কত রকম আওয়াজ,—নৌকোর মধ্যে আমি আর তিনি। তখন বসন্ত কাল—

কুমারী মেয়েটির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো, জীবনের দুর্বার নেশা তার চোখে ঝলমল করছে। সুশীলা হেসে বললে,—চোখে তার স্বপ্নের নিবিড় মদিরতা,—বললে, দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, নদীর পার দেখা যায় না, আকাশে ঝড়ের লক্ষণ,—তীরে নৌকা ভেড়াতে হোলো। কী অন্ধকার! কাছাকাছি গ্রাম আছে কিনা জানবার জন্য দু'জনে বনের পথে যাচ্ছি এমন সময় বিদ্যুৎ চমকাল—ওমা, দেখি বিরাট পাহাড়ের গায়ে আমরা দাঁড়িয়ে—

তারপর—? বউটি বললে।

তারপর উনি হঠাৎ বললেন, কিসের যেন বোটকা গন্ধ! এদিক ওদিক ফিরে দেখি, খুব কাছে পাশাপাশি দুটো আলো জ্বলছে। আলো? এগিয়ে যেতেই আঁৎকে উঠলুম। আলো নয়, একটা জানোয়ারের চোখ! তাঁর হাতের বন্দুক পড়ে গেল। ভগবানকে ডাকার কথা ভুলে গেলুম। হ্যাঁ, আমি পালাতে পেরেছিলুম, তাঁর শেষ গলার আওয়াজটা শুনতে শুনতে। তারপর আমাকেও কে যেন তাড়া করলো, পাগলের মতো ছুটলুম, জঙ্গলের টানাটানিতে কাপড় চোপড় সব খুলে পড়ে গিয়েছিল। ছুটছি, ছুটছি।—এলুম নদীর ধারে। কে যেন দাঁড়িয়ে। মানুষ, না জানোয়ার? বিদ্যুতের আলোয় দেখি মানুষও নয়, জানোয়ারও নয়, একটা চলন্ত ছায়া—ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম নদীতে—

গল্পের মাঝখানে অকস্মাৎ ট্রেনখানা থামল। শিয়ালদা স্টেশন এসে পড়েছে। সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে চারিদিকে। নানা-কণ্ঠের আওয়াজ, ইঞ্জিনের নিঃশ্বাস, কুলির চীৎকার। লটবহর নিয়ে সবাই নামছে গাড়ী থেকে। মেয়েদের নামিয়ে নিতে পুরুষরা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার গোড়ায়।

হঠাৎ তাদের ভিতর একজনকে লক্ষ্য করেই সুশীলা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। উচ্ছ্বসিত উল্লাসে হেসে চীৎকার করে বললে, এসেছ? চিঠি পেয়েছিলে ঠিক সময়ে?

চঞ্চল, উদ্দাম, অসংযত। চোখে ও মুখে তার ঝড়ের দ্রুততা। ছোট স্যুটকেশটা তাকে তাড়াতাড়ি হাতে নিতে দেখে বউটি বললে ও কে ভাই তোমার?

আমার স্বামী।

স্বামী? স্বামী? বিধবা বললে যে?

দ্রুতপদে গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে সুশীলা ঠোঁট উলটে হেসে বললে, আমার এখনো বিয়েই হয় নি। বলে সে একটি সুশ্রী যুবকের হাত ধরে স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিয়ের আগে বিয়ে

নন্দরাণী তীরবেগে উপর থেকে নীচে নেমে এলো। চোখে মুখে তার উত্তেজনা, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত, মাথার এলো-খোঁপা আলুথালু। সুরবালা দাঁড়িয়েছিলেন বৈঠকখানার দরজায়, বাড়ীর সরকার মশায়কে ভাঁড়ারের ফর্দ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—নন্দরাণী রুদ্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল, মা ?

মা ফিরে তাকালেন।

এদিকে এসো, শিগগির এসো একবার—

যাই বাছা,—মা বললেন, ফর্দটা সরকার মশাইকে—

অধীর কণ্ঠে নন্দরাণী বললে, থাক্ তোমার ফর্দ, আসতে বলছি না একবার চট্ ক'রে ?

মা এলেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওমা, সকাল বেলা এমন গরু-হারানো চেহারা কেন নাদু ?

উত্তেজনায় নন্দরাণীর চোখের বড় বড় তারা দুটো জ্বালা করছিল। কম্পিত চাপা কণ্ঠে সে বললে, তোমরা নাকি আমার বিয়ের চেষ্টা করছ ?

মা শিউরে উঠে হেসে বললেন, কে বললে এমন সর্বনেশে কথা ?

ওই যে শুনলুম বাবা আর মেজকাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলাবলি করেছিলেন ? সত্যি কথা ব'লো কিন্তু, নৈলে আমি ভয়ানক কাণ্ড করব।

হাসি মুখে বললেন, কী অন্যায়, আমি দিচ্ছি বারণ ক'রে। ছি ছি, এত বড় মেয়ের কি কেউ বিয়ে দেয় ? এমন ত কোথাও শুনিনি ! ওরা পুরুষের জাত কিনা, বড়োসড়ো মেয়ে দেখলেই ষড়্‌যন্ত্র করতে বসে।

তুমিই যত নষ্টের মূল !—নন্দরাণীর গলার ভেতরে কান্না উঠে এলো।

মুখ ফিরিয়ে সুরবালা বললেন, সরকার মশাই, বাড়ীতে ভয়ানক বিপদ ঘটল, আইবুড়ো মেয়ের বিয়ের কথা উঠেছে—আপনি ওই নিয়ে এখন যান।

আচ্ছা বৌমা। ব'লে বৃদ্ধ সরকার মশায় তাঁর বিরল দন্তে হেসে বেরিয়ে গেলেন।

সুরবালা বললেন, চল্ ত দেখি নাদু, ওদের কতখানি আস্পর্ধা...আজ আর রক্ষে রাখব না—

নন্দরাণী বললে, থাক্, আর সীন্ ক'রে কাজ নেই, ঢের হয়েছে। এই ব'লে সে উপরের সিঁড়িতে গিয়ে উঠল, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় বললে, আজ থেকে কলেজ যাবো না, পড়ব না, খাবো না,—কিছু করব না। চলে যাবো মামার

বাড়ী। এমন অত্যাচার আমার ওপর? আমি মরব।—দ্রুতপদে সে উপরে উঠে গেল।

ও ঠাকুর, ছানাটা যেন পুড়ে যায় না, উনুনের ওপর আলগোছে ধ'রে থেকো।—বলতে বলতে সুরবালা রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

বেলা সাড়ে নটার পর রমেশবাবু ঢুকলেন নন্দরাণীর ঘরে। নন্দরাণী একখানা বই সামনে খুলে বসেছিল। এটা নিজের মুখের চেহারা গোপন রাখার উপায়। রমেশবাবু বললেন, তোমার কি আজ ফার্ষ্ট ক্লাশ নেই মা?

মাথাটা আরো হেঁট করে নন্দরাণী বললে, আছে বাবা।

তবে ত এখুনি গাড়ী আসবে। তোমার এখনো নাওয়া খাওয়া—আজ হেঁটে যাবো।

বাবা বললেন, তা হলে ত আরো তাড়াতাড়ি করা দরকার, হেঁটে যখন যাবে এখান থেকে এক মাইল ডায়োসেস্‌ন্‌—কেমন?

তা হবে। ব'লে নন্দরাণী তাড়াতাড়ি কেবলমাত্র একখানা তোয়ালে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কলেজে তাকে যেতেই হ'লো। ইতিমধ্যে মা-কে নন্দরাণী খুঁজলে না, সুরবালাও সামনে এলেন না। বাবা কেবল দু-একবার তার খাবার দালানে পায়চারি ক'রে গেলেন। সুরবালা তাঁকে যেন কি ইসারা করলেন।

নন্দরাণী কলেজে গেল হেঁটে।

দিন চারেক পরে তার উত্তেজনা কিছু কম্‌ল। প্রথম ধাক্কাটা আর নেই, এখন নন্দরাণী শাদা চোখে চেয়ে দেখছে। ক্লাসে রেবার সঙ্গে পরামর্শ করেছে, বিয়ে যদি করতেই হয় তবে আই-সি এস্‌ পাত্রকে। ওরা শিক্ষিত আর সংস্কৃত। কি বলিস রেবা?

রেবা বললে, আমি ফার্ষ্ট ইয়ার থেকে একথা ভাবছি, ললিতাদিও তাই বলছিল—

নাচ বলো, গান বলো, শিল্প-সাহিত্য বলো, আই সি এস্‌ ছাড়া আর গতি নেই। ওরাই সচ্চরিত্র, কারণ ওরা বিলেতফেরৎ।

কানাঘুষোটা বাড়ীতে দিনে দিনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে, নন্দরাণীর প্রতিবাদের কোনো ফল হয়নি। বাবা জানিয়েছেন, পাত্র সম্বন্ধে নন্দরাণীর মতামত নেওয়া হবে। সেই একমাত্র ভরসা। নন্দরাণী প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

সুরবালা বললেন, ওই ত অতটুকু মেয়ে, সবে কুড়ি বছরে পা দিয়েছে। ওর বিয়ে এখন আমি দেবো না। কি বলিস নাদু?- কণ্ঠে তাঁর কৌতুক ফুটে ওঠে।

নন্দরাণী উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে চ'লে যায়; মার কথা শুনলে বিরক্ত হয়ে ওঠে মন।

সেদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে নন্দরাণী ভাবছিল, তাকে কলেজে পড়তে হচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য নয়, পাশ ক'রে ডিগ্রি পাবার জন্য। বিয়ের অলঙ্কারের মধ্যে এটাও একটা। তার ভাবী স্বামী বন্ধু-সমাজে গর্ব ক'রে বেড়াবেন শিক্ষিত স্ত্রী পেয়ে। ডিগ্রিটা হবে তার অঙ্গের একটি অলঙ্কার। যেমন খোঁপার ফুল, যেমন কানের দুল।

সে আপমানও সহ্য হবে যদি পাত্র হয় আই-সি-এস্। আই-সি এস্‌রা নিরাপদ, তারা ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা। নন্দরাণী জানে, ছেলেদের উচ্চাশা—ভালো চাকরী; মেয়েদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—আই সি-এস্।

বইগুলো হাতে চেপে নন্দরাণী ভাবছিল, তার বন্ধু নীরার বিয়ে হয়েছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে, তাকে অতিক্রম না করলেই চলবে না। চেহারা যেমনই হোক আই-সি-এস্ হতেই হবে। নৈলে ভালো পাত্র আর কোথায়? বাবা বলেন, নতুন উকীলরা উপবাসী; নতুন য়্যাড্‌ভোকেটরা শ্বশুরের অর্থে চাপকান্ কেনে; নব্য ব্যারিষ্টাররা স্ত্রীদের পাঠায় সীনিয়রদের সঙ্গে ফ্ল্যার্ট করতে,—সম্ভ্রম বিকিয়ে পসার জমায়,—নন্দরাণীর নাসা কুঞ্চিত হয়ে এলো।

কিছুকাল পরে এক বিবাহেচ্ছু অধ্যাপকের খোঁজ পাওয়া গেল। কি ভাগ্যি যে গণ গোত্রে মিলল না, তাই রক্ষা। ওরা শিক্ষার অভিমানে স্ফীত, উপদেশ ছড়ানো আর অধিকার আলোচনা -এই নিয়ে ওদের দিন কাটে। হয়ত কলেজফেরত দুপুরবেলা বাড়ীতে এসে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে থীসিস শোনাতে বসবে। কল্পনা করতেও শরীর শিউরে ওঠে। অধ্যাপকের চেয়ে বীমার দালাল ভালো, বিনয় এবং একাগ্রতা তাদের সহজাত। ওজন ক'রে ওরা স্ত্রীদের ভালোবাসে না। মিথ্যা কথা মনোহর ক'রে বলে।

তাদের ক্লাসের বেচারি নির্মলার কথা তার মনে পড়ছে। অমন চমৎকার মেয়ে কিনা বাজে একটা আদর্শের জন্য বিয়ে করতে গেল ক্ষিতীশ পালকে? স্বদেশী, জেলখানা রাজনীতিক ক্ষিতীশ পাল, স্বামী হিসেবে তার মূল্য কি? জেল যার কাছে তীর্থস্থান, ঘরে আর মন বসবে? যদি-বা বসে তবে তার আত্ম প্রশংসার জ্বালায় রাত্রে ঘুমোবার উপায় থাকবে না। পুলিশ সম্পর্কে তার দুঃসাহসের গল্প বানিয়ে ব'লে নির্মলার কাছে অতিরিক্ত আদর পাবার চেষ্টা করবে; জেলে যাবার আগে কেঁদে-ককিয়ে স্ত্রীর জীবন দুর্বহ ক'রে তুলবে; বেচারি নির্মলার প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত। নন্দরাণীর হাসি পেলো।

ব্যবসায়ী স্বামী নন্দরাণীর খুব পচ্ছন্দ নানা কারণে। অগাধ অর্থ আর অখণ্ড অবসর। লোহার সিন্দুকের চাবি থাকবে তার আঁচলে বাঁধা। স্বামীর সঙ্গে কোনোদিন মান-অভিমানের পালা গাইতে হবে না। 'বাজার বড় মন্দা'—এই বাণী শুনেই কাটবে দিন। মাথায় টাক মুখে দোক্তা দেওয়া পান, পেটে ভুঁড়ি, আঙুলে গোটা পাঁচেক আংটি, পায়ে কালো কম্বলের মোজা আর শাদা ক্যাম্বিশের জুতো। চমৎকার একটি নাড়ু-গোপাল! তা হোক। অধ্যাপকের চেয়ে বুদ্ধিমান, রাজনীতিকের চেয়ে সক্রিয়। স্ত্রীর শিক্ষা-দীক্ষার সম্বন্ধে উদাসীন, স্ত্রী সেবাদাসী হ'লেই খুশী।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে জানলার বাইরে চেয়ে নন্দরাণী আকাশপাতাল কল্পনা করছিল। এই যে ঢেউটা উঠল, এ যে কোন্ তটে গিয়ে লাগবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। তার এই প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় চিড় খেয়েছে, সংসার আর তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। বাবা আছেন, কাকারা আছেন, প্রতিবাদ করা চলবে না, মুখ বুজে তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে

নিতে হবে। নিজের বিবাহ সম্বন্ধে সে যা কিছু স্থির ক'রে রেখেছে আজ সমস্ত একে একে মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল। সংসারে যে এমন ফাঁকি আছে এ তার জানা ছিল না।

মা ঘরে এসে ঢুকলেন। আলোটা নেবানো। একবার ডাকলেন, নাদু? ওমা—

সাড়া নেই। সুরবালা বিছানায় এসে ব'সে নন্দরাণীর মাথাটা কাছে টেনে নিলেন। জানা গেল, সে জেগেই রয়েছে। ঘরের ভিতরের বাতাসটা ঘন নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল, বোধ করি শরৎকালের প্রথম ভাগ। নন্দরাণীর গলার কাছে হাত দিয়ে সুরবালা দেখলেন, ঘামে তার গায়ের জামাটা পর্যন্ত ভিজে গেছে। বললেন, সর্ দেখি, জামাটা খুলে দিই?

আঃ থাক, জামা খুলতে হবে না ছাই। —নন্দরাণী বিরক্ত হয়ে মায়ের হাতের ভিতরে মুখ গুঁজে শুলো।

মা বললেন, অত লজ্জায় আর কাজ নেই, সর্...ঘেমে একেবারে যে নেয়ে উঠেছিস। ব'লে তিনি জোর ক'রে তার জামা ছাড়িয়ে নিলেন। এমন সময় কে যেন দরজার কাছ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল, মা মুখ ফিরিয়ে বললেন, মহেন্দ্র নাকি রে?

হ্যাঁ মা।

প্যাখাটা খুলে দিয়ে যা ত' বাবা?

মহেন্দ্র অন্ধকারে হাতড়ে একটা সুইচ্ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিলে। নন্দরাণী বললে আলো আর জ্বালতে হবে না, যা।

মহেন্দ্র চ'লে যাবার পর সুরবালা কথা পাড়লেন। হেসে বললেন, বিয়ের পরেও আমার ওপর এমনি ক'রে রাগ করবি?

নন্দরাণী বললে, বিয়ে আমি করব না।

বেশ, আমিও তাই বলি। বিয়ে তোর মা করেনি, মাসি করেনি, তুইও করিসনে। —সুরবালা হাসি চাপছিলেন।

নন্দরাণী চুপ ক'রে রইল।

সুরবালা বললেন, সন্ধ্যেবেলা যে ছেলেটার কথা তোকে বলছিলুম তাকে কি পছন্দ হয় না রে?

কোন্ ছেলেটা?—নন্দরাণী মুখ তুললে।

অবস্থা খুব ভালো, সুখের ঘর। ছেলে একেবারে বিদ্যের জাহাজ। একজন নামজাদা লেখক।

লেখক?

হ্যাঁ, সাহিত্যিক।

রুদ্ধকণ্ঠে নন্দরাণী বললেন, যন্ত্রনা ভয়ানক যন্ত্রনা দিচ্ছ মা তোমরা আমাকে। লেখককে বিয়ে করেছে আমাদের সেই অশ্রুকণা, মনে নেই তোমার? কোন্ কোন্ বিখ্যাত লোক তার ওপর প্রবন্ধ লিখেছে রবিঠাকুর আল্‌গোছে সার্টিফিকেট্ দিয়েছেন কিনা, তার ফর্দ দিবারাত্রি শুনতে শুনতে অশ্রু হায়রান! সেদিন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্লে দেখে এসেছ মনে নেই? ও আমি পারব না, তা তোমরা যাই বলো। পুরোনো লেখা শুনতে শুনতে প্রাণ যাবে। হয়ত রাত জেগে তার ফেরৎ দেওয়া লেখা নকল করতে হবে।

হয়ত আদ্ধেক রাতে থিয়েটারি ঢঙে কথা আরম্ভ করবে। তার চেয়ে বরং একটা বীমার দালালকে খুঁজে আনো।

সুরবালা নীরবে রইলেন। জানলা দিয়ে নতুন শরৎকালের বাতাস আসছে! আকাশে তারকার দল। আজকে আর মেঘ নেই। সুরবালা মেয়ের মাথার চুলের ভিতরে হাত বুলোতে লাগলেন।

এমন সময় নীচে যেন কা'র কণ্ঠস্বর শোনা গেল। উপরের বারান্দা থেকে রমেশ-বাবু সাড়া দিয়ে বললেন, নিরঞ্জন নাকি? ওপরে এসো।

মা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামলেন। বললেন, আমি যাই নাদু, অনেকদিন পরে এসেছে নিরঞ্জন। তিনি চলে গেলেন। নন্দরাণী উঠে বসে পুনরায় জামাটা গায়ে দিতে লাগল।

নিরঞ্জন তার বাবার বন্ধু পুত্র। বাল্যকাল থেকেই এ-বাড়ীতে তার যাতায়াত। সম্প্রতি সে বি-এ পাশ করেছে। ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে বিলেত যাবার চেষ্টায় আছে, পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছে। খুব সম্ভব রমেশবাবুর কাছে এসেছে পরিচয়পত্র নিতে।

জামাটা গায়ে দিয়ে নন্দরাণী কাপড় গুছিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। বারান্দা দিয়ে ঘুরে ওদিকের বৈঠকখানায় এসে দাঁড়াল। ঘরে তখন মজলিশ বসেছে। একটা কুশন্ চেয়ারে গিয়ে সে মাথা হেলিয়ে বসলো। নিরঞ্জন হেসে তাকালো তার দিকে। রূপের দিক থেকে দুজনেই কম নয়।

রমেশবাবু বসে আছেন পাশে রয়েছেন সুরবালা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেজকাকা তাঁর দাদাকে লুকিয়ে সিগারেট টানছেন—নন্দরাণী বললে, নিরঞ্জনদা, বিলেত যাবার ফিকির আঁটলে শেষ পর্যন্ত? বাবার জমীদারিটা ফোঁপরা ক'রে তবে ছাড়বে, কেমন!

নিরঞ্জন হেসে বললে, যা বলেছিস নাদু, তুই বা কম কি? আই-সি-এস্‌কে বিয়ে করতে চাইলে রমেশ কাকার সম্পত্তিটা কি অক্ষুণ্ণ থাকবে?

নন্দরাণীও হাসলো। বললে, সেটা হবে সৎপাত্রে দান, কিন্তু তুমি? পার্টি আর আউটিংয়ে মাসে মাসে তোমার কত লাগবে শুনি?

সুরবালা বললেন, মেয়ের জিভের ধার দ্যাখো। মাসিকপত্রগুলো তুই পড়া ছেড়ে দে নাদু—

নন্দরাণী বললে, ছাড়বো কেন, বাঙালীর ছেলের বিলিতি কেলেঙ্কারী ওতে প্রায়ই ছাপা হয়, এই জন্যে?

মেজকাকা বারান্দা থেকে সোৎসাহে বললেন, রাইট্‌লি সার্ভ্‌ড্।

নিরঞ্জন মৃদু মৃদু হাসছিল। বললে, সবাই নানা রকম পড়াশুনো করে কিন্তু তুই কেমন ক'রে নিজের পাঠ্য বেছে নিস, বল্ ত নাদু?

নন্দরাণী বললে, মা তোমার কুপুত্তুরকে সাবধান করো ব'লে দিচ্ছি। নিরঞ্জনদা, ডিস্‌গ্রেস্‌ফুল!—এই ব'লে সে উঠে চলে যাচ্ছিল। মা ইসারা ক'রে দিতেই নিরঞ্জন দৌড়ে গিয়ে খপ্ ক'রে নন্দরাণীর হাতটা ধ'রে ফেললে, বললে, মেয়ের রাগ কম নয়।

ছাড়ো বলছি !

ছাড়বো না,—

নিরঞ্জন বললে, মাথা ফাটালেও না।

নুইসেন্স্ —ব'লে নন্দরাণী আবার ফিরে এসে বসল। সুরবালা আর রমেশবাবু হেসে উঠলেন। সকলের ধারণা ওরা দুজনে এখনো ছেলেমানুষ! ওদের বিবাদটা চিরন্তন।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে ব'সে নিরঞ্জন বললে, কাল সকালের গাড়ীতে যাবো কেষ্টনগর, ফিরব দিন চারেক বাদে। যদি দরকার হয় তবে আপনি কিন্তু একটা ফোন্ করবেন কমিশনরকে, মনে থাকবে ত রমেশ কাকা ?

রমেশবাবু বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সুরবালা বললেন, জাহাজ ছাড়ার তারিখ কত ?

সতেরোই অক্টোবর।

ওঃ, এখনো অনিক দেরি।

নন্দরাণী বললে, এমন করছে যেন আজ রাত্তিরেই ও যাবে উড়োজাহাজে! ভারি ত বিলেতে যাবে তার আবার এত! বিলেত আবার দেশ!

নিরঞ্জন হাসি মুখে বললে, আঙুরগুলো টক।

আজ্ঞে না মশাই। খালাসীরাও যায় বিলেতে কিন্তু নেপালের রাণী থাকেন নিজের রাজ্যে।

সত্যি, কী অন্যায় আমার ? তোর সঙ্গে করি তর্ক। খালাসী যে, সেও যায় বিলেতে, কারণ সে পুরুষ; আর মেয়েমানুষ রাণী হলেও বন্দী।

আমার খাবার দেওয়া হয়েছে ? ওগো—ব'লে রমেশবাবু হেসে উঠে চলে গেলেন। সুরবালা বললেন, চলো দেখিগে; তোরা বোস একটু বাছা, আসছি। নিরঞ্জন, আজ খেয়ে যাবি এখানে। ব'লে তিনিও গেলেন বেরিয়ে।

নন্দরাণী ব'সে ব'সে পা ঠুকছিল মাটিতে। নিরঞ্জন বললে, ঝগড়া থাক্ কেমন আছিস বল নাদু।

নন্দরাণী বললে, তুমি কেমন আছ ?

বলা কঠিন। মনটা কেবল সুয়েজ ক্যানাল পার হয়ে চলেছে। যাক সে কথা, শুনলাম তোর নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে ?

অবাক কল্লে তুমি। বুড়ো ধাড়ি মেয়ে হলুম, বিয়ের কথা না হওয়াই অন্যায়।

নিরঞ্জন হেসে ফেললে,—থার্ড ইয়ারে উঠে তোর মুখ ফুটেছে। কথা চলেছে কার সঙ্গে ? হতভাগ্যটি কে ?

তোমার শোনবার অধিকার নেই।

ও বাবা, এত ? হায়রে, জাত আর কুল মিলল না ব'লে কি আমি এতই অযোগ্য।

জাত-কুল মিললেই বা তোমাকে বিয়ে করত কে শুনি ? হয়ে কেন মরিনি!—ব'লে নন্দরাণী ঝট্‌কা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

বটে।—নিরঞ্জন বললে, আর আমাদের আবাল্য প্রেমটা বুঝি কিছুই নয়? রূপ আর গুণ আমার কিসে কম বল্ ত?

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে নন্দরাণী হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বললে, রূপ নিয়ে পুরুষকে কিন্তু এমন অহঙ্কার করতে আর কোথাও শুনিনি। জাহাজ থেকে নামলে বিলেতের মেয়েরা না তোমাকে কিড্‌ন্যাপ ক'রে নিয়ে যায়!

নিরঞ্জন রাগ ক'রে বললে, তুই কি মনে করেচিস আমি প্রেম করতে পারিনে?

নন্দরাণী একবার বারান্দার দিকে তাকালো। তারপর বললে, বেহায়াপনা ক'রো না। তুমি সব পারো, হোলো? বি-এ পাশ করা ছেলের আবার প্রেম! ওরা কেবল পথে মেয়েদের 'ফলো' করতে জানে, ভালোবাসতে জানে না।

নিরঞ্জন যেন একটু দ'মে গেল। বললে, কলেজের ছাত্রের ওপর তোর এত রাগ কেন?

রাগ নয়।—ব'লে নন্দরাণী হাসলো, বললে, বেশ লাগে ওদের। অনভিজ্ঞ নির্বোধ দুটো চোখ,—ওতে অতিবুদ্ধির ফাঁক দিয়ে অনর্গল নির্বুদ্ধিতা বেরিয়ে পড়ে। সেদিন রমা বলছিল—

নিরঞ্জন বললে, তুই নিশ্চয় অজয় চোধুরীর কথা বলচিস।

কে তোমার অজয় চৌধুরী জানিনে। সেদিন রমা বলছিল, বন্ধুদের কাছ থেকে ওরা প্রেমপত্র লেখা শিখে আসে, ইংরেজি নভেলের ডায়লগ্ মুখস্থ ক'রে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে।

থাম্‌লি কেন, ব'লে যা। সকালবেলা উঠে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে গতরাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে; তোষামোদকে বলে প্রেম,—ব'লে যা!

নন্দরাণী বললে, সত্যি বলছি নিরঞ্জনদা। রমা বলছিল, ওরা ফুল দিয়ে বউকে খুশী করে, ঝগড়ার ভেতর দিয়ে নাটক খোঁজে, স্ত্রীর রূপের নিন্দে শুনলে আত্ম-হত্যার ভয় দেখায়। আমার ত খুব ভালো লাগে ওদের।

দুজনেই হাসতে লাগল।

নিরঞ্জন বললে, কোন মেয়ে আমার দিকে চাইলেই মনে হয় আমাকে সে ভালো-বাসতে পারে। আমি ত কো-এডুকেশনের দয়ায় বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বীরপুরুষ অনেক।

নন্দরাণী বললে, ও-বাড়ীর বেলার কথায় হেসে মরি। ওদের কলেজে কো-এডুকেশন আছে। হঠাৎ সেদিন ওর সিটে একখানা চিঠি পাওয়া গেল। যেমন ভুল বাংলা তেমনি ভুল উপমা। বেলা বলে, ছেলেদের আন্তরিকতার চেয়ে আতিশয্য বেশি। ওদের আগ্রহ খুব, কিন্তু জানে না জয় করতে। মেয়েদের ছলনা আছে জানি, কিন্তু ওদের অছিলা দেখলে হাসি পায়। তোমাদের একটু সংযত হওয়া দরকার, নিরঞ্জনদা।

অসংযম মেয়েদের প্রিয়।

থামো, প্যারাডক্স্ ক'রো না। কলেজের ছেলেরা প্রেমিক হবার চেষ্টা করতে গিয়ে

পুরুষ হ'তে ভুলে যায়। যাকে ভোলানো যায় না তাকে আকর্ষণ করতেই আনন্দ। পুরুষ হবে বৈরাগী ভোলানাথ, তবে ত।

ওরে বাবা, এ-মেয়ে বাঁচলে হয়।—ব'লে নিরঞ্জন মুখ বিকৃত ক'রে হাসলো।

এমন সময় নীচে থেকে দুজনের খাবার ডাক পড়ল। ওরা উঠে নেমে গেল।

নিরঞ্জন আর নন্দরাণী আসনে বসল। সুরবালাও তাদের সঙ্গে বসলেন। ঠাকুর পরিবেশন করতে লাগল।

সুরবালা এক সময়ে বললেন, নানুর বিয়েতে আমার এখন মত নেই, নিরঞ্জন। তবু যদি বিয়ে হয় তুই কি দেখে যাবিনে বাবা?

নিরঞ্জন বললে, বেশ কথা আপনার খুড়িমা। ও যেদিন শ্বশুরবাড়ী যাবে, আমি বুঝি তখন হা-হুতোশ করবার জন্যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকব? তার চেয়ে বিলেতে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠাবেন।

নন্দরাণী বললে, ডাক টিকিটের পয়সাটা রেখে যেয়ো।

মেয়ে কি বললে শোনো।

শোনবার মতন কথা নাদু বলে না। আচ্ছা খুড়ীমা, কলেজের ছাত্ররা নাদুর পছন্দসই নয়, কেন বলুন ত?

সুরবালা বললেন, ওমা, সে কি, ওরা যে বড় বাধ্য, বড় অনুগত। তোরা নাকি বাছা রোদ্দুরে পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকিস্ পরীক্ষার আলোচনা নিয়ে?

নিরঞ্জন মুখ তুলে তাকালো।

বলে আমার ও-বাড়ীর মেয়েরা। বলে যে ছাত্রীদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার আশায় তোদের এই দুর্ভোগ। ওরা হাসলে তোরা নাকি সপ্ত স্বর্গে যাস্ বাবা, এ সত্যি?

একদম্ মিথ্যে।—নিরঞ্জন ফেটে উঠল।

আহা তাই যেন হয়।

উত্তেজিত হয়ে নন্দরাণী বললে, ওরা লজ্জা পায় না দেখে আমাদের লজ্জা করে। এক সঙ্গে অতগুলো ছেলে, কার দিকে চাই বলো ত? কাকে ফেলি?

তিনজনেই প্রবল স্বরে হেসে উঠলেন।

নন্দরাণী বললে, বেলা বলে, একজনের দিকে চেয়ে চ'লে গেলে ওদের মধ্যে আবার ঝগড়া বাধে। প্রত্যেকেই বলে, তোর দিকে নয় আমার দিকে চেয়ে হেসে গেল। এই নিয়ে লাঠালাঠি।

চোখ পাকিয়ে নিরঞ্জন বললে, আর মেয়েদের মধ্যে বুঝি ঈর্ষা নেই?

আছে। সেটা মনোমালিন্য আনে, তাই ব'লে তোমাদের মতন লাঠালাঠি করে না—বুঝলে?

বুঝলুম।—ব'লে নিরঞ্জন আহার শেষ করলো।

যাবার আগে সে রমেশবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলো। সুরবালা বললেন, রাত অনেকটা বাবা, সাবধানে যাস্। কেষ্টনগর থেকে ফিরে আবার একদিন আসিস।

নন্দরাণী সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এলো। পিছন থেকে বললে, ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছ কেন নিরঞ্জনদা, বাইরের ঘরে একটু ব'সে যাও না?

নিরঞ্জন বললে, একটা অভ্যাস করেছি তাই পালাচ্ছি তাড়াতাড়ি।

ওমা, কি অভ্যাস গো?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আচ্ছা আর, একটু বসেই যাই।—ব'লে বাইরের ঘরে এসে দুজনে দুখানা চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে পড়ল।

বদ্ অভ্যাসটা কি শুনি? জুয়ার আড্ডায় যাতায়াত? তবে তুমি দূর হয়ে যাও, বসতে দেবো না।

পরম নিশ্চিন্ত মনে ব'সে নিরঞ্জন বললে, নাদু, তোর চোখে মুখে বিয়ের রং ধরেছে। কিন্তু তুই যে রকম খুঁৎখুঁতে, স্বামীকে নিয়ে কি ঘর করতে পারবি?

নন্দরাণী একটু হাসলো, তারপর কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে, তুমি ছেলেমানুষ, নিরঞ্জনদা।

নিরঞ্জন হেসে বললে, আই সি-এস্ ছাড়া তুই যখন বিয়েই করবিনে, তখন ভরসা ক'রে রইলুম। কপালে এখন হাকিম জুটলে হয়।

তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

একটু দরকার আছে, কারণ, কোন্ আঘাটায় গিয়ে পড়বি তাই একটু মায়া হচ্ছে।

কপালে আগুন তোমার মায়ার!—ব'লে নন্দরাণী মাথাটা ফিরিয়ে নিলে।

দুজনেই তারপর নীরব। এক সময় নন্দরাণী বললে, নিরঞ্জনদা, বিলেত থেকে ফিরলে তোমার এ আত্মীয়তা বোধ হয় থাকবে না, কেমন?

খুব সম্ভব।

মেম বিয়ে ক'রে আসবে নাকি?

প্রেমের পর জাতবিচার মানব না।

আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করবে?

সেটা ত এখনই করছে।

নন্দরাণী জলন্ত চোখে চেয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করতেই নিরঞ্জন তার হাতটা ধরে ফেললে। নন্দরাণী বললে, তোমার মুখ দেখতেও ঘেন্না করে, ছাড়ো।

নিরঞ্জন তাকে আবার টেনে বসালো। এবং তারপর যা কোনোদিন দেখা যায়নি, —পকেট থেকে সে সিগারেট আর দেশালাই বার করলো। বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে নন্দরাণী তীব্র কন্ঠে বললে, এই নোংরা অভ্যাস করেছ তুমি এর চেয়ে যে জুয়াখেলা ভালো ছিল, নিরঞ্জনদা।

সিগারেট ধরিয়ে এক টান্ টেনে নিরঞ্জন বললে, আমার অধঃপতনে তোর চোখে জল এলো, মনে হচ্ছে।

দাঁড়াও, আমি মাকে ব'লে দিচ্ছি। বি-এ পাশ ক'রে লায়েক হয়েছ, কেমন? বিলেত যাবার আগেই সিগারেট, সেখানে গিয়ে ত মদ ধরবে! তুমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

জোরে একটা টান্ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে নিরঞ্জন বললে, মদ আর সিগারেট ত

ভদ্রলোকেই খায়, রাস্তায় কুকুর কি খায় ওসব? সিগারেট খেতে খুব ভালো রে।

নন্দরাণী বললে, ভালো না ছাই।

সত্যি বলছি ভাই নাদু, মনটা খুব থট্‌ফুল হয়।

সত্যি?

তোর দিব্যি, একদিন খেয়ে দেখিস্‌।

নন্দরাণী হেসে একবার এদিক-ওদিক তাকালো। কেউ কোথাও নেই। দ্রুত সে নিরঞ্জনের মুখের কাছে মুখ আনল, বললে, দেখি ত খেয়ে। তুমি ধ'রে থাকো আমি টেনে নিই।

নিরঞ্জন সিগারেটটা তার দুই ঠোঁটের উপর টিপে ধরল। নন্দরাণী প্রাণপণে টান্‌ল।

তারপর হঠাৎ ভীষণ শব্দে নন্দরাণী কেসে উঠতেই নিরঞ্জন দ্রুত উঠে ঘর ছেড়ে একেবারে রাস্তায় নেমে পালালো।

নন্দরাণী কাসতে কাসতে হাসতে হাসতে গা ঢাকা দিয়ে ছুটল নিজের ঘরের দিকে।

এর পর গেছে তিন মাস।

নিরঞ্জন বিলেত পেঁচিছে। তার চিঠি এসেছে। উড়ো জাহাজে রমেশবাবু পুজোর সময় সপরিবারে কলকাতা ত্যাগ করে গিরিডিতে এসে রয়েছেন। বারগাণ্ডার ব্রাহ্মপাড়ায় সুন্দরী ব'লে নন্দরাণীর সম্বন্ধে কানাকানি চলছে। এবং ইতিমধ্যে নন্দরাণীর বিষয়ে আলোচনাটাও বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। একটি ছেলের সম্পর্কে রমেশবাবু পাকাপাকি করবার মনস্থ করেছেন। ছেলেটি আই সি-এস্‌ নয় বটে কিন্তু যোগ্য পাত্র হিসাবে যে-কোনো শিক্ষিত মেয়ের আদর্শ। রক্ষণশীল হিন্দুমতে বিয়ে হবে।

নন্দরাণী বাড়ীর বুড়ো চাকর দীনবন্ধুকে নিয়ে ইশ্রি নদীর পাড়ে পাড়ে বেড়িয়ে বেড়ায় আর ভাবে, এখনও তার মৃত্যু হয় না কেন। জীবনটা তার নষ্ট হোলো। দেখা যাচ্ছে বিয়ের জন্যই তার পাশ করা আর কলেজে পড়া। তার পক্ষে সবচেয়ে বড় পরিচয়-পত্র এই যে, সে সুন্দরী এবং পাশ করা বিবাহযোগ্য মেয়ে!

বাল্যকাল থেকে নিজের জীবনটা তার মুখস্থ। ফ্রক ছেড়ে সাড়ী, বেণী থেকে এলো খোঁপা—একটির পর একটি স্তর তার চোখে ভাসছে। ভুলে ঘাঘরা পরলে তার বাড়ন্ত গড়নের দিকে চেয়ে ঠাকুমা শাসন ক'রে দিতেন। সাড়ী আর সেমিজ যখন গায়ে উঠল, বন্ধ হয়ে গেল পাড়ার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মেশামেশি। স্কুলের গাড়ী এলে স্কুলে যাওয়া, আর সেই গাড়ীতেই ফিরে আসা।

স্বাধীন তাকে হতেই হবে,—আর আই সি এস্‌ ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অর্থ অন্যে কে বুঝবে? বেচারী অণিমা! বিয়ের পরে আর আই এ পরীক্ষা দেবার হুকুম পেলে না। শৈবলিনীকে ত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত বন্ধ করতে হয়েছে। তাই ব'লে রত্নাবলীর মতোও সে হ'তে চায় না। স্বামী স্বনামধন্য প্রফেসর,—তিনি কলেজ চ'লে গেলে রত্নাবলীর অবারিত ছুটি। বুইকখানা নিয়ে সে সমস্ত দিনটা কলকাতা শহর চ'ষে বেড়ায়। এমনও শোনা গেছে, কোনো ছেলেবন্ধু নিয়ে সে যায়

ইম্পিরীয়ল্ রেস্তোঁরায় ব'সে আড্ডা দিতে। এমন স্বাধীনতা নন্দরাণীর পছন্দ নয়।

চলো দীনবন্ধু, সন্ধ্যে হয়ে এলো।

এসো দিদি।—দীনবন্ধু আগে আগে চলে।

বাড়ীতে ঢুকলেই একটা চাপা হাওয়া,—কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। মায়ের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলে যেন একটা ব্যাথার ছায়া নেমে আসে। নিজের ঘরের দিকে নন্দরাণী চ'লে যায়।

সেদিন সকালবেলাকার আয়োজনটা দেখে নন্দরাণীর বুকের ভিতরটা টিপ্‌টিপ্ করতে লাগল। সুরবালা মেয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। রমেশবাবু একসময় জামাকাপড় প'রে বাইরে এলেন। এ-ঘরে ঢুকে দেখলেন, নন্দরাণী পাথরের মতো ব'সে রয়েছে। মেয়ের মনোভাব জানতে তাঁর আর বাকি ছিল না।

বললেন, নাদু, এখন তবে চললুম মধুপুরে। ফিরতে দেরি হবে না। কাল রাত্রে আসব। হ্যাঁ, ওই পাত্রের সঙ্গেই ব্যবস্থা করা গেল। ছেলেটি ভালো। আইন পরীক্ষায় এবার পাশ করতে পারেনি বটে তবে ওর বেশ আশা করা চলে। পয়সাকড়ি মন্দ নেই। কাল পাকা দেখে আসব।

নন্দরাণী মাথা হেঁট ক'রে রইল।

রমেশবাবু বলতে লাগলেন, ভট্‌চায্যি মশাই ষ্টেশনে অপেক্ষা করেছেন, অঘোর আচায্যি সঙ্গে যাবেন, ও-বাড়ীর সুধীরও যাবে।—তারপর পিছন ফিরে দরজার আড়ালে সুরবালাকে দেখে বললেন, জামাই তোমার ভালোই হবে গো।

সুরবালা মৃদুকণ্ঠে বললেন, ছেলেটির নাম কি?

নামটি শুনতে ভালো ঃ হরিদাস কানুনগো।—বলতে বলতে রমেশবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তপ্ত লৌহশলাকা কে যেন নন্দরাণীর কানে ঢুকিয়ে দিল; আকণ্ঠ ঘৃণায় তার গা-বমি-বমি করতে লাগল।

হরিদাস কানুনগো! আইন পরীক্ষায় ফেল-করা!—নন্দরাণী মনস্থির করল, আত্ম-হত্যা ক'রে সে এ-জীবনের জ্বালা জুড়োবে। কিন্তু তার আগে প্রবল আবেগে সে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। বালিশটা ভিজে যেতে লাগল দরদর অশ্রুধারায়।

তার পরদিন বিলেতে নিরঞ্জনের কাছে চিঠি লিখে এ-জীবনের মতো সে বিদায় নিল।

ব্যাথা ও বেদনায় উদাসীন,—অশ্রুমুখী নন্দরাণী দীনবন্ধুকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। উঁচু-নীচু মাঠের ধারে, সাঁওতাল পল্লীতে, শনি-মঙ্গলের হাটে, রেল-ষ্টেশন ইয়ার্ডে এবং এখানে-ওখানে নন্দরাণী ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়ায়। দীনবন্ধু দিদিমণির ভারি অনুগত।

স্থির হয়ে গেছে কাল তার পাকা দেখা।

কাল পাকা দেখা, আজকে মুক্তির শেষ নিশ্বাস নিয়ে নিতে হবে। সকালবেলা নন্দ-রাণী দীনবন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। সাঁওতালি বাজারে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা ক'রে সে ষ্টেশনের ধারে বেড়াতে গেল। এক সময় বললে, দীনুদা, আজ এত ভিড় কেন ভাই?

বুড়ো দীনবন্ধু বললে, শনিবার কিনা, এরা সব উশ্রির দিকে যাবে বেড়াতে।

ওমা, কি হ্যাংলা গো, উশ্রী আবার মানুষে যায়! পচা, পুরনো একটা ফল্,—ভিক্টোরিয়া ওয়াটারফলের কাছে উশ্রি?—নন্দরাণী তাচ্ছিল্যভরে তাদের দিকে তাকালো।

এমন সময় দীনবন্ধু একটা দলের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। একটি ফুট্-ফুটে সুন্দরী তরুণীর কাছে গিয়ে বললে, নীলাদিদি, চিনতে পারো?

সবাই তাকে চিনল। নীলা বুড়োর হাত ধ'রে বললে, খুব পারি দীনুদা। ওমা, তুমি এখানে? উনি কে?

উনি আমার মুনিবের মেয়ে।—ব'লে দীনবন্ধু নন্দরাণীর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলে। বুড়ো সব রকম কায়দাকানুন জানে। বললে, নাদুদিদি, এঁরা আমার পুরনো মনিব।

নীলা নন্দরাণীর হাত ধ'রে বললে, আসুন। ও বড়মামা, পালাচ্ছেন কেন, পরিচয় করুন আমার বন্ধুর সঙ্গে।

যিনি এগিয়ে এলেন দল ছেড়ে, তিনি যুবক। এমন রূপ নন্দরাণী আর জীবনে দেখেনি। পশ্চিমে রাঙা চেহারা। ডালিম আর আঙুরের দেশে যেন তার জন্ম। চুলগুলি পর্যন্ত ঈষৎ তাম্রবর্ণ। সবিনয় নমস্কার বিনিময় করতে গিয়ে রাঙা মুখে রক্ত ফুটে উঠল। নন্দরাণী বললে, এখানে কি বাড়ী আপনাদের?

আজ্ঞে না, আমরা যাবো উশ্রিতে।- যুবকটি বললে, এসো নীলা, ওঁরা রয়েছেন দাঁড়িয়ে। কথাগুলি যেন সুরের ঝঙ্কার। চোখ দুটি নির্লিপ্ত, কালো। বলিষ্ঠ কমনীয় দেহ, দীর্ঘ আকৃতি,—যেন গোলাপের দেশের রাজকুমার। নন্দরাণী ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে।

নীলা বললে, আসুন না, উশ্রীতে যাওয়া যাক একসঙ্গে মোটরে। উশ্রী আপনার ভালো লাগে না?

নন্দরাণী বললে, বেশ লাগে, চলুন। উনি আপনার মা বুঝি?

নীলা বললে, হ্যাঁ।

আর ও-দুটি মেয়ে?

ওদের নাম সুধীরা, আর ললিতা। আমাদের পাশের বাড়ীতে এসে উঠেছে। ওরা বড়মামার খুব ভক্ত। বলেই নীলা উজ্জ্বল হাসিতে পথ মুখর ক'রে তুললে।

নন্দরাণী মুখ তুলে বললে, আপনার বড়মামা ওঁদের ভক্ত নন্?

মোটেই না। বড়মামার চোখ আকাশে। দয়ামায়ার গন্ধও নেই ওঁর শরীরে। দেখি বিয়ের পরে বড়মামা কেমন করেন।

বিয়ে হবে বুঝি শিগগির।

হ্যাঁ।—নীলা বললে, বাস্তবিক, এত ভালো লাগছে আপনাকে। একদিন যাবো আমি আপনাদের বাড়ীতে, কেমন?

বেশ ত। ব'লে নন্দরাণী একবার বক্রদৃষ্টিতে দূরে চেয়ে দেখলে, চলতে চলতে

সুধীরা আর ললিতা সাগ্রহে বড়মামার সঙ্গে গল্প করবার চেষ্টা করছে।

মোটরে উশ্রীর জঙ্গলের কাছে পৌঁছতে আধঘণ্টা লাগল। নীলা, নন্দরাণী আর দীনবন্ধু একখানা মোটরে। আর একখানায় সুধীরা, ললিতা, বড়মামা, আর নীলার মা। সবাই নেমে পদব্রজে পাহাড়ের ধারে শালের জঙ্গল আর সাঁওতালি পল্লী পার হয়ে যখন জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌঁছল, বেলা তখন এগারোটা বাজে।

নীলার বড়মামা কাছে এগিয়ে এসে সবিনয়ে বললে, আপনার আর দীনবন্ধুর এখানে নেমন্তন্ন। তিনটে কি চারটের মধ্যে আপনার ফিরে গেলে চলবে না?

ঘাড় নেড়ে নন্দরাণী জানালো, চলবে। নীলার মা এসে আদর ক'রে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, কষ্ট হবে না ত? আমাদের ভাগ্যি ভালো, মনের মতন অতিথি পাওয়া গেল। এমন মিষ্টি স্বভাব আমি দেখিনি।

নীলা বললে, সত্যি মা, নাদুদিদি কি চমৎকার!

পিক্‌নিক্ শেষ হ'তে বেলা তিনটে বাজল। ললিতা আর সুধীরার হুড়োহুড়ির বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ওদের বেহায়াপনাটা নীলার মাও পছন্দ করলেন না। এক সময় মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, মণ্টুকে ওরা ভারি বিরক্ত করে।

নন্দরাণী তাদের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল। এখানে কোনো মন্তব্যই মানায় না। কানের মধ্যে তার কেবলই ঝঙ্কৃত হতে লাগল, মণ্টু, মণ্টু! - এবং এ-কথাটাও সে মনে মনে অনুভব করলে, লক্ষ সুধীরা আর ললিতা ওর পদপ্রান্তে গড়াগড়ি দিলেও ওর মন টলানো যাবে না। সত্যকারের চরিত্রবানকে বুঝতে অল্প সময়ই লাগে।

সবাই ফিরে এলো। বেলা সাড়ে চারটের ট্রেন। গাড়ী এসে দাঁড়াতেই নীলার মা বললেন, চলো না মা, আমাদের সঙ্গে মধুপুরে। তোমাকে ছাড়তে কিছুতেই মন সরছে না।

নন্দরাণীর মাথায় ভূত চাপলো। এ জীবনে তার আনন্দ কোথায়? বাবা যিনি, তিনি তার সমস্ত জীবনকে অপমান করতে বসেছেন, স্বেচ্ছাচারের রথ চালিয়ে চলেছেন তারই বুকের উপর দিয়ে, তার জীবন ত নিরর্থক হোলো। আজ একদিনের জন্য অবাধ্য হওয়া যাক্, জানানো যাক্ যে তারো আছে স্বাধীন সত্তা, আত্মস্বাতন্ত্র্য। মুখ ফিরিয়ে সে বললে, দীনুদা, কি বলো?

তুমি যা বলো, দিদিমণি।

নন্দরাণী নীলার মায়ের দিকে ফিরে বললে, খুব ভালো রকম অতিথি সৎকার করবেন ত?

আপনার লোককে কি অতিথি বলে পাগলি?— ব'লে ভদ্রমহিলা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

চলুন তবে যাই আপনাদের সঙ্গে।—ব'লে নন্দরাণী টিকিট ক'রে দীনুবন্ধুকে নিয়ে গাড়ীতে উঠল।

সুধীরা আর ললিতা মুখ-চাওয়াচায়ি ক'রে বললে, গিরিডির Greedy!

পরদিন মধুপুরের বাড়ীতে যখন পূর্ণোদ্যমে অতিথিসৎকার চলছে, সেই সময় বেলা

এগারোটা নাগাৎ নীচের তলায় গোলমাল শোনা গেল। মণ্টুবাবুর হাত ধ'রে যাঁরা উপরে উঠে এলেন, নন্দরাণী স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলে বাবা আর মা। তাঁদের পাশে নীলা ও তার মা, মণ্টুর মা ও বাবা ; বাড়ীর পণ্ডিত, তাদের ভট্টাচার্য্য মশাই, এবং অন্যান্য সকলে। পাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ দীনবন্ধু স্তম্ভিত।

রমেশবাবু হেসে বললেন, নাদু, তোমার মাত্রাজ্ঞান একটু কমে গেছে। সংরক্ষণশীল বংশে তোমার জন্ম, বিয়ের আগে আমাদের বাড়ীর কোনো মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে আসেনি। তুমি এলে।

সুরবালা হাসতে হাসতে বললেন, আমার কিন্তু কোন দোষ নেই নাদু, এ-বিয়েতে আমার একটুও মত ছিল না।

নন্দরাণী সকলের দিকে একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিলে, তার কোনো চেতনা ছিল না। মণ্টু ছিল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। তার দিকে একবার চেয়ে নন্দরাণী মাথা হেঁট ক'রে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

নীলা ছুটে এলো পিছনে পিছনে। নন্দরাণীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, উপন্যাসকেও হার মানালো। আপনি আর দিদি নন্, আপনি আমাদের বড় মামীমা। আশীর্বাদ করুন।

নন্দরাণী তার চিবুক নেড়ে দিয়ে বললে, আশীর্বাদ করি একদিন যেন মনের মতন স্বামী পেয়ো।— বলতে বলতে তার নিজেরই মুখখানি আনন্দে আর অশ্রুতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শাঁখ বাজালেন নীলার মা।

অসংলগ্ন

শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ। রাত্রির ঘন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অবিশ্রান্ত জলধারার জাল ভেদ ক'রে দূরে নিকটে আর কিছুই দেখা যায় না। ঝড়ের তীব্র দুরন্ত বাতাস মাঝে মাঝে ঘরের জানালা দরজা কাঁপিয়ে উম্মত্ত অন্ধকার ছুটে চলেছে দুর্যোগের আবর্তের মধ্যে। সম্মুখে মাঠের দূর সীমানায় রাজপথের কোনো দিকে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই, যান-বাহনের চলাচলের শব্দ সন্ধ্যার পরে আর শোনা যায়নি। কেবল নিকটের জটা-জটিল এক অশ্বত্থ গাছের ডালে কোনো কোনো অলক্ষ্য পাখীর পক্ষসঞ্চালনের শব্দ এক একবার শোনা যাচ্ছিল।

অন্ধকারের পর অন্ধকারের প্রাচীর অমারাত্রির নির্জন শ্মশানে প্রেতাত্মার মতো নিঃশব্দ প্রহরায় দণ্ডায়মান। এই বিরাটরূপ অন্ধ দানবের দল আপন মুঠির মধ্যে যেন আলো-কোজ্জ্বল দিনগুলিকে নিপীড়ন ক'রে মেরেছে। ভায়ার্ত বিভীষিকা বুকের মধ্যে অনড় পাষাণ-শিলার মতো দাঁড়িয়ে রক্ত-চলাচলের পথ রুদ্ধ করেছে।

ঘরের ভিতরে টিপ্ টিপ ক'রে আলো জ্বলছে। আলোটা উজ্জ্বল লাল, অচপল শিখাটা যেন তার শাসনের ইঙ্গিত। তার পিছনে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে পুরনো একটা তারিখ সম্ভবত অতীত দিনের কিছু ইতিহাস নিয়ে জেগে। টেব্‌লে কতকগুলি বই, মাসিকপত্র, খান দুই য়্যালবাম্‌—সেগুলির মধ্যে প্যারীর নাট্যশালার অভিনেত্রীগণের নানা অবস্থার চিত্র,—কয়েকখানা চিঠি, -ইত্যাদি—। ঘরের ভিতরটা বিশৃঙ্খল, ঐশ্বর্যের নানা চিহ্ন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। অবিন্যস্ত আসবাবপত্রের মাঝখানে মানুষের পক্ষে থাকা এ-ঘরে অসাধ্য!

সোমেশ্বরের হাতের আঙুলে জ্বলন্ত সিগারেটটা ধীরে ধীরে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। বাঁ-হাতের কাছে একটি ছোট কাঁচের টেব্‌লের উপর একটি কাঁচের গ্লাসে পানীয়, পাশে একটা সোডার বোতল। সে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে পুরনো তারিখটার দিকে। সোমেশ্বরের বলিষ্ঠ চেহারা, বয়স ত্রিশ উত্তীর্ণ হয়েছে, চোখ দুটি দীর্ঘায়তন, ভাবস্তিমিত।

গ্লাসটা তুলে নিতে গিয়ে হঠাৎ সে চমকে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। খোলা জানলার বাইরে যতদূর চোখ যায়, শোনা গেল কোনো অপরিচিত পাখী অথবা কোনো জানোয়ারের যন্ত্রণাজর্জর করুণ আর্তনাদ। সেইদিকে একবার তাকিয়ে সোমেশ্বর গ্লাসের পানীয় এক নিশ্বাসে পান ক'রে নিলে। বাইরের বর্ষার বাতাস জানলার ভিতর দিয়ে এসে তার মুখে চোখে ঝাপটা দিয়ে গেল। গ্লাসটা সে রাখল।

চিঠিগুলির কোনো কোনো হাতের লেখা তার পরিচিত। একখানা চিঠি সে

খুললে। সেই সুপরিচিত স্ত্রীলোকের হাতের দাগ বানান ভুল করা পাণ্ডুলিপি। দুই ছত্র প'ড়ে তার মুখে হাসি ফুটল। অপমানের ভাষা,—সে কাপুরুষ, মনুষ্যত্ব হীন, ভদ্রবেশী সর্বনিকৃষ্ট লম্পট,—স্ত্রীলোককে খেয়ালের খেলার মতো সাদরে কাছে টেনে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করা তার পেশা ; হৃদয় তার নেই, সে দস্যু।

দস্যু সে, তাতে আর সন্দেহ নেই। সোমেশ্বর সিগারেটে একটা টান দিলে—ধোঁয়ার সঙ্গে এই অপমানের তাড়না বুকের মধ্যে ঢুকে যেন তার গলা টিপে ধরলে। দস্যুর মতো সে লুণ্ঠন করেছে স্ত্রীলোকের লজ্জা স্ত্রীলোকের জীবন। মানুষের বসতির আনাচে তার দুরন্তপনার যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, সে কেবল এই অমানিশীথিনীর মতো কলঙ্কে কালো, তার অর্থ নেই, তার অবধি নেই।

দরিদ্রের ঘরে জন্ম সোমেশ্বরের। পর্বতের কালো গুহার ভিতর থেকে নামল একটি নদী নির্ঝর, ছুটল জনপদের ভিতর দিয়ে। জীবনটা কেবল চৌর্যবৃত্তির ইতিবৃত্ত, অসঙ্গত অসংযমের ধারাবাহিকতা। একরাশি রুক্ষ চুল সে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলে। জীবনকে নিয়ে সে জুয়া খেলেছে, গণিকাবৃত্তি করেছে। কোথাও প্রবঞ্চনা, কোথাও আত্মবঞ্চনা।

পায়ের শব্দে সে চমকে উঠল। এক ছায়ামূর্তি যেন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে. বুকের ভিতরটা তার ধবক্ ধবক্ করতে লাগলো। সেও কেবল একটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরই বললে, রহমন ? কুচ্ বোল্‌তা ?

বলিষ্ঠ কালো একটা লোক পাশে এসে দাঁড়ালো। বললে, আপকো অন্দরমে বোলাতে হেঁ সাহেব।

যাতা হুঁ, পইলে গিলাস ভর্‌না।

গ্লাসটা নিয়ে লোকটা চলে গেল এবং মিনিট দুই পরে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ পূর্ণ ক'রে সেটা এনে রাখল। বললে, আজ জেরা জায়দা পিয়া গেয়ি সাহেব।

খেয়াল হ্যায়, মৎ ডর্‌না।

রহমন চিন্তিত মুখে চ'লে। সোমেশ্বর গ্লাসে খানিকটা চুমুক দিলে।

আরো খান দুই চিঠি সে খুললে। প্রথমখানা এক বন্ধুর। বন্ধু অভিনন্দিত ক'রে জানিয়েছেন, পথে পথে কি প্রেমের মাল্যদান আজো জুটছে! মুখখানা বিকৃত ক'রে সোমেশ্বর চিঠি বন্ধ করলে। অন্য চিঠিখানি একটি তরুণীর। শেষের দিনটি বড় ভালো লেগেছিল। জ্যোৎস্নায় ভ'রে গিয়েছিল মাঠ, বাতাস ছিল কেয়াগন্ধে ভরোভরো, আপনার হাত ধ'রে চলেছিলাম নদীর দিকে। কী সুন্দর রাত্রি। রাত্রির সঙ্গে আপনার চোখের কি সুন্দর সাদৃশ্য! সেই রাত্রিটি বারে বারে ফিরে আমার গভীর স্বপ্নলোকে। সমস্ত দিন ভ'রে দেখি দিবাস্বপ্ন, রাত্রে ফিরে যাই ধ্যানলোকে। আপনি আমার জীবনদেবতা!

একঘেয়ে চিরপুরাতন চর্বিতচর্বণ। বারে বারে চিত্ত-চাঞ্চল্যের সেই একই পুনরাবৃত্তি, তার অভিনবত্ব নেই। গত ত্রিশটি বছর কেবল এই প্রলোভন, কেবল এই সর্বনাশ। আনন্দের সর্বনাশ। আনন্দের ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে খেয়ে সে ঘুরেছে। কুকুরের

মতো অস্থি চিবিয়ে আপন রক্ত পান ক'রে সে স্বাদ উপভোগ করেছে। কেমন একটি অদ্ভুত জগতের ভিতর দিয়ে তার আনাগোনা, সেখানে শ্রী নেই, হৃদয়ের ঐশ্বর্য নেই; নিরন্তর স্থূলভোগের বস্তুপুঞ্জ, লোভ আর লালসার অবিরাম চক্রান্ত। যেখানে কেবল ক্ষণিকবাদ, অশান্ত দ্রুত সম্ভোগের আসক্তি, চিত্তের মালিন্য যেখানে দুষ্কৃতির পথ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, প্রবৃত্তির দাসত্ব ক'রে পৌরুষ যেখানে মৃত্যুমুখী,—এই ত্রিশ বছরের, জীবন সেই ইতিহাসটাই ত সুস্পষ্ট। সোমেশ্বরের গ্লাসে আর একবার চুমুক দিলে।

রহমন আবার এসে দাঁড়াল।—জি সাহেব।

সোমেশ্বর মুখ ফেরালে। রহমন বললে,—মাইজি তোতাহুঁ।

রোতা হুঁ? কই বিমার ত নেই হুয়ে হেঁ?

মালুম নেহি, আপকে লিয়ে ত···একেলে কম্‌রামে উনকো ডর লাগ্‌তা হোগা।

চলো, ম্যায় চল্‌তা হুঁ। সোমেশ্বর মুখ ফিরিয়ে আবার একখানা চিঠি খুলে পড়তে লাগল।

বিদেশে তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে; শুধু ভয়ে নয়, আত্মরক্ষার জন্যও। যাদের সে বেঁধেছিল তারাই আজ বেঁধেছে তাকে। বেঁধেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। কেউ বেঁধেছে যৌবন দিয়ে, কেউ অগ্নিময় দেহলালসায়, কেউ-বা সাজসজ্জায়, কেউ-বা বাচনভঙ্গীতে। লালাসায় তার মন টলে, ভালোবাসায় তার মন গলে না। গভীর আত্মসংস্কারের প্রয়োজন, প্রতিমা-প্রতিষ্ঠার জন্য সুমার্জিত মন্দির – এ তার নেই।

এই চিঠি কি করুণ। তোমার দেওয়া শাস্তি নিলাম মাথা পেতে। তুমি প্রবঞ্চনা করেছো, কলঙ্কে মলিন ক'রে দিয়েছো জীবন,—তবু তোমাকে ক্ষুদ্র ব'লে যেন কল্পনা না করি। আত্মীয়-পরিজনের কাছে আমার আশ্রয় সেই, ভবিষ্যতের অন্নবস্ত্রের সংস্থান রইল না, অপমানে মাথা লুটোলো পথের ধুলোয় কিন্তু তার জন্য তোমাকে যেন অভিশাপ না দিই। স্বামী আমাকে আর গ্রহণ করবেন না, সন্তানের প্রতি আর অধিকার নেই, তবু তোমার কাছে চাইতে পারব না আশ্রয়। তুমি উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসন্তান, একদা তোমার চরিত্রের মাধুর্য আমাকে অভিভূত করেছিল, আজ বিপন্ন হয়ে আপন স্বার্থের জন্য তোমার শরণ নেবো না। মৃত্যুর দিকে আজ চললাম, এই তোমার কাছে আমার শেষ পত্র। তুমি নিঃসংকোচে ফিরে এসো! কেবলমাত্র এতটুকু দুঃখ রয়ে গেল—তোমার পায়ে মাথা রেখে আমার মৃত্যু হোলো না।—যন্ত্রণায় মাথা ঠুকে মরেছে!

মৃত্যু আর ধ্বংস তার ভিতরে বেঁধেছে বাসা। তার বুকে, তার মনে তার চরিত্রে, তার অতীত আর ভবিষ্যৎ জীবনে কেবল মৃত্যুর পর মৃত্যু। যেদিকে ছিল প্রশান্ত আর প্রসন্ন জীবন, যেদিকে বৃহৎ মানব-কল্যাণের পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়, যেদিকে পরার্থপরতা, ত্যাগ ও বৈরাগ্য, প্রেম ও শ্রদ্ধা—সেদিক থেকে অনেক দূরে তার আপন পাপ-প্রকৃতির পরিমণ্ডল। বুকের ভিতর থেকে একটা ভয়ানক আর্তনাদ সোমেশ্বরের গলার ভিতর দিয়ে উঠে এলো।

উঠে সে দাঁড়ালো। পা টলছে। বাইরে প্রবল বর্ষার দাপাদাপি অবিশ্রান্ত চলছিল।

সোমেশ্বর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে এলো, দালান পার হ'য়ে আর একটা ঘরে ঢুকলো। তার চোখের তারা দুটো কাঁপছে, স্পষ্ট ক'রে কোথাও তার স্থির দৃষ্টি পড়েছে না।

ঘরে মৃদু দীপশিখা জ্বলছে, পরিমার্জিত সুবিন্যস্ত সামান্য গৃহসজ্জা, তাদেরই মাঝখানে একখানা তক্তার উপর বিছানায় যে মেয়েটি এতক্ষণ বসেছিল সে এবার উঠে দাঁড়ালো। সম্ভবত এতক্ষণ সে কাঁদছিল, এবার অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে বললে, আমাকে এমন ক'রে তাড়িয়ে দেবেন না।

সোমেশ্বর সস্নেহে বললে, তাড়িয়ে? তা ত বলিনি, চ'লে যেতে বলেছিলুম।

কোথায় চ'লে যাবো? আমি যে এসেছি সব ছেড়ে। কতদিন ধ'রে আপনি আশ্বাস দিয়েছিলেন –

সোমেশ্বরের পা টলছে। বললে, আশ্বাস দিয়েছিলুম?—আমি? শৈলমণি, তুমি ভুলে গেছ, ঠিক মনে ক'রে দ্যাখো ত? আশ্বাস ত আমি দিইনি।

মেয়েটি মাথা হেট ক'রে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বয়স পঁচিশ হবে। রূপ এবং যৌবন সর্বাঙ্গ ভ'রে তার উপছে পড়ছে। রুক্ষ আলুলায়িত চুলের রাশ দুই পাশে জড়ানো। সে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল সোমেশ্বরের বাহুর নাগালের মধ্যে। ক্লান্ত হাসি হেসে সোমেশ্বর বললে, ভুল করেছ বুঝেছ শৈলমণি, ভালো ব্যবহার করেছি, ভালোবাসতে চাইনি। আশ্বাস দিয়েছি? কিসের? পাগল তুমি, বরং সান্ত্বনা দিয়েছিলুম, আশ্বাস দিইনি। সব ছেড়ে এলে কেন আমার জন্যে—যার কোনো সম্বল নেই? পাগল তুমি— ব'লে সে অতি পরিশ্রমে বিছানার ওপর ব'সে পড়ল।

মাথার উপরে করোগেটের চালায় ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে, আলোর মৃদু শিখাটা কাঁপছে বাতাসে, ঝড়ের গর্জন বাইরে আহত জন্তুর মতো দিকে দিকে প্রবল দাপাদাপি সুরু করেছে।

শৈলমণি মেঝের উপর বসে পড়ল। বললে, আমার যাবার কোথাও জায়গা নেই, আপনি আশ্রয় দিন।

বিছানা থেকে সোমেশ্বর উঠে দাঁড়াল। বিনীত ভদ্র কণ্ঠে বললে, আশ্রয় দেবো, আমাকে দেবে কে আশ্রয়? অন্যায় করেছে শৈলমণি সব ছেড়ে এসে। মেয়েরা ত ভাবে-ভোলার জাত নয়, তারা প্রকৃতিগত বাস্তববাদী। হ্যাঁ, অপরাধ আমার হয়েছে আমার ব্যবহারে যদি তুমি আশ্বাস পেয়ে থাকো।

সোমেশ্বর থামল। শয়তান কি জাগল তার মুখে? এটা কি তার ছদ্মবেশ! তার কণ্ঠের ভিতর থেকে স্নেহের সুর প্রকাশ পাচ্ছে, তবে কি তার কিছু হৃদয় অবশিষ্ট আছে? সমস্ত জীবন ভ'রে সে কোথাও সত্যাশ্রয়ী নয়, নিজের কাছেই করেছে সে নানা অভিনয়। তার চরিত্রটা অদ্ভুত ধাতুর এক বিচিত্র সংমিশ্রণ, ক্ষণে ক্ষণে তার হৃদয়ের দিগ-দিগন্তে নানাবর্ণের খেলা চলে, কোনোটা স্থায়ী নয়, কোনোটা সত্য নয়।

সে বললে, কাল সকালে তোমাকে চ'লে যেতে হবে, শৈলমণি।

কোথায় যাবো আমি, বলুন?

সোমেশ্বর হাসলো। ডাকলো, রহমন?

হুজুর। ব'লে রহমন ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। সোমেশ্বর বললে, গিলাস ভর্ লিয়াও।

আওর ভি দেঙ্গে?—রহমন একটু ইতস্তত করলো।

যাও।

রহমন চ'লে গেল, এবং একটু পরে আনল ভর্তি করা গ্লাস। সোমেশ্বর এক চুমুকে শেষ করলো। তারপর বললে, বিদেশে এমনি করে প'ড়ে আছি, এই লোকটা আছে সঙ্গে, রান্না করে? এখানে ত তোমার থাকা হয় না। তুমি কাল সকালেই চলে যেয়ো শৈলমণি।

শৈলমণি কেঁদে বললে, আমি আপনার সব কাজ ক'রে দেবো, আপনার বাসন মেজে দেবো, একটু জায়গা আমাকে দিন। আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, সম্মান আছে, নিরুপায় হলে আমার বিপদ আছে।

সোমেশ্বর বললে, কেন? চলে যেতে বলছি অথচ পা আঁকড়ে ধরছ কেন? তোমাকে দাবী? তোমাকে আজো আমি ছুঁইনি শৈলমণি, তোমার সম্বন্ধে কেন করব বিবেচনা?

এই সংযমের অভিনয়টা কি তার সত্য? সুন্দরী নারীর আত্মদানকে প্রত্যাখ্যান করা—এর মধ্যে সে কি সম্ভোগেরই আনন্দ পাচ্ছে? এটা কি তার পৌরুষ? চরিত্রের বলশালীতা? সমস্ত প্রাণ দিয়ে নারীকে সে আকর্ষণ করেছে, প্রবল নিষ্ঠুরতা প্রকাশ ক'রে সে দূরে ঠেলে দিয়েছে। প্রথম যৌবন থেকে তার এই সাংঘাতিক খেলা, মানেনি নীতি, মানেনি শাসন। আজকের মতো এমন ঘটনা কি কোন যুবকের ভাগ্যে ঘটে? কোনো মেয়ে কি এমন ভাবে আত্মদান ক'রে বসে, কোনো পুরুষ কি করে এমন চরিত্রবানের অভিনয়?

শৈলমণি?—ব'লে সোমেশ্বর খাটের উপর বসল।

চোখ মুছে শৈলমণি তার দিকে মুখ তুললো। মুখখানা ফুলেছে চোখের মধ্যে একাগ্র শ্রদ্ধা আর ভয় জড়ানো।

তোমাকে এমন ক'রে ফিরিয়ে দিচ্ছি কেন জানো? আমি ফুরিয়ে গেছি! সংযম নয়, ক্লান্তি। তোমাকে জায়গা দেবার আমার উপায় নেই আমি একেবারে দেউলে। তুমি এখানে থাকবে, আর তোমার চেহারাটা নিয়ত টানবে আমাকে। হ্যাঁ, আমি নাটকের অভিনয় ক'রে যাচ্ছি জানি, তবু এইটেই অনেকটা আমার পক্ষে সত্য কথা। চেয়ে দেখো কী অন্ধকার, কী দুর্যোগ বাইরে। তোমাকে যদি অপমান করি, বাধা দেবার কেউ নেই। দেখবে না কেউ, আকাশে নেই একটিও তারা। তুমি কোনদিন আমাকে বিপদে ফেলতে পারবে না, কারণ আমার কৈফিয়ৎটা ন্যায়সঙ্গত। তবু, কি জানো, আবার ঘুরিয়ে উঠবে সেই পাশবিকতা, সেই কুৎসিত সম্ভোগের দুরন্তপনা—যা আমাকে মলিন করবে, তোমাকে করবে ম্লান। চাইতে পারবো না তোমার দিকে, জেগে উঠবে চৌর্যবৃত্তি, লজ্জা লুকিয়ে বেড়াতে হবে মানুষের সমাজের কাছে, অভিনয় করতে হবে সাধুতার,—

ভয়, সঙ্কোচ, লজ্জা, মালিন্য,—দম আটকে আসবে দিনের পর দিন। এই কি তুমি আমাকে করতে বলো?

শৈলমণি ধীরে ধীরে বললে, আপনার পায়ের কাছে আমাকে জায়গা দিন।

পায়ের কাছে জায়গা দেবো, লোকের কাছে বলব কি?

কিছুই কি বলতে পারবেন না? আজ তিন বছর থেকে আপনার আশায় আশায় আছি। অবাধ্য হয়েছি সকলের, অসম্মান করেছি মা বাবা ভাই বোনদের, তারপর চ'লে এসেছি চুপি চুপি, সে ত আপনারই জন্যে। সবাই বুঝবে এবার বিয়ে হবে আপনার সঙ্গে। আপনি পায়ে ঠেলবেন না আমাকে।

বিয়ে? কি বলছ শৈলমণি? বিয়ে? দায়িত্ব?—সোমেশ্বর টলতে টলতে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত, কিন্তু সেই ভয়ানক দাপাদাপি গেছে ক'মে। দেয়াল, পাঁচিল, ছাদ, বারান্দা অবিরল জলধারায় একাকার হয়ে চলেছে। আজকের রাতটা তার কাছে ভয়ানক। স্ত্রীলোকের দায়িত্ব নিতে হবে, এ কল্পনা সে কোনোদিন করেনি। দেহ, রূপ, যৌবন – এছাড়াও যে স্ত্রীলোকের আরো কিছু আছে—তাদের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, অন্ন-বস্ত্র, তাদের সম্মান আর দায়িত্ব, আজ ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন কথা সে কোনোদিন ভাবেনি। কল্পনা তার ছুটে চলতে লাগল। বিবাহ, সন্তান, সংসার, জীবনযাত্রা—এ তার পক্ষে নূতন। এর মধ্যে আছে নীতি, মনুষ্যত্ব; এর মধ্যে রয়েছে বৃহত্তের প্রতি কল্যাণবোধ,—শ্রী, শালীনতা, সভ্যতার ঐশ্বর্য, এরা এতদিন তার কল্পনায় ছিল কোথায়?

বৃষ্টিতে ভিজে গেল সর্বশরীর। সোমেশ্বর স্খলিত পদে এসে আবার টেবলের কাছে বসল।

বর্ত্তমান কালের হাওয়ায় মানব-সমাজের প্রতিষ্ঠিত ন্যায় ও নীতির ভিতরে যে ভাঙন ধরেছে, যে হিংস্রতা ও পাশবিকতার ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগের যৌবন পৈশাচিক উল্লাসে আর স্বার্থ তাড়নায় দস্যুপনার দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষের যে কুৎসিত যৌন প্রকৃতি পৃথিবীর সমগ্র লোকালয়ের অন্তরে অন্তরে দুষ্ট ক্ষতের মতো প্রবেশ ক'রে সমাজ দেহকে বিষাক্ত করেছে—এদেরই ভিতর থেকে তার জন্ম, এদের মধ্যেই সে মানুষ। সোমেশ্বরের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, আর আর ফেরার পথ নেই। নিরুপায়, দুর্বল, নিয়তির ক্রীড়নক। সম্মুখে পথের চিহ্ন তার নেই; তার লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই, তার অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, সে জন্মান্ধ; তার রক্তের ভিতরে পাপ, দুর্নীতি, অধর্ম, অসচ্চরিত্রতা। আর তার ভালো হবার উপায় নেই,—সবাই মিলে তাকে টেনে নামিয়ে দিয়েছে শোচনীয় অধঃপতনে।

না, দায়িত্ব সে নেবে না, ভালো সে বাসবে না, বিবাহ সে করবে না। সে খরচ হয়ে গেছে; যে শক্তির উৎস নিয়ে পুরুষের জন্ম, যে শক্তি কাজে চিন্তায় স্বপ্নে, প্রসন্ন জীবন-যাত্রায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, সেই আদি শক্তি তার লুপ্ত হয়ে গেছে। সে পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। তার স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে আর উৎসাহ নেই, রঙ নেই। স্ত্রীলোক তার কাছে রক্তমাংসের স্তূপ, প্রেম তার কাছে যৌন-আবেদনের ভিন্ন রূপ; বিবাহটা শৃঙ্খল; নীতি ও ধর্ম

দুর্বলের আশ্রয়। গভীর নাস্তিক্যবাদের আবহাওয়ায় নিশ্বাসে সে দাঁড়িয়ে উঠছে। সে জীবনের অনুকৃতি,—প্রেতাত্মা!

পায়ের শব্দে সে ফিরে তাকালো। অস্পষ্ট আলোয় শৈলমণির ছায়াটাকে দেখে সে চিৎকার ক'রে উঠলো—আবার কেন এসেছ তুমি? কেন এসেছ? যাও, চলে যাও, পাপের ত্রিসীমানায় এসো না, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে শৈলমণি। বলতে বলতে সোমেশ্বর ছুটে দরজার কাছে এলো। অশ্রুসিক্ত নিরুপায় শৈলমণির মুখের দিকে চেয়ে উন্মাদের মতো সে পুনরায় আর্তনাদ ক'রে উঠল,—কেন আসোনি যখন ছিল বাইশ বছরের যৌবন—অকলঙ্ক নিষ্পাপ! যাও, চ'লে যাও, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি, ম'রে গেছি। আমাকে বাঁচতে দাও, স্ত্রীলোক থেকে দূরে থাকতে দাও। কাল সকালে তোমাকে তাড়িয়ে দেবো শৈলমণি·· এখন পালাও, ভূতের ঘরে ঢুকো না. প্রাণ নিয়ে চ'লে যাও।

শৈলমণিকে ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিতে গিয়ে সোমেশ্বর হোঁচট খেয়ে সেইখানেই মুখ থুবড়ে পড়ল।

যখন জ্ঞান হোলো, তখন সকাল হয়েছে। সোমেশ্বর চোখ খুলে তাকালো। রহমন রয়েছে মাথার কাছে ব'সে। ওঃ, কী একটা যেন দুঃস্বপ্ন! একা বিদেশে থাকা আর চলছে না। অসুখটা তার এখনো সারেনি। কলকাতা থেকে শৈলমণির একখানা চিঠি পেয়ে গতরাত্রে কী যেন তার হয়েছিল! স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম!

রহমন, ক্যা হুয়া থা? বেমার?

নেহি সাহেব, লেকিন, বহুৎ সরাব পিনা·· বদন্ কম্‌জোর হোগ্যা···শিরমে চক্কার আ গৈ—

সকালের স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে। সোমেশ্বরের শ্রান্ত দুই চক্ষু সেই দিকে ফিরে রইল।

ভাই

সংসার জবুলজবুলাট্। ছেলেমেয়ে, স্বামী, শ্বাশুড়ী, ননদ, দেবর, ভাজ, বড় বউয়ের নিশ্বাস নেবার সময় নেই। অত বড় বাড়ী, দাস-দাসী, অতিথি-অভ্যাগত— এদের সকলের বিলিব্যবস্থার পর রাত বারোটার আগে স্বামীর সঙ্গে আর বড় বউয়ের দেখা হয় না। অল্প বয়সে বিবাহ হবার পর বড় বউ সেই যে এ সংসারে এসে ঢুকেছেন, সেই থেকে প্রকাণ্ড পরিবারের সুখ-দুঃখের বোঝা তাঁরই কাঁধে, তাঁকেই বইতে হয়। অবকাশ তিনি চান না। মাথায় চওড়া সিঁদুর, হাতে দু-গাছা হাঙরমুখো বালা, পরণে কাস্তা-পাড় শাড়ী,—হাসিমুখে তিনি বলেন, যা পাবার সব পেয়েছি, এই ভাবেই যেন একদিন চ'লে যেতে পারি।

রাধেশবাবু বলেন, তেরো বছরের মেয়ে ঘরে এনেছি, এখন তোমার পঁচিশ হ'তে চলল, চিরকালই তোমার পাকা পাকা কথা।

মেয়ে মানুষ কুড়িতেই বুড়ি, তা জানো?

বুড়ো হবার সাধ তোমার কম নয় কিন্তু চেহারাটা অন্য কথা বলে। ছেলে-মেয়ে তিনটে সরিয়ে নিলে, সত্যি বলছি, আবার তোমার বিয়ে দেওয়া চলে বড় বৌ।

দুর্গা, দুর্গা। বেমক্কা কথা শোনো! বড় বউ বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

রাগ করো কেন, এ ত' কথার কথা।—রাধেশবাবু বললেন, সবাই বলে সিঁদুর মুছে নিলে মনে হয় কুমারী মেয়ে!

এমন সব নোংরা আলোচনায় থাকার রুচি বড় বউয়ের অনেক দিন চ'লে গেছে। স্বামীর সঙ্গে ঠাট্টা তামাসার সম্পর্ক আর নেই। মেয়েটা বড় হয়েছে, ছেলেটা ভর্তি হয়েছে স্কুলে, কোলের মেয়েটারও বয়স হলো পাঁচ বছর। সম্প্রতি বড় বউ দীক্ষা নিয়েছেন—বিধবা বৃদ্ধা শাশুড়ীর হেঁসেলে মাঝে মাঝে তাঁকে রাঁধতেও হয়। ছোটদের মধ্যে সকলেই তাঁকে আপনি ব'লে ডাকে। বাইরের লোকেরা ডাকে বড়মা।

আপনিও বলে না, অত্যন্ত সম্ভ্রমে মাথা হেঁট করেও যে থাকে না এমন একটি ছেলে মাঝে মাঝে আসে এ বাড়ীতে। তার নাম নয়নচন্দ্র। নয়নচন্দ্র নামটা বড়, তাই বড় বউয়ের মুখে সেটা 'নানু' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ বাড়ীতে আর সকলের কাছেই সে নানুদা ব'লে প্রখ্যাত। নানু বড় বউয়ের ছোট বোনের দূর-সম্পর্কীয় মাসতুতো দেবর। ছেলেটি অনেকদিন থেকেই বেকার, গ্রামে থাকলে আর চলে না, তাই কাজের চেষ্টায় আজ বছর খানেক হোলো তাকে কলকাতায় আসতে হয়েছে। ছোট বোনের অনুরোধ, বড়দিদি যেন নানুর একটু তত্ত্বাবধান করেন। নানু টিউশনি করে আর মেসে থাকে। এ বাড়ীর ছেলেপুলেদের কাছে সে অত্যন্ত প্রিয়।

অ বড় বৌমা, দ্যাখো তোমার গুণধর এসেছেন। বলি হ্যাঁ বাবা, কোথায় ছিলে চারদিন ? তোমার দিদি যে ভেবেই খুন গো !

নানু বললে, ভাবে অমন সবাই মাউই-মা। লোক পাঠিয়ে একবার খবর নিলেই ত পারতো, অত যদি ভাবনা ?

ভাঁড়ার ঘর থেকে বড় বউয়ের কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, কে বললে মা যে, আমি ভেবেই খুন ? বয়ে গেছে আমার ! বলে, পর লাগে না পরে, তেঁতুল লাগে না জ্বরে। ছোট বোনের দূরসম্পর্কের মাস্-শাশুড়ীর ছেলে—তার জন্যে আমি ভাববো ! লোকে আমাকে বলবে ডাইনী।

শাশুড়ী বললেন, ও কথা কি বলে বৌমা, দুঃখু করবে যে। মুখখানি বাছার শুকিয়ে গেছে, কিছু খেতে দাও মা।

নানু সোজা ঘরে উঠে এলো। বড় বউ বাতাবি লেবু ছাড়াচ্ছিলেন, নানু খপ্ ক রে লেবুর পাত্রটা টেনে নিয়ে বললে, ভেবে না হয় খুন হওনি, তা ব'লে খেতে দিতে কি ?

বড় বউ রাগ ক'রে বললেন, খাবার বেলা দিদি, কেমন ? মেসের দরজা বন্ধ ক'রে এ চারদিন যোগসাধনা হচ্ছিল ?

নানু বললে, আমার জ্বর হয়েছিল যে।

আবার জ্বর ? মুহূর্তে বড় বউয়ের রাগ প'ড়ে গেল ; লেবু ছাড়ানো স্থগিত রাখলেন। বললেন, এ ত' ভালো কথা নয় ! আজকে আর অমত করো না ভাই, ডাক্তার বাবুকে আনতে পাঠাই।—ব'লে তিনি এসে নানুর মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে জ্বর দেখলেন। জ্বর অবশ্য তখন মোটেই নেই। এটা বড় বউয়ের উদ্বেগের চেহারা।

ছোট বউ ব'সে কুটনো কুটছিল। হেসে বললে, দিদিকে একবার হারতে হো। ভাই এসেছে দিদির।

উৎকণ্ঠায় দিদির কানে আর কথা গেল না। তিনি বললেন, বর্ষাকাল, খালি পায়ে আর ঘুরতে হবে না। চলো, বিছানা ক'রে দিইগে, ও'র মোজা জোড়াটা পায়ে দিয়ে শুয়ে থাকবে।—এই ব'লে তিনি বঁটিখানা কাৎ ক'রে রাখলেন।

কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে, তবু দুরন্তপনাটা এখনো যায়নি। কাছে ব'সে নানু বললে, সে কি, তোমার মতলব ত ভালো নয় দিদি, ক্ষিদের চোটে পেট জ্বলছে আর তুমি বলো কিনা শুয়ে থাকতে—

দিদি তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন, নানু আর বাক্যব্যয় না ক'রে নত মস্তকে তাঁর অনুসরণ করলো। বড় বউ শাশুড়ীকে উদ্দেশ ক'রে ব'লে গেলেন, ও মা আপনি একবার দাঁড়াবেন রান্নাঘরে, ঠাকুর ঘণ্টটা চড়াবে। আমি শুইয়ে আসি নানুকে।

আচ্ছা বৌমা।—শাশুড়ী জবাব দিলেন।

এ সংসারে বড় বউয়ের অখণ্ড প্রতিষ্ঠা। কেবলমাত্র তিনি শাশুড়ীরই আদরণীয় বধূ নন, সকলেরই প্রিয়। তাঁরই বিধি নির্দেশের পরে চলে এই প্রকাণ্ড পরিবার। তাঁর ইচ্ছা এবং অভিরুচির ইঙ্গিতে এ-বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা মানুষ হয়।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বড় বউ বিছানা ক'রে দিলেন। এই ঘরেই ছেলে-মেয়ে নিয়ে রাত্রে তিনি নিজে থাকেন, পাশের ঘরটা রাধেশ বাবুর। তাঁর চল্লিশ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তিনি গড়গড়ায় তামাক সেবন করেন; তামাকের গন্ধ বড় বউ সহ্য করতে পারেন না। এ নিয়ে একটু বকাবকিও হয় বৈ কি! নরম বালিশটা মাথার ভিতরে গ‍ুঁজে দিয়ে বড় বউ বললেন, আজকে আর কোথাও যাওয়া হবে না; চুপ করে শুয়ে থাকো।

নানু বললে. তুমি কি আমাকে উপবাস করিয়ে রাখার চেষ্টায় আছো?

গ্রাহ্য করবার মতো সে কথা বলে না, বড় বউ তার দিকে একবার চেয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন—ওগো শুনছ?

রাধেশ বাবু মুখ তুলে বললেন, কেন?

তোমার সে উলের মোজা জোড়াটা আমি নিচ্ছি। নানুকে পরিয়ে দেবো।

সম্মতি আসবার আগেই তিনি মোজাজোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাধেশ বাবু নিঃশব্দে একবার স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখলেন। তাঁর মুখের কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

বিছানায় শুয়ে নানু বললে, এবার খেতে দাও।

আ. পাগল করো তুমি। কি খাবে বলো?

মাছের মুড়ো, মুগের ডা'ল, পায়েস, সন্দেশ—

বড় বউ হেসে বললে, এই মাত্র? আর?

নানু বললে, আর চাই তুমি কাছে বসে থাকবে। আচ্ছা দিদি, তুমি নিশ্চয় মনেই করোনি আমাকে? মেসের ঘরে শুয়ে ভাবছিলুম দরজা ঠেলে কতক্ষণে আসবে তুমি। তিন দিন পরে আর ধৈর্য রাখা গেল না।

বড় বউ বললেন. ছেলের কথা শোনো। আমি যাবো মেস বাড়ীতে? এরা কী বলতেন? তারপর, কি খেয়ে দিন কাটলো?

লংকা. মুড়ি, দুধ. সাবু!

ওষুধ?

নানু হেসে বললে ওষুধ? ওটা মেস, মনে রেখো দিদি। বাপের বাড়ীও নয়, শ্বশুর বাড়ীও নয়। দুর্ভাগা যারা তাদের এই অবস্থাই হয়। রোগের সময় দেখবার মানুষ জোটে না আর সুস্থ অবস্থায় অসুখের নাম ক'রে তাদের উপবাসে রাখতে চায় লোকে। এই ধরো যেমন তুমি।

রাধেশ বাবু দরজার সুমুখ দিয়ে পার হয়ে গেলেন, কিন্তু কথা কিছু বললেন না। নানু একবার তাকালো দিদির মুখের দিকে, এবং দিদি একবার তাকালেন তার মুখের প্রতি। পর মুহূর্তে হেসে বললেন, মাছের মুড়ো, মুগের ডা'ল ·····অসুখ সারতে না সারতে এসব কি খাওয়া চলে ভাই? আচ্ছা থাক্ থাক্ রাগ ক'রে আর মোজা খুলতে হবে না। যা ধরবে তাই করবে. ভারি একগুঁয়ে তুমি।

নীচে বড় বউয়ের ডাক পড়লো। আপিস-ইস্কুলের সময়। ছেলে-মেয়েরা কলরব সুরু করেছে। বড় বউ গলার সাড়া দিয়ে বললেন, ছোট বউ কি করছে শুনি? একটা দিনও কি আমাকে নইলে চলে না? রোগা মানুষ এলো, ব'লে আছি তার কাছে।

তাঁর গলার আওয়াজ শুনে নীচে সবাই চুপ ক'রে গেল। শ্বাশুড়ী বললেন, ভাইয়ের জন্যে পাগল।

নানু বললে, আসতে বারণ করেছিলে কেন দিদি? গলা নামিয়ে বড় বউ বললেন, তোমার সব কথার উত্তর দেবো না।

নিশ্চয় এ বাড়ীর লোকেরা আমার ওপর খুশী নয়। সত্যি বলো ত?

খুশী যদি না-ই হয় তা'তে আমি কি ভয় করি?

দুজনে চুপ ক'রে রইলো। বড় বউ কিয়ৎক্ষণ পরে বললেন, চারদিন পালিয়ে বেড়ালে কেন? বলেছিলুম, শনিবার আর রবিবারে তুমি এসো না। তোমাকে একদিন না দেখলে কোনো কাজে হাত পা আসে না। - নানুর মাথার নরম রেশমি চুলগুলি ন্যড়তে নাড়তে তিনি পুনরায় বললেন, যে যা বলুক, আমি থাকতে পারব না তোমাকে ছেড়ে।

নানু বললে, কানপুরে আমার চাকরি হবার কথা, আমি যদি সেখানে চলে যাই?

বেশ ত, ও'কে নিয়ে আমি যাবো তোমার ওখানে?

রাধেশ বাবুকে নিয়ে? বেশ কথা, এ বাড়ী থেকে তুমি আর রাধেশ বাবু গেলে সংসার চলবে কাদের নিয়ে?

বড় বউ তাঁর এই পরম স্নেহাস্পদটির মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন। বললেন, তা বটে। তোমার তাহ'লে কানপুরে যাওয়া হবে না নানু।

নানু বললে, তাহ'লে তুমি এই কথা বলতে চাও যে, তোমার আঁচলের ছায়ায় থাকলে আমার দিন চ'লে যাবে, কেমন?

তার মাথার চুলের মুঠি ধ'রে বড় বউ হেসে বললেন, অত সোজা ক'রে কথা বলতে নেই দিদির মুখের ওপর। তোমার দিন চলবার ভার আমার হাতে। চারটি দিন তোমাকে দেখিনি, জানো আমার বুকের মধ্যে কী হচ্ছিল?—হয়েছে, আর জ্বরের ভান করতে হবে না,—ব'লে বড় বউ তার পা থেকে হিঁচড়ে মোজা খুলে নিলেন।—বললেন, চান করবে ত?

না, তোমার মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থাকব। চান করব না, খাবো না, ঘুমোবো না, চাকরি করব না।

বড় বউ হাসতে হাসতে উঠে গেলেন।

একটা অসাধারণ অবস্থার উৎপত্তি হয়। বড় বউকে পাওয়া যায় সকলের ভিতরে—নানু যখন থাকে না। কাজ-কর্মে তাঁর উৎসাহ থাকে; আলাপে ব্যবহারে থাকে উষ্ণতা; কখনো তাঁর বিবেচনার বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ নেই। কিন্তু চাকা ঘুরে যায় নানু এসে দাঁড়ালে। ছোট বউ বক্রোক্তি ক'রে নিজের কাজে চ'লে যান ঝি-চাকরগুলো থাকে দূরে দূরে, দেবর-ভাসুরের মুখ মেঘময় হয়ে আসে, এমন কি ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত বড় বউয়ের অবাধ্য হয়ে ওঠে। কেমন যেন গভীরতর অসন্তোষ—চাপা অশান্তি। বড় বউ ভয়াতুর দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চেয়ে থাকেন। এমন কেন হয়?

মা?

শাশুড়ী বললেন, কেন বউমা? ওকি, এখনো পর্যন্ত জলটুকু মুখে দাওনি; সেই কোন্ সকাল থেকে—

বড় বউ বললেন, এরা সবাই গেল কোথায় মা?

খেয়ে-দেয়ে যে যার ঘরে উঠেছে। ছেলে-মেয়েরা গেছে ইস্কুলে। নানু আজ কি খাবে বৌমা?

ভাতই খাবে, জ্বর নেই। আমার সঙ্গেই বসবে।

ঠাকুর, তরকারী ভাল আছে ত?— ব'লে বড় বউ রান্নাঘরের কাছে দাঁড়ালেন।

ঠাকুর বললে, আছে বড়মা।

ছোট বউয়ের ঘর থেকে হাসির ঝঙ্কার শোনা গেল। দেবর আজ কাজে বেরোননি। হাসির কারণ যাই হোক, বড় বউ সেই দিকে চেয়ে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। মনে সে হাসির মধ্যে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ মেশানো, আর সে হাসি যেন তাঁরই উদ্দেশে। হয়ত এমনই মনে হয়।

বড় বউ বললেন, মা, লাউয়ের তরকারী দেবেন নানুর জন্যে, ও খুব ভালবাসে। দেখুন অমন দুষ্টু ছেলে, তখন ভাবটা করলে যেন কতই অসুখ! ওমা, এখন গায়ে হাত দিয়ে দেখি, বিশেষ কিছু না। এসব কেন জানেন, আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলবার মতলব।

শাশুড়ীর সঙ্গে তিনিও হাসতে লাগলেন। শাশুড়ী বললেন, বিদেশে নানু তোমারই মুখ চেয়ে থাকে, আর তোমারো হয়েছে ভালো। পাঁচটি বোন তোমরা বৌমা, এতদিনে একটি ভাই পেয়েছ। আহা, ভগবান ওকে বাঁচিয়ে রাখুন। ছেলে ত নয়, রাজপুত্তুর!

বড় বউ বললেন, নানু চাকরি করতে চায় কানপুরে গিয়ে। আমি কিন্তু ওকে যেতে দেবো না মা।

ওমা, কানপুর। সে যে অনেক দূর গো! দেশে কি একটা কাজ জুটবে না? খুব জুটবে। বিদেশে বিভুঁয়ে……না না, সে হয় না বৌমা। তুমি নানুকে ধ'রে রেখো।

বড় বউ হাসতে লাগলেন। বললেন তাই কি আর যেতে দেবো মা। অমন আবদার ধরলে মেস ছাড়িয়ে নিজের কাছে এনে রাখব।

শাশুড়ী বললেন, তোমার মতন বোন পাওয়া ভাগ্যের কথা!

বড় বউ বললেন, আমি চান ক'রে আসি। আমাকে আর নানুকে এক সঙ্গে খেতে দিয়ো ওপরে। ব'লে তিনি স্নান করতে চ'লে গেলেন।

ছোট বউয়ের ঘর থেকে আবার হাসির শব্দ শোনা গেল। বড় বউ মুহূর্তের জন্য কল ঘরের দরজার কাছে একবার দাঁড়ালেন, তাকালেন একবার উপরে ছোট বউয়ের ঘরের দিকে, তারপর ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। ছোট বউয়ের ঈর্ষার চেহারাটা তাঁর জানা আছে।

আহারাদির পর শীতলপাটি ছড়িয়ে দিয়ে বড় বউ বললেন, একটু ঘুমিয়ে নাও নানু, আমিও শুই এখানে ভুমিকে নিয়ে।— তিনি তাঁর পাঁচ বছরের মেয়েটিকে নিয়ে একধারে শুয়ে পড়লেন।

নানু বললে, আমি কিন্তু বিকেল বেলা যাবো দিদি ম্যাচ দেখতে, ব'লে রাখলুম।

বড় বউ তার গলার কাছে জামার খুঁট ধ'রে বললেন, যেতে দিলে ত। আমি যে ভেবে রেখেছি দুদিন ধ'রে তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো? আমিও তা'হলে ম্যাচ দেখতে যাবো!

তুমি যাবে? লজ্জা করে না বলতে? মেয়ে মানুষ হ'য়ে·· ছাড়ো বলছি নৈলে হাতের চুড়ি সব ভেঙে দেবো।

বড় বউ বললেন, আমি তাহ'লে টিকিটের পয়সা দেবো না, দেখি তোমার ম্যাচ দেখা কেমন ক'রে হয়।

বেশ, তবে এই আমি চললুম। গেটের মধ্যে গিয়ে ঢুকবো, মেরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে, হাঁসপাতালে যাবে পা খোঁড়া হ'য়ে, তারপর মরবো—দেখো তুমি।

বড় বউ তার জামা একটু শক্ত ক'রে ধ'রে তখনকার মতো চোখ বুজলেন।

ঘুম ভাঙলো বেলা তিনটেয়। নানু তখন নাক ডাকছে! বড় বউ উঠে ভুনিকে জামা পরিয়ে দুধ খাইয়ে যখন নিজে কাপড় ছেড়ে এলেন, তখন নিচে গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট বউ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্বামীকে বললেন, মোটর এসেছে, নানুকে নিয়ে দিদি বেড়াতে বেরোবেন। ছেলে-মেয়েদের বোধ হয় সঙ্গে নেবেন না!

নানু উঠলো। ম্যাচ দেখা স্থগিত রাখতে সে বাধ্য হোলো। বড় বউকে বেড়াতে নিয়ে যেতেই হবে। তার জামা কাপড় এক প্রস্থ বড় বউয়ের আলমারিতে গোছানো থাকে, সুতরাং অসুবিধে নেই। নানু প্রস্তুত হয়ে নিল।

শাশুড়ীর অনুমতিটা নিতে হয়। বড় বউ তাঁকে ব'লে ভুনির হাত ধ'রে নানুকে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। রাধেশ বাবুকে জানাবার কিছু নেই।

গাড়ী ছাড়বার পর বড় বউ নানুর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, বিশ্বাস করবি একটা কথা বলব তোকে?

নানু বললে, বলো।

না থাক্—চুপি চুপি বড় বউ বললেন, এখানে ভুনি আছে, ড্রাইভার আছে।

নানু বললে, লক্ষ্মীটি, আস্তে আস্তে বলো দিদি?

বড় বউ নানুর মুখের কাছে মুখ এনে মৃদুগুঞ্জন করে বললেন, এত ভালো লাগে তোর সঙ্গে বেড়াতে!

ভুনি তাদের কথা শুনছিল। বড় বউ তার মুখখানা তুলে ধ'রে আবিষ্ট চুম্বনে আবৃত ক'রে দিলেন।

গাড়ী চলতে লাগল। নানু এক সময়ে বললে, আমরা যাচ্ছি কোন্‌দিকে দিদি?

বড় বউ হেসে ড্রাইভারকে বললেন, হরিচরণ বাবু, ঘণ্টা দুই আমাদের যেদিকে খুশি বেড়িয়ে আনুন।

যে আজ্ঞে।—

পাঁচটার পরে তারা ফিরলো। বড় বউ নীচে চা আর জলখাবার আনতে গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁর শাশুড়ী উপরে এসে বললেন, নানু তুমি আজ এখানে থাকো বাবা, দিদি তোমাকে ছাড়বে না।

নানু বললে, মেসে যে ব'লে আসিনি মাউই-মা।

না ব'লে এলে কি হয় ?

ওরা খাওয়ার দাম হিসেবে চোদ্দটা পয়সা কেটে নেবে। আগে থেকে ব'লে রাখলে—

এমন সময় বড় বউ ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, আমার চেয়ে চোদ্দটা পয়সা তোমার বড় হলো ? তবু যদি ছেলের পয়সা-কড়ির ওপর মায়া থাকতো !

মাউই মা ব'লে গেলেন, তা হোক বাবা, যাক চোদ্দটা পয়সা। দিদির বাড়ী এক-দিন থাকলে লোকসান সয়ে যাবে। আজ আমি মালাই রেখেছি তোমার জন্যে।

তিনি চ'লে যাবার পর বড় বউ বললেন, বুড়ো মানুষের অবাধ্য হ'তে নেই।

নানু বললে, মালাইয়ের লোভে থাকাই যাক, মন্দ কি। কিন্তু নীচের বৈঠকখানায় আমি শুতে পারবো না তা ব'লে রাখলুম। ওখানে মাকড়সা আছে।

বড় বউ বিস্মিত হয়ে বললেন, নীচের বৈঠকখানায় ? ছেলের কথা শোনো। ছেলে-মেয়ে নিয়ে শোবো, আমার কাছে শোবে তুমি।

আর রাধেশ বাবু ?

উনি ছেলে-মেয়ের কাছে শুতে চান না।

সে রাত্রিটি বড় সুন্দর। শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নায় শরৎকালের পরিচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের দল জেগে উঠেছে। আজকে বড় বউয়ের উৎসাহের আর শেষ নেই। বাড়ীর সকলে শুয়ে পড়েছে। নানু খেয়ে-দেয়ে উপরে উঠে গেছে। আজ চাঁদের আলোয় ব'সে তারা অনেকক্ষণ ধরে গল্প করবে। কানপুরে সে চাকরি করতে যাবে না---এই প্রতিশ্রুতি আগে আদায় ক'রে নিতে হবে। বড় বউ তাড়াতাড়ি আহার সেরে নিলেন।

উপরে এসে নানুকে ঘরে দেখা গেল না। বড় বউ হাসলেন। চাঁদের আলো নানু বড় ভালবাসে, আগেই সে ছাদে গিয়ে উঠেছে। রাধেশ বাবুর ঘরে একবার উঁকি মেরে বড় বউ বললেন, রাত জেগে কাজ করছ, শরীর খারাপ হবে যে ?

রাধেশ বাবু বললেন, পুজোর সময় কিনা তাই কাজের ভিড়। তোমার খাওয়া হয়েছে ?

হ্যাঁ। বলে বড় বউ ছাদে উঠে গেলেন। দ্রুতপদে, ঊর্ধ্বশ্বাসে। বাঁ হাতে তাঁর একটা পান, নানুর চোখ বুজিয়ে খপ্ ক'রে মুখে পুরে দেবেন। এই পানটির মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর হৃদয়ের সমস্ত সুর জড়ানো।

ছাদে মাদুর পাতা আছে কিন্তু নানু নেই। বড় বউয়ের বুকের ভিতরটা ধড়াস ক'রে উঠল। মনে হোলো এখুনি তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবে। ছুটোছুটি ক'রে তিনি সমস্ত ছাদ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেন। নানু নেই।

দৌড়ে তিনি নেমে এলেন নীচে। দালানে খুঁজলেন অন্ধকারে। ঘরে গিয়ে

আলো জেবলে চারিদিক খ‍ুঁজলেন। নান‍ু কোথাও নেই। বাঁ হাতে নিজের ম‍ুখ-খানা চেপে ধরলেন, পাছে কান্নার শব্দ বেরিয়ে পড়ে।

ছ‍ুটে এলেন তিনি স্বামীর ঘরে। উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, নান‍ু কোথায় গেল ? সে আজ থাকবে এখানে....বলো নান‍ু কোথায় গেল ?

রাধেশ বাব‍ু উঠে এলেন। বললেন, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বড় বউ ?

বলো তুমি নান‍ু কোথা গেল। তুমি বলো। কোথায় গেল বলো আমাকে। কণ্ঠ ওর বিদীর্ণ হয়ে উঠল।

রাধেশ বাব‍ু বললেন, আমি তাকে চ'লে যেতে বলেছি।

চলে যেতে বলেছ তুমি ? জানি আমি, জানি. আর একবার তুমি তাকে অপমান করেছিলে। আমি থাকবো না. আমি থাকবো না, আমিও যাবো।—দ্র‍ুতপদে বড় বউ নীচের সিঁড়িতে নামতে লাগলেন।

রাধেশ বাব‍ু গিয়ে ধ'রে ফেললেন. বললেন, বড় বউ, এসব কি হচ্ছে ?

বড় বউ স্বামীর ব‍ুকে ম‍ুখ ল‍ুকিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেললেন একদিন···একদিন বাচ্চাকে কাছে নিয়ে শ‍ুতে পারল‍ুম না, তুমি তাকে দেবে তাড়িয়ে, অপমান করবে, আমাকে নামিয়ে দেবে।

রাধেশ বাব‍ু বললেন, নান‍ু তোমার কে, বড় বউ ? ভাই ?

অর্থহীন শ‍ূন্য দ‍ৃষ্টিতে বড় বউ স্বামীর দিকে তাকালেন। কান্নায় তাঁর সর্বাঙ্গ ফ‍ুলে উঠছিল। রাধেশ বাব‍ু বললেন, আমি জানি মাত্রা কোথায়। চলো আজ আমার কাছে তোমাকে শ‍ুতে হবে ; নিজেকে স্পষ্ট ক'রে জানতে শেখো বড় বউ।—ব'লে তিনি পরম স্নেহে স্ত্রীকে দ‍ুই হাতে ত‍ুলে নিয়ে ঘরে ঢ‍ুকে দরজা বন্ধ করলেন।

রোগশয্যা

'ডাক্তারবাবু আছেন ? ডাক্তারববাবু ? একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দিন না দয়া ক'রে—বড্ড দরকার—আরজেণ্ট্।'

'বসুন আপনি খবর দিচ্ছি। এখুনি তিনি নামবেন।'

নামবার আগেই খবর দিন, একবারটি বলুন যে মহিম ঘোষের ওখান থেকে এসেছে—একটু তাড়াতাড়ি যান মশাই—

'আচ্ছা খবর দিচ্ছি, বসুন ওই চেয়ারে।'

'বসব না, সময় নেই। আছি এখানে দাঁড়িয়ে।

লোকটি চ'লে গেল আমি ততক্ষণ বারান্দায় পায়চারি সুরু করেছি। প্রত্যেকটি মুহূর্তে অসহনীয় বোধ হচ্ছে।

দু' মিনিট চার মিনিট পাঁচ মিনিটের পর সিঁড়িতে জুতার শব্দ হলো ; দ্রুত এগিয়ে গেলাম। ডাক্তারবাবুকে দেখেই বললাম এখনই একবারটি চলুন ডাক্তারবাবু অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না—এখনই আপনাকে যেতে হবে, বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়েছেন—'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আচ্ছা যাচ্ছি, জ্বর কি বেড়েছে ?'

'না, জ্বর তেমনি। কিন্তু আবার রক্ত—আবার সেই ছিটে ছিটে লাল, ন বাঁচার ইঙ্গিত, এখুনি চলুন আপনি !'

গাড়ী তৈরী ছিল। দু'জনে গিয়ে উঠে বসলাম। তিনি ড্রাইভ করতে লাগলেন। এক সময় বললেন, 'উত্তেজনা হয়েছিল। উনি ত আবার একটু বদরাগী।'

চুপ ক'রে রইলুম। তিনি পুনরায় বললেন, 'হয়ত উঠে পরিশ্রম করেছিলেন কিছু—'

'আজ্ঞে না, কোনো পরিশ্রমই করেননি। শুধু শুধু, অকারণে দেখা দিল রক্ত, অকারণে এই বিপ্লব। সত্যই কি বাঁচানো যাবে না ডাক্তারবাবু ?'

'চলুন, ব্যস্ত হবেন না—'

এক মাইল পথ, একশো যোজন ! পথ আর ফুরোয় না। মোটরে এক মাইল পথ এত দেরি লাগে ?—'আর একটু স্পীড্ দিন, ডাক্তারবাবু, তিরিশ ক'রে দিন থার্টি পার আওয়ার—'

ডাক্তারবাবু হাসলেন, এবং তারপরই ব্রেক ক'সে বললেন, 'এই ত এসে পড়েছি নামুন।'

গাড়ী রেখে দ্রুত ছুটে গেলাম বাড়ীর অন্দরমহলে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবু

উপর তলায় গিয়ে উত্তর দিকের ঘরে ঢুকলাম। সেখানে চার-পাঁচটি যুবক ব্যস্ত-সমস্ত,—খাটের বিছানার একধারে সুরসুন্দরী নিমীলিত চক্ষে শুয়ে রয়েছেন। ডাক্তারবাবু এসে বিছানার এক ধারে বসলেন!—'দেখি একবার।' বলে রোগিণীর বাঁ-হাতখানি টেনে নিলেন। হাতখানি শীর্ণ, কিন্তু সুন্দর; একগাছি চুড়ি চিক্ চিক্ করছে।

সুরসুন্দরী জেগে উঠে হাসিমুখে বললেন, 'এর মধ্যে আপনাকে কে খবর পাঠাল?'—সে-হাসিমুখে ব্যাধিকে অতিক্রম করে, মৃত্যুকে অস্বীকার করে।

ছেলেদের ভিতরে আমাকে দেখিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, ওই যে উনি।'

রোগীর জ্বলন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা ক'রে একটি ছেলের পাশে স'রে দাঁড়ালুম। এটা আমার অপরাধ। রোগের দিনে সেবা করতে যাওয়া, ডাক্তার আনা, ব্যস্ততা, উদ্বেগ—এ সব আমার অপরাধ।

'গতকাল একটা ইন্‌জেক্‌শন হয়ে গেছে, আজকে আর কিছুর প্রয়োজন নেই,' এ কথা জানিয়ে ডাক্তারবাবু উঠলেন। 'পথ্য আর উপযুক্ত সেবা, এই হলেই চলবে।—আর দেখবেন যেন কোনো কারণে উত্তেজিত না হন।'—এই ব'লে তিনি তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

মহীতোষ বললে, সুরোদিদি, এইবার আপনাকে কিছু ফলের রস খেতে হবে কিন্তু!'

হেমেন্দ্র বিছানার ধারে ব'সে মাথার উপর ধীরে ধীরে বাতাস করতে লাগল। আর দুটি ছেলে ছুটল অন্দরমহলে পথ্যের ব্যবস্থায়। আজ ছ' মাস ঠিক এমনি ভাবেই চলছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, বয়স বেশি হলে বাঁচানো কঠিন হোতো, নিতান্ত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে তাই···স্বাস্থ্যটাও ভালো—

ভয়ে কাঁটা হয়েছিলুম, কিন্তু আমার দিকে কারো ভ্রূক্ষেপ ছিল না, আমার প্রয়োজন ছিল সামান্য। কেবল তাই নয়, আমার এখানে স্বাতন্ত্র্যও নেই, প্রতিষ্ঠাও নেই।

সুরসুন্দরী ধীরে ধীরে মহীতোষের একখানা হাত ধ'রে বললেন, 'যদি না বাঁচি, তা'হলে তোমরা কি করবে মহীতোষ?'

'ও কি কথা সুরোদিদি?'

হেমেন্দ্র বললে, আপনাকে বাঁচিয়ে তোলাই হবে আমাদের গৌরব, দেশের গৌরব!'

সুরসুন্দরী হাসলেন, হেসে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। রোগের মালিন্য নেই, কেমন একটি রুক্ষ লাবণ্য। মাথার রাশীকৃত চুল নাড়া পেয়ে তাঁর দেহের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চোখের ভিতরে শান্ত শ্রী, মুখখানিতে স্বাস্থ্যের আভা। এমন মানুষের দুরারোগ্য রোগ, বিশ্বাস হয় না।

হেসে বললেন, মহীতোষ, আজ মরব না কিন্তু কাল মরতে হবে। সঙ্ঘের কাজ অনেক বাকি রয়ে গেল, তোমরা রইলে। হেমেন্দ্র, কাল সারারাত তুমি

জেগেছ, আজ সকাল সকাল বাড়ী যেয়ো। শুক্রবারে তোমার মামলার তারিখ, কেমন ?'

হেমেন্দ্র বললে, হ্যাঁ, ছ'মাসের জন্যে যেতে হবে শ্রীঘরে।'

তোমার বক্তৃতার দুটো তিনটে কথা কেবল মাত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল। না বললেই পারতে ভাই।'

হেমেন্দ্র বললে, 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন, সুরোদি, সেই দুটো কথাই কোর্টে ওরা রেফার করেছে। যাকগে, জেলে ত' একদিন যেতেই হোতো।

সুরসুন্দরী নীরবে হাসলেন।

এমন সময় একটা শিশি দেখিয়ে বললাম, 'এইটে বোধহয় এখন খাবার সময় হয়েছে।'

'থাক্।'—সুরসুন্দরী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কে তোমাকে আতিশয্য দেখাতে বলেছে ? ডাক্তার আনতে কেউ বলেছিল ?'

বললাম, 'না।'

'তবে কিসের জন্যে আনতে গেলে ? তোমার একটুও বুদ্ধি শুদ্ধি নেই—বোকার মতন দাঁড়িয়ে থেকো না। যাও বেরিয়ে।'

মহীতোষ আর হেমেন্দ্র অলক্ষ্যে মুখ-চাওয়াচায়ি ক'রে ইঙ্গিতাত্মক হাসি হাসলো। সন্দেহ নেই, আমি ওদের করুণার পাত্র। হেমেন্দ্র বললে, 'বাইরেই যান না সতীশবাবু, উনি যখন বলছেন—'

মহীতোষ ভদ্র কন্ঠে বললে, 'উনি যাতে এক্সাইটেড্ না হন সেদিকে আপনার দেখা উচিত নয় ?'

মাথা হেঁট ক'রে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। আত্মীয় আমরা কেউই নয়, সবাই পরিচিতের দল। ওরা সবাই সুরসুন্দরীর রাজনীতৈক সহকর্মী, আমি বাতিল, আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। এমন লাঞ্ছনা নতুন নয়, কিন্তু একে অপমান বলব না, এর মধ্যে কেবল অযৌক্তিক নিষ্ঠুরতা জড়ানো থাকে,—অন্ততঃ তাই মনে হয়। চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম দরজার পাশে, নীচের সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হোলো। দুটি যুবক উঠে এলো, তার সঙ্গে একটি তরুণী মেয়ে। ছেলে দুটি হেসে ঘরে গিয়ে ঢুকল, মেয়েটিও নমস্কার জানিয়ে বললে, 'কই আমাদের বাড়ীতে ত একদিনও গেলেন না, সতীশবাবু ?'

বললাম, 'নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তাই,—'

'এখানে এলেই ত আপনাকে দেখতে পাই—' বলে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে সে-ও ভিতরে গেল। জানি এ হাসির তাৎপর্য।

ঘরের ভিতরে উদ্বেগ, সামাজিক সৌজন্য আর কুশল-প্রশ্নের ঝড় সুরসুন্দরীকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে। তিনি সুস্থ অবস্থায় নানা কাজের মানুষ। নবীন-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী, ভারতী পাঠাগারের সেক্রেটারী, তাঁর তত্ত্বাবধানে মেয়েদের

বোর্ডিং চলে, নিগৃহীতা নারী-আশ্রমের কর্তৃপক্ষের তিনি একজন, নিজে তিনি একটা কারখানার স্বত্বাধিকারিণী—সেখানে ছুরি, কাঁচি তৈরী হয়, এ ছাড়া নাকি বহু দুঃস্থ নরনারীর ব্যয়ভার তিনি বহন ক'রে থাকেন।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সুরসুন্দরীর বাবা মহিমবাবু। তিনি ইঙ্গিত ক'রে ডাকলেন, 'বয়, শোনো।'

কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, 'আজ সকাল থেকেই যে এত ভিড় ?'

'ও'রা সব দেখা করতে এসেছেন।'

'মাথাটা খেলে !'—ব'লে তিনি একবার কন্যার ঘরের দিকে তাকালেন। বললেন, 'ডাক্তার এসেছিল ? কি বললে ?'

'নতুন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে থাকলে—'

মহিমবাবু অনেকক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, 'আলমোড়াতেই নিয়ে যাই, কি বলো, বয় ?'

বললাম, উনি কি রাজি হবেন যেতে ?'

'হবে। তোমার কথা শোনে, তুমি যদি বলো—'

এমন সময় হেমেন্দ্রর গলার আওয়াজ শুনলুম, 'সতীশবাবু, ওষুধটা ঢেলে দিয়ে যান।'

তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে একটা শিশি থেকে ওষুধ এগিয়ে দিলাম। মহীতোষ সাহায্য করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সুরসুন্দরী নিজেই ওষুধটা খেয়ে মেজার গ্লাসটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

'আঃ, কোনো বিবেচনা নেই, একটু মুখশুদ্ধি দিতে হয় না ওষুধের পর ? যদি একটু বিবেচনা থাকে ঘটে !'

তাঁর এই বিকৃত মেজাজ ঘরশুদ্ধ ছেলেমেয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। তাঁকে সবাই ভয় করে। আমি তাড়াতাড়ি কিছু এলাচ আর মৌরি বার করে সুরসুন্দরীর হাতে পৌঁছে দিলাম।

'বেচারী সতীশবাবু'—হেমেন্দ্র হেসে বললে, 'আপনার ধমক খেয়ে খেয়ে সতীশবাবু একেবারে কাদা হয়ে গেছেন। না সতীশবাবু কিছু মনে করবেন না।'

সুরসুন্দরী বললেন, 'তোমার কি মনে হয় হেমেন্দ্র, সতীশবাবু একটু নির্বোধ নন ? তোমাদের মুখে এত রকমের আলোচনা শুনছি, কিন্তু ও'র সেই ডাক্তার আর ওষুধ আর পথ্যি।'

তখনকার সেই তরুণীটি বললে, 'আপনার জন্যে উনি বিশেষ উদ্বিগ্ন, সুরোদি।'

'তাই নাকি বনলতা ? আশ্চর্য তোমার দৃষ্টি ! আমার বাবা রয়েছেন স্থির হয়ে, সতীশবাবুর কি তাঁর চেয়েও মাথাব্যথা ? মা'র পোড়ে না, মাসির পোড়ে ?

ওসব নভেল ঢঙ এ ঘরে চলে না!'—তাঁর কণ্ঠের তীব্রতায় উপস্থিত কারো মুখেই আর কথা নেই।

বনলতা বললে, 'আপনি কি বলতে চান সুরোদি, এমন হয় না সংসারে?'

'সংসারে হয়, কিন্তু হবে না সুরসুন্দরীর এই ঘরখানায়। ওটা হিষ্টিরিয়া, ওর ওষুধ কি জানো বনলতা? শঙ্কর মাছের চাবুক। সতীশ বাইরে গিয়ে বসো গে। যাও।'

একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মহিমবাবু তখন সেখান থেকে চ'লে গেছেন। মনের মধ্যে কেমন একটা খুশীর হাওয়া বয়ে চলেছে। সুরসুন্দরীর মনে হৃদয়াবেগের আবেদন কোনদিন পৌঁছয় না। চোখ দুটো তাঁর খোলা।

ঘরের ভিতরে ছেলে-মেয়েদের আলাপ আলোচনা আর শোনা যাচ্ছে না, তারা যেন সবাই দমে গিয়েছিল। একটু পরে শোনা গেল জুতোর শব্দ, এবং জানলার পাশ থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, হেমেন্দ্র মহীতোষ আর তিন-চারটি তরুণ-তরুণী বিদায় নিয়ে একে একে নীচে নেমে গেল। সুরসুন্দরীর জন্য একা আমি উদ্বিগ্ন নই, তাদের কাছেও সুরসুন্দরীর প্রাণের মূল্য অনেক বেশি।

আমি এবার ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি সেই রুগ্ন অবস্থাতেও তিনি কয়েকখানা কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করছেন। আস্তে আস্তে বললুম, 'বৌদিদিকে ডাকব? এখন একটু ফলের রস খেলে—'

'থামো তুমি, খাবার সময় হ'লে নিজেই চেয়ে নেবো।'—তিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। তাঁর চোখে মুখে আমার প্রতি বিরক্তি ফুটে উঠল।

খানিক পরে কাগজের ভিতর থেকে মুখ তু'লে সুরসুন্দরী প্রশ্ন করলেন, 'তুমি নাকি আমার জন্য উদ্বিগ্ন?'

'কে বললে? আমার চেয়েও ত ওদের দুশ্চিন্তা বেশি?'

'দয়া ক'রে আমাকে মুক্তি দাও তোমরা। তোমাদের এই সস্তা সেবা আমার সহ্য হয় না। এই তোষামোদ থেকে আমাকে মুক্তি দাও।'

বললাম, 'যে রকম অবস্থা, মুক্তি ত তুমি নিজেই নেবে শীঘ্র।'

'তা হলেই বাঁচি। কতকগুলো ছেলের উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি পাই।'

চুপ ক'রে রইলুম। এর পরে বলবার মতো কথা আর কিছু থাকতে পারে না। তিনি বালিশে মাথাটা হেলিয়ে বললেন, 'কাল রাত্রে তুমি এ বাড়িতে ছিলে।'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় শুয়েছিলে?'

'নীচে বৈঠকখানার ঘরে। বেশ ঘুম হয়েছিল।'

'থামো, চালাকি ক'রো না। কিসের জন্য শুয়েছিলে নীচের ঘরে, ওপরে জায়গা ছিল না? এর পর দেশময় ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে যে সুরসুন্দরীর জন্য

এত করেছি, অত করেছি, খাইনি, ঘুমোইনি,—কেমন ত? ইতর কোথাকার! খেয়েছিলে রাত্তিরে?'

'নৈলে কি উপোস ক'রে থাকব তোমার অসুখের উদ্বেগে?'

'মিথ্যে কথা ব'লো না সতীশ, খাওয়ার চেহারা তোমার নয়। তুমি খেলে আমাকে ওরা খবর দিত। বলো সত্যি ক'রে খেয়েছ কি না।'

'না, খাইনি।'

দেখতে দেখতে তাঁর মুখখানা কঠিন কর্কশ হয়ে উঠল। তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'কেন, খাওনি? না খেয়ে, না ঘুমিয়ে···তারপর অসুখ করলে আমাকে দায়ী করবে ত সবাই? তুমি বাপু আর এসো না আমাদের বাড়ীতে।' —উত্তেজনায় রুগ্ন শরীরে তিনি বিছানা থেকে নেমে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পুনরায় বললেন, 'হতচ্ছাড়ারা খেল আমাকে···কপালে আগুন! ওরে ও ফুলচাঁদ?'

আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছিল, তাঁর হাতে তুলে দিলাম। ফুলচাঁদ সাড়া দিয়ে এসে দাঁড়াল। সুরসুন্দরী বললেন, 'ওরে বাঁদর, গাধা—দূর ক'রে দেবো তোমাকে বাড়ী থেকে, জানো?'

ফুলচাঁদ নতমস্তক।

'বেরোও শুয়োর, সুমুখ থেকে। কোথায় গাঁজা খাচ্ছিলি ব'সে ব'সে? পিসিমাকে ডাক একবার।'

ফুলচাঁদ দ্রুতপদে চ'লে গেল। একটু পরেই এলেন পিসিমা, হাতে তাঁর খাবারের পাত্র। সুরসুন্দরী বললেন, 'একটা মানুষ না খেয়ে এ বাড়ীতে রাত, কাটায়, আপনারা ভ্রুক্ষেপ করেন না, পিসিমা?'

'কে না খেয়ে রাত কাটালো, মা?' ব'লে তিনি ঘরে ঢুকে খাবারগুলি সাজিয়ে রাখলেন।

তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, পিসিমা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, খেয়ে এসেছিলুম আমি রাস্তায়। রাস্তায় কি খাবার পাওয়া যায় না?'

পিসিমা বললেন, 'কাল তোমার অসুখ বেড়েছিল···আর অত লোকজনের ভিড়··· সতীশ আমাকে একবার বলেওনি। আড়ালে আড়ালে থাকে, দেখতেও পাইনি। এখনি চান্ ক'রে এসো সতীশ, এখানে খেয়ে যাও।' ব'লে তিনি আবার চলে গেলেন।

রাগ ক'রে ঘরে ঢুকে বললাম, 'এ বাড়ীতে আর আমার আসা হবে না, আমি চললুম।'

সুরসুন্দরী হাসলেন। বললেন, আসতে ত মানা করি, তবু আসতে ছাড়ো না। অভ্যর্থনা করিনি তোমাকে কোনোদিন, অপমান সহ্য করো আমার কাছে দিনের পর দিন, ভালো ক'রে কথাও বলিনে তোমার সঙ্গে—এর পরেও কি আমার কাছে আসা উচিত?'

'কখনোই উচিত নয়।'

'চেয়ে দ্যাখো হেমেন্দ্র আর মহীতোষের দিকে। ওরা আসে ভদ্রভাবে, খাতির করে। কিন্তু তফাৎ কি জানো? ওরা ডাক্তারের বাড়ী দৌড়ায় না, ওরা কাছে ব'সে পাখার বাতাস করতে ভালোবাসে, ওরা হচ্ছে আমার ভক্তের দল।'

বললাম, 'আমিও ত তাই।'

'মিথ্যে কথা। আমার ওপর তোমার মায়া আছে, কিন্তু শ্রদ্ধা নেই। আমি এত কাজের মধ্যে থাকি, তোমার কাছে সে সব ছেলেখেলা। বেশ আর যখন আসবেই না, তখন কিছু খেয়ে যাও।'

'খেতে ইচ্ছে নেই।'

'দ্যাখো, সাধতে পারব না। এখনো ছুঁইনি, এগুলো খাও তুমি। এসো এদিকে বলছি, কুটুম্বিতে কোরো না সতীশ।'

কাছে গিয়ে খেতে বসলাম। খেতে সুরু করেছি এমন সময় সাড়া দিয়ে একটি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তিনি মাতৃমন্দিরের জয়েণ্ট্ সেক্রেটারি। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে তিনি বললেন, 'ব্যাঙ্ক থেকে চেকটা কাল ফেরত এসেছে, আপনি শুনেছেন?'

সুরসুন্দরী বললেন, 'কেন, টাকা নেই?'—মুখখানা তাঁর ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে এল।

সেক্রেটারি বললেন, 'কিছু আছে, বাকিটা নেই। মামলা উঠেছে সেসনে, আজ বেলা একটার মধ্যে টাকা না পেলে···পি. কে. গুপ্ত আমাদের দিকে দাঁড়িয়েছেন; কি করি বলুন ত?'

সুরসুন্দরী বললেন, 'বাবার কাছে এখন ত টাকা চাইতে পারব না; তিনি দেবেন না। আপনি কোথাও থেকে—?'

'কোনো উপায় নেই, মিস্ ঘোষ।'

সুরসুন্দরী ডাকলেন, 'সতীশ?'

বললাম, আগে খেয়ে নিই।'

বিরক্ত হয়ে তিনি আমার হাতের কাছ থেকে থালাটা সরিয়ে নিলেন। তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'গোগ্রাসে গিলতে বসলে আর জ্ঞান থাকে না, এই কি খাবার সময়?'

সেক্রেটারি বললেন, 'এটা সিরিয়স্ কেস সতীশবাবু।'

আমি সুরসুন্দরীর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, 'টাকার জন্যে বিপদ ঘটবে, বুঝতে পারো না?'

'কে না বুঝতে পারে একথা?'

'কত টাকা চাই আপনার, রমেশবাবু?'

'অন্তত সাড়ে পাঁচ শো।'

'আচ্ছা এখন যান, বারোটার সময় আপনার আপিসে টাকা পোঁছে দেবো।'

রমেশবাবু ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলেন। সুরসুন্দরী রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'যন্ত্রনা, এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না। মরতে দেবে না আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে, ফাঁদ পেতেছে সব।'

বললাম, 'সব ঝেড়ে ফেলে তুমি ত চ'লে যেতে পারো?'

'কোথায় যাবো?'

'এই ধরো মহিমবাবু বলছিলেন, যদি আলমোড়ায় তুমি যাও…আগে না বাঁচলে কে করবে কাজ?'

'আমি যাবো আলমোড়ায়, চ'লে যাবো আমার বাংলাদেশ ছেড়ে?'—বলতে বলতে বলতে সুরসুন্দরীর গলার আওয়াজ ভারি হয়ে এলো,—'বাবা জানেন না, কিন্তু তুমি তো জানো কেন আমার যাবার উপায় নেই?'—গলার ভিতর ঠেলে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে হাত ধরলাম, কিন্তু কাসতে কাসতে তার মুখ চোখ রাঙা—রক্তের মতো হয়ে এলো।

'যারা আপন, যারা আত্মীয়, বুকের রক্ত দিয়ে যাদের গ'ড়ে তুলেছি তাদেরই পায়ের কাছে এই বাংলার মাটিতে মাথা রেখে আমি মরতে চাই, সতীশ!'—আবার কাসি, এবং কাসতে কাসতে হঠাৎ মৃত্যুর মতোই এক ঝলক রক্ত তার মুখ দিয়ে উঠে এলো। পিক্‌দানীটা ধরলাম।

'আমি যাই, আবার ডাক্তারবাবুকে খবর দিই গে। না না, বারণ ক'রো না—ছাড়ো।'

আমার জামার খুঁটটা ধ'রে রইল। বললে, 'যেয়ো ডাক্তারের কাছে যখন আমি বলব। সতীশ, টাকা দেবে ত রমেশবাবুকে?'

'দেবো, দেবো। তুমি একটু সুস্থ হও।'

স্তিমিত হয়ে সুরসুন্দরী চোখ বুজলো। চোখ বুজে বললে, 'তুমি ছাড়া উপায় বেই। এখুনি টাকা দিয়ে এসো গে।'

কাজ করবার সখ ছিল ছোটবেলা থেকে'—সুরসুন্দরী সেদিন অপরাহ্নে জানলার ধারে ব'সে বলছিল,—'যাদের নিয়ে নেমেছিলুম কাজে, তারাই আজ আমায় বেঁধেছে।'

'যে কাজ তোমাকে মানায় না, সেই কাজ করেছ তুমি এতাবৎকাল, তাই এমন শোচনীয়—'

'থামো তুমি, সতীশ, নিষ্কর্মার মুখে শুনতে চাইনে সমালোচনা। আমি সব ত্যাগ করব, তোমাদের মুখ আর আমি দেখতে চাইনে। আমাকে এবার ছুটি দাও।'

'বললাম, 'ছুটি দেবে কে? এদের উপায় কি হবে, তুমি ছাড়লে?'

সুরসুন্দরী বললে, 'কাদের উপায়?'

'ওই যারা তোমার আশ্রিত? যাদের নামিয়ে দিয়েছ রাজনীতির স্রোতে, যারা গেছে তোমার নাম নিয়ে সমাজ-সেবায়, তোমার অন্নে যারা প্রতিপালিত, তোমার কারখানায় যারা কাজ করে?'

'আমি যে আর পারছিনে ?'

'না পারলে চলবে কেন ? নিজের মৃত্যুর ভয়ে এতগুলো লোকের জীবনমরণ সমস্যাকে পায়ে ঠেলতে তুমি পারো না। লোকে বলবে, স্ত্রীলোকের খেয়াল !'

সুরসুন্দরী শীর্ণ হাসি হাসলে। বললে, আমাকে তুমি পরীক্ষা করছ, সতীশ। কিন্তু মন নয়, শরীর ভেঙেছে।'

'বললাম, 'কেউ বিশ্বাস করবে না। বড়লোকের মেয়ে ছিলে, এখন পিতার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করেছ তুমি দেশের কাজে। দেশের কাজ হোক না হোক, ভক্তের দলের স্তুতি পেলে প্রচুর। চেহারায় যথেষ্ট ভোগের ইঙ্গিত। কে বিশ্বাস করবে তোমার শরীরের—'

'আর এই যে রক্তটা ওঠে—?'

'ওটা উপরন্তু, যাকে বললে বদরক্ত। ব্রহ্মচর্য পালন করেছ আজীবন, রক্ত একটু উঠবে বৈ কি।'

'মরবে বলেই বিশ্বাস করি, না মরলেই দুশ্চিন্তা।'

সুরসুন্দরী নিজের মনে বলতে লাগল, 'তোমার কথা আগে থেকে শুনিনি, তাই তোমার অভিমান। কিন্তু—কিন্তু সতীশ, জীবনটা নষ্ট হোলো বলচ, কাজ কি কিছুই হোলো না ?'

বললাম, 'কী কাজ করেছ ? কি সাধ্য তোমার ?'

তার চোখে যেন কেমন একটি করুণ অসহায়তা ফুটে উঠল, কাঁপতে লাগল তার চোখ, মলিন হ'য়ে এলো তার মুখ। বললে, 'মেয়েমানুষ হয়ে আর কতটুকু করতে পারতুম ? তুমি মেরো না সতীশ, বড় লাগে, তুমি আমার সব জানো।'

বললাম, 'জানো তুমি কত বড়ো অপরাধ করেছ ? একজনকে তুমি খুন করেছ, আর নিজে করছ আত্মহত্যা ?'

'চুপ করো সতীশ'—সুরসুন্দরী আমার হাতখানা দুই হাতে চেপে ধরল—'চুপ কর, শুনতে পাবে কেউ, তুমি উত্তেজিত হ'লে আমার শক্তি ফুরিয়ে যায়। দাও, ওষুধটা পেড়ে দাও, খাই ; আনো ফলের রস,—লক্ষ্মীটি তুমি রাগ ক'রে চেচিয়ো না। যাবো আমি আলমোড়ায়, শুনব তোমার কথা।' মিনতিভরা চোখে সে আমার দিকে তাকালো।

আমি উঠে গেলাম। ঔষধ এবং পথ্যের আয়োজনগুলি তার দিকে এগিয়ে দিলাম। আজকে আর সুরসুন্দরীর মুখে কোন প্রতিবাদ নেই। মুখ বুজে ঔষধ এবং আহার্য একে একে খেয়ে নিলেন।

নীচে গোলমাল শোনা গেল, হেমেন্দ্র-মহীতোষের দল এসেছে। আমি দূরে সরে গিয়ে বসলাম। মেয়েদের কলরব শোনা যাচ্ছে, আজ মেয়েদের ভীড় হবে বেশি। সুরসুন্দরীর অসুখের খবর চারিদিকে প্রচারিত হয়ে গেছে।

'কেন আসে ? কে ওদের আসতে বলে ? দিতে পারো না বাধা ?'

'ভালবাসে তাই জন্যেই ত···রাগ করো কেন!'

'একটু একলা থাকার তারও উপায় নাই! তুমি যাও দূর হ'য়ে এখান থেকে, মেয়েদের নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে আড্ডা দাও গে।'

'মহীতোষরা এই ঘরে থাকবে ততক্ষণ?'

জ্বলন্ত চক্ষে সুরসুন্দরী একবার তাকালো। বললে, 'তোমার চেয়ে নোংরা মন আর দুটি নেই জগতে। পোড়ার মুখ তোমার আমাকে যেন আর না দেখতে হয়। স্কাউণ্ড্রেল!'—ব'লে সে বিছানায় উঠে ওপাশ ফিরে নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়ল!

দল-বল নিয়ে সবাই ঘরের দরজায় এসে হাজির। নির্মলদা বললে, 'আরে, এই যে ভক্তবৎসল প্রহ্লাদ, মন্দিরের দ্বারে কি তপস্যায় ব'সে থাকা হয়েছে?'

বললাম, 'তপস্যায় বসেছি এমন সময় এলো দৈত্যকুলের আক্রমণ—'

কুঞ্জবাবু গলা বাড়িয়ে বললেন, 'উনি ঘুমিয়েছেন দেখছি, তা দুর্বলের ঘুমটা ভালো। বুড়ো মানুষ, সন্ধ্যের আগে বাড়ী ঢোকবার সময় ভাবলুম একবার দেখেই যাই। আচ্ছা, আর এক সময় আসব। যে উপকার পেয়েছি ও'র কাছে—'

মহীতোষ আস্তে আস্তে বললে, 'সতীশবাবু আপনি বলবেন যে, আমি এসেছিলুম।'

হেমেন্দ্র ব'লে গেল, 'রাত্রে আর একবার খবর দিয়ে যাবো।'

মেয়েরা কি বলাবলি ক'রে গেল বোঝা গেল না। তাদের ভাষাটা প্রায়ই দুর্বোধ্য।

সবাই যাবার পরে সুরসুন্দরী পাশ ফিরে উঠে বসলো। সন্ধ্যা হ'তে আর দেরি নেই, অস্তসূর্যের রাঙা আলো এসে পড়েছে নারিকেল গাছগুলির শীর্ষে। দূরের মন্দিরে শাঁখঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'এই মাসের শেষে বোধ হয় ছ'মাস পূর্ণ হবে, না সতীশ?'

মুখ তুলে সুরসুন্দরীর দিকে তাকালাম। সে পুনরায় বললে, 'ছ মাস, না সাত মাস? মনে পড়ছে না?'

'কিসের বলো ত?'

'বোকার মত চেয়ে থেকে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ো না। তুমি অতি নীচ। মনে পড়ছে না কা'র কথা বলছি? আমার মুখে কি আর কারো কথা সহ্য হয় না?'

বললাম, 'বলোই না কে তিনি?'

'জানি জানি, আমি তার শত্রুতা করেছি, তাই তুমিও তাকে সহ্যকরতে পারো না। কত অত্যাচার করেছি তার ওপর, কত অপমান আর অন্যায় করেছি তার বিরুদ্ধে—'

এবার বললাম, 'কেন করেছিলে?'

'হার মানাবো ব'লে। ক্ষমতায় ছিলুম অন্ধ, ভাঙতে চেয়েছিলাম পুরুষের আদর্শকে। আমার সব শত্রুতা হাসিমুখে রণেন সহ্য ক'রে গেছে। অত বড় চরিত্র আমি আর দেখিনি।'

'কেন করেছিলে শত্রুতা, সুরসুন্দরী ?'

'বোধ হয় নিজের অহঙ্কারে। সতীশ, তুমি জানো কী দুঃখ পেয়ে সে গেছে : দরিদ্র ছিল, আমি তাকে মেরেছি চারদিক থেকে। শোধ নিলে সে আমার ওপর গুপ্তদলেরা আড্ডায় গিয়ে।'—একটু থেমে সুরসুন্দরী পুনরায় বলতে লাগল, 'পায়ে ধ'রে মিনতি করেছিলুম, নিজেকে স'পে দিতে চাইলুম তার সেবায়, হেসে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। সতীশ, আজকে মরণ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

বললাম, 'রণেনকে তুমি খুন করেছ !'

সে বললে, 'হাঁ, আমিই দায়ী। আমার দলের হেমেন্দ্র-মহীতোষ তার দলের সঙ্গে বাধালো বিবাদ। কেমন ক'রে ফেরাবো এদের। সন্দেহ করবে যে ওর আমার চরিত্র সম্বন্ধে ! বলিষ্ঠ বুকের ছাতি। কী উজ্জ্বল চোখ, কী জ্যোতির্ময় হাসি তার মুখে, কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সর্বাঙ্গ আমার কাঁপতো আলোর শিখার মতন।'

আমার চোখ বাষ্পকুল হয়ে এলো। বললাম, 'তুমি তাকে খুন করেছ সুরসুন্দরী।'

'কী সামান্য আমি তার কাছে, কতটুকু ! সংসারে সে এসেছিল বিরাট প্রতিভা নিয়ে—আমি তার যোগ্য নই !'

বললাম, 'সময় থাকতে তুমি তাকে বিয়ে করতে পারতে। তোমার আশ্রয় পেলে তার জীবন এমন ভাবে নষ্ট হ'তো না।'

সুরসুন্দরী চুপ ক'রে রইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কেমন যেন গভীর কণ্ঠে সুরসুন্দরী বললে, 'অনেক বারণ করেছিলুম, গোপনে গিয়ে তার পায়ে ধ'রে কেঁদেছিলুম—কিন্তু শুনলে না, নিষ্ঠুর সে, ধ্বংসের দিকে গেল ছুটে। আচ্ছা, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হ'লে কি আর ফেরে না, তুমি জানো সতীশ ?'

বললাম, 'না। যদিও বা ফেরে তুমি হয়ত সেদিন আর থাকবে না, সুরসুন্দরী।'

'থাকব না আমি, ঠিক জানো ? ব্যর্থ হয়ে চ'লে যাবো ? দেখা হবে না তার সঙ্গে আর ?'—বলতে বলতে সায়াহ্নের আবছায়া অন্ধকারে তার চোখে অশ্রু টলটল ক'রে উঠল।

বিস্ফোটক

বিয়ের পর নতুন স্ত্রীকে ছেড়ে থাকা কঠিন, এমন কথা কলেজের ছেলেরা বলে। অশোক সবেমাত্র কলেজ ছেড়ে ঢুকেছে চাকরীতে। পরিণয়ের প্রথম অবস্থাটার নেশা কিছু পরিমাণে কাটবার আগেই তাকে দেশত্যাগ করতে হোলো। হেতুটা জীবনসংগ্রাম। বীমা কোম্পানীর কাজ নিয়ে। কিছুকাল তাকে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হোলো—সমস্তদিনের সর্বক্ষণ সে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, দুঃখ, দুর্বিপাক ইত্যাদির সম্বন্ধে স্থানে অস্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালো। কিন্তু একটা কথা সে ভোলেনি, প্রতি একদিন অন্তর স্ত্রীর কাছে একখানা করে চিঠি তার লেখা চাই—এটা তার স্ত্রী প্রণতির অনুরোধ। পুরনো স্বামীরা সম্ভবত এমন অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত না, কারণ স্ত্রীর সঙ্গে অতি-ঘনিষ্ঠতার দরুণ তাদের মনে আসে ঔদাসীন্য এবং স্ত্রীদের আসে অবসাদ ; উভয়েই উভয়ের কাছে কিছুকালের জন্য নিস্তার পেয়ে বাঁচে। যাই হোক আমাদের অশোক আর প্রণতি আজো সে স্তরে এসে পৌঁছয়নি, তাই চিঠি-পত্রে তাদের অতৃপ্তিজনিত প্রচুর কবিত্ব আর উচ্ছ্বাস দেখা যায়। যথেষ্ট রং আর মাদকতায় প্রেমপত্রগুলি জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে।

কিছুকালের পর ভ্রমণ শেষ ক'রে অলোক হেড আপিসে একটা খবর দিয়ে জিনিসপত্র প্যাক করে সোজা কলকাতায় দাদার বাসায় এসে হাজির। দাদা ইতিমধ্যে বাসাটা বদল করেছিলেন, এ বাড়ীতে অশোক এলো এই প্রথম। জীবন-সংগ্রাম কথাটা পিছনে রইল, নতুন ক'রে স্ত্রীকে পেতে কয়েকদিনের জন্য অশোক ঘরে ঢুকল। প্রণতি ঠাট্টা করে হেসে বললে, না থাকলেও জ্বালা, থাকলেও জ্বালা !

দাদা অন্তরালে হাসলেন এবং সম্মুখে এসে বললেন, ছ'মাসে তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ, এবার কিছুদিন বিশ্রাম নাও।

অশোক সবিনয়ে বললে, যে আজ্ঞে।

প্রণতি ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে, বড়ঠাকুর বিশ্রাম নিতে বলেছেন, পরিশ্রম করতে বলেননি মনে রেখো।

অশোক উত্তরে বললে, ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে !

যাই হোক, দীর্ঘকাল বিশ্রাম নেবার পর নেশা কাটিয়ে অশোক জেগে উঠল। চেয়ে দেখল গতমাসে যে তারিখে সে এ বাড়িতে এসেছে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারে সে তারিখটা আজো বদলানো হয়নি। প্রণতি খুসীর হাসি হেসে বললে, বছরটা কাটেনি এই রক্ষে, তুমি একটি আস্ত পাগল।

অশোক মাথা চুলকে উঠে বললে, দাদা, মা ও'রা কিছু মনে করেননি ত?

তুমি ত বিশ্রাম নিচ্ছিলে, এতে মনে করবার কি আছে, শুনি?

অশোক বললে, একটা মাস কোথা দিয়ে কাটল?

প্রণতি হেসে বললে, আমারি কি ছাই মনে আছে!

অশোক তার উত্তরে বললে, সম্পূর্ণ আইনানুগত এবং অহিংস বিশ্রাম, এতে পাঁচজনে ক্ষুণ্ণ হ'লে দুঃখিত হবো। এবার আপাতত একটু ভদ্র হওয়া যাক, কি বলো?

অর্থাৎ, সকালবেলাটা কাটুক কাজকর্মে, দুপুরবেলা ঘুমানো যাক, বিকেলে বেড়াতে বেরোই—তারপর রাত্রে যথারীতি।

রাত্রে কি চাঁদের আলো দেখবে ব'সে ব'সে?

না, জানালাটা বন্ধ ক'রে রাখব। বীমার কাজ নিয়ে বিদেশে যখন ঘুরতুম জোৎস্নাটা লাগত ঘন মদের মতো, এখন চাঁদের আলোটা লাগছে ফিকে। এই মুহূর্তে যদি প্রেমপত্র লিখতে বসি তাহ'লে ভাষায় আর রং ধরাতে পারব না।

প্রণতি বললে, তাহ'লে আবার কিছুকাল কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ক'রে কোনো যোগীর আশ্রমে ঘুরে এসো। বামা ছেড়ে আবার বীমাতেও যেতেও পারো।

অশোক বললে, তার আগে চলো একটু বেড়িয়ে আসি, এমন সুন্দর সন্ধ্যা—

বটে! প্রণতি বললে, স্ত্রীলোককে নিয়ে 'সুন্দর সন্ধ্যায়' বেড়াতে বেরোবার প্রস্তাব? রসের ক্ষেত্রে কিছু রসদ জমা আছে দেখছি। থাক, সন্ন্যাসি হবার চরিত্র তোমার নয়, চলো বেড়াতেই যাওয়া যাক। ঘর থেকে বেরোও, আমি মনের মতন ক'রে প্রসাধন করব।

শহরের পথে মোটর বাসের সুবিধা হয়েছে, অল্প খরচে প্রচুর ভ্রমণ করা যায়। সমস্ত বিকালটা তারা ঘুরলো, গড়ের মাঠে গিয়ে হাওয়া খেলো, কোনো কোনো পথিক-তরুণের দ্বারা অনুসৃত হোলো, এবং তারপর গিয়ে ঢুকল সিনেমায়। সিনেমার থেকে বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল চা খেতে! অবশেষে রাত নটা নাগাৎ প্রণতি বললে, এবারে চলো নতুন জায়গায়।

অশোক বললে, রাত নটার পর আবার নতুন জায়গা?

প্রণতি বললে, এতদিন পরে বেরিয়েছি, ঘরে ফেরার অত তাড়া কেন শুনি? কি মতলব?

অশোক বললে, পুরুষের মন, নীড় বাঁধতে চায়!

নীড় বাঁধতে চায় তরুণরা বিয়ে না হওয়ার ব্যথায়, তুমি চাইছ কেন?

তাহ'লে চলো তোমার পক্ষপুট আশ্রয় করি গে।

প্রণতি করুণ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললে, মতলব তোমার ভালো নয়! হা ভগবান—চলো!

ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে এসে দেখা গেল, স্বদেশী মেলার ভিড়। বাস এসে

দাঁড়ালো। প্রণতি চুপি চুপি বলল, ওগো, চলো না মেলা দেখে যাই ; লক্ষ্মীটি, আবার কবে আসব তারও ত ঠিক নেই !

অশোক বললে, বেশ চলো, তোমাকে খুসী ক'রে বাড়ী নিয়ে যাওয়াই দরকার।

হাসতে হাসতে দুজনে নামল। রাস্তা পার হয়ে টিকিট নিয়ে দুজনে ঢুকল স্বদেশী মেলায়। ভিতরের জনতা কিছু কমেছে, দোকানও দু'চারটে বন্ধ হয়েছে, কিন্তু বেড়িয়ে যাওয়াটা যাদের লক্ষ্য, তারা নিজেদের আনন্দ নিয়েই ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবং আনন্দের চেহারাটা এমন অবস্থায় পরিণত হলো যে, দুজন লোক না এসে পড়লে হয়ত একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বামী-স্ত্রীর ওষ্ঠাধরের স্পর্শ বিনিময় হয়ে যেতো। লোক দেখে তারা সতর্ক হয়ে গেল।

অপ্রতিভ অবস্থাটা কাটিয়ে অশোক বললে, সংযমটা খুব ভালো জিনিস, নয় ?

প্রণতি বললে, সংযম আর বৈরাগ্য ! লোক-দুটোর কাছে ধরা পড়লে কতটা লজ্জা হোতো বলো দেখি ? হয়ত ওরা মনে ক'রে যেতো তুমি চরিত্রহীন এবং আমি পথের একটা—

চলতে চলতে অশোক গভীর চিন্তা করতে লাগল। তারপর এক সময়ে বললে, হৃষিকেশ আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, তিনি আমাদের যে-কাজে নিযুক্ত করেন, আমরা তাই করি। তোমার সঙ্গে আমার যা কিছু অন্যায় আচরণ, এবার থেকে তাঁর নামে স'পে দেবো।

প্রণতি হেসে বললে, থামো, তোমার দুর্নীতির চেয়ে নীতিজ্ঞানটা বেশি বিপজ্জনক। তোমার ঠিক সময়ের চেহারাটা আমি জানি, আমার কাছে ধার্মিকের মুখোস প'রো না।

অতএব অশোক চুপ ক'রে গেল।

রাত দশটার পর তারা চারিদিকে দেখে শুনে বেরোবার উপক্রম করছে, এমন সময়ে প্রণতি ধ'রে বসল, এই ত সাবান রয়েছে এখানে, কিনবে এক বাক্স ?

সাবানের দোকানে মেয়েদের ভিড় বেশি। না কিনলেও তারা নাড়াচাড়া করে, দরদস্তুর করে। প্রণতি তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

ভিড় ক'রে যারা সাবানের আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত তাদের চটুল হাসি আর কথালাপে দোকানটা মুখরিত। তারা যেন নিজেদেরই ছড়িয়ে বিতরণ করছে। প্রসাধন সম্বন্ধে এমন বিচিত্র আলাপ-আলোচনা অশোক আর কখনো শোনেনি। প্রণতি একবার স্বামীর দিকে চেয়ে এক বাক্স সাবান কিনলে।

একটি মেয়ে এদেরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদের এই চটুল চাঞ্চল্যটা পর্যবেক্ষণ করছিল। অত্যন্ত সাদাসিধে তার বেশভূষা, মুখশ্রী শান্ত নির্লিপ্ত, আলাপ ও আচরণে সংযত। মুখখানি তার মাধুর্যে ও নম্রতায় ভরা। সম্ভবত কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। পিছনে একজন হিন্দুস্থানী দারওয়ান মাথায় উর্দি প'রে লাঠি নিয়ে তার অপেক্ষা করছে। প্রণতি তার দিকে সসম্ভ্রমে একবার চেয়ে চলে যাচ্ছিল।

মেয়েটি অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, আজ আপনাকে ভারি সুন্দর মানিয়েছে, প্রণতি দেবী।—অতি পরিচিত বন্ধুর মতো তার কণ্ঠস্বর।

প্রণতি মুখ ফিরিয়ে বললে, আমাকে কি আপনি চেনেন?

চিনি বৈ কি, পাশেই ত থাকি।—ব'লে সে হাসলে।

পাশে? মানে, আমাদের বাড়ীর গায়ে?

মেয়েটি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের উত্তর দিকের বাড়িটার একটা অংশ আমরা ভাড়া নিয়েছি, প্রায় এক মাস হয়ে গেল।

প্রণতি বললে, কই আমি দেখিনি ত আপনাকে?

মেয়েটি বললে, বোধ হয় কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকেন তাই। একদিন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আসবেন, চায়ের নেমন্তন্ন রইল। আমার নাম সরোজিনী। মনে থাকবে ত?

খুব থাকবে। ওগো শোনো, এসো, আলাপ করবে এঁর সঙ্গে—সরোজিনীর সঙ্গে অশোকের আলাপ করিয়ে দিয়ে প্রণতি বললে, ইনি আমার স্বামী অশোক রায়, আর ইনি সরোজিনী দেবী।

অশোক বললে, এত কাছে থাকি অথচ আপনাকে একবারো দেখিনি?

সরোজিনী মৃদু শোভন ভদ্র হাসি হাসল। পরে বললে, খুব কাছে থাকলেও দেখা যায় না অনেক সময়ে।

চোখের কালো তারার ভিতরে মেয়েটির যেন একটি অপরূপ গভীরতা রয়েছে। বয়স আন্দাজ প্রায় পঁচিশ। সিঁথির রেখায় আজো এয়োতির চিহ্ন ওঠেনি। বৈধব্যের কোনো ইঙ্গিত নেই, হাতে মিহি সোনার চুড়ি, পরনে ফরাসডাঙার সাধারণ একখানা সাড়ী, গলায় একখাছি বিছাহার চিক্‌চিক্‌ করছে। রূপের বন্যায় অশোকের চোখ-দুটো যেন ভেসে গেল।

অশোক বললে, একমাস আছেন অথচ···এর নাম কলকাতা শহর, কেউ কারো খোঁজ রাখে না। এ যে আমাদের পক্ষে কতদূর অন্যায় হয়েছে সরোজিনী দেবী··· আপনারা ভাড়া নিয়েছেন ও-বাড়ী কতদিনের জন্য?—যেন রাজ্যের মিষ্টতা পুরুষের কণ্ঠে ফুটে উঠতে লাগল। মাথা হেঁট ক'রে সরোজিনী বললে, লেখাপড়া কিছু হয়নি, তবে থাকতে পারব বেশিদিন এমন মনে হয় না, নানা অসুবিধে আছে।

প্রণতি বললে, নিশ্চয় আমরা যাবো বেড়াতে আপনার কাছে। বাস্তবিক, আপনি যে দয়া করে ডেকে আলাপ করবেন এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এমন মিষ্টি স্বভাব আপনার।—উচ্ছ্বাসের সঙ্গে গিয়ে সে সরোজনীর একখানা হাতই ধ'রে ফেললে।

অশোক বললে, আমার স্ত্রীর সারল্যে আপনাকেও মুগ্ধ হ'তে হবে। নিজের স্ত্রী ব'লে বলছিনে, কিন্তু ওর সঙ্গে যতই আলাপ হবে দেখবেন—

থামো তুমি। প্রণতি তাকে ধমক দিলে। সরোজিনী সস্নেহে দুজনের দিকে একবার চেয়ে বললে, আপনাদের রাত হয়ে যাচ্ছে, আর দাঁড় করিয়ে রাখব না—

অশোক সাগ্রহে বললে, চলুন না, একই ত রাস্তা—

না, আমি একটু অন্য কাজ সেরে যাবো। আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে। আচ্ছা, নমস্কার। ও রামশর—

পিছনে প্রতীক্ষমান দারোয়ান বললে, মাইজি—

বিদায় নিয়ে সরোজিনী চ'লে গেল।

প্রণতি বললে, লজ্জা হয় ওকে দেখলে। সাজগোজ এতটুকু নেই, অথচ কী রূপ! কাপড় পরার ধরণ দেখলে? শরীরের কোথাও কিছু দেখা যায় না, এখনকার মেয়েদের মতন অসভ্যতার ইঙ্গিত করে না।

অশোক কথা বলছে না। প্রণতি পুনরায় বললে, আমার চেয়ে ও অনেক ভালো। সেজেগুজে ওর কাছে দাঁড়াতে কী লজ্জাই আমার করছিল! চেহারার কি শ্রী দেখলে? এর নাম সংযম, দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে। হ্যাঁ গা, তুমি কথা বলছ না কেন?

অশোক চিন্তিত মুখে একটু হাসলে। তার ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে প্রণতি বললে, প্রেমে পড়ে গেলে নাকি?

অনেকটা।

চোখ পাকিয়ে প্রণতি বললে, ওসব দুর্বুদ্ধি ওখানে খাটবে না, প্রেমের ওষুধ আছে ওই রামশরণের ভোজপুরী লাঠিতে, দেখবে মজা।

দুজনে হাসতে হাসতে গিয়ে মোটরবাসে উঠল। আজকে তারা যেন অপত্যাশিত কিছু লাভ করেছে।

পাশের বাড়ীটা বাড়ী। বছর পাঁচেক পূর্বে কে যেন এক জমিদার লাখ তিনেক টাকা খরচ করে এই প্রাসাদটিকে খাড়া করেছেন। ছোট, বড়, মাঝারি, বহু অংশে বিভক্ত। এক একটি অংশ ভাড়া খাটে, যথেষ্ট লাভজনক ব্যবসা। কতগুলো এর প্রবেশপথ, তার আর ঠিকানা নেই। বহুসংখ্যক পরিবার ও লোকজন এই প্রাসাদের অন্ধিতে-সন্ধিতে খণ্ডিত হয়ে বাস করে। এক পরিবার আর এক পরিবারের বিন্দুমাত্রও খোঁজ-খবর রাখে না। সাধারণ সিঁড়িটা ছাড়া কারো সঙ্গে কারো দেখা সাক্ষাৎ হয় না। কিছুদিন পূর্বে এই বিরাট প্রাসাদেরই কোনো অলক্ষ্য অন্দরমহলে একটি গৃহবধূ আত্মহত্যা ক'রে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছিল, পুলিশ না আসা পর্যন্ত এ ঘটনার গন্ধও আশপাশের কোনো লোক বুঝতে পারেনি।

সকাল বেলা উঠে উত্তর দিকের জানালাটা খুলে প্রণতি বোঝাবার চেষ্টা করলে, সরোজিনীর ফ্ল্যাটটা কোন দিকে। কিন্তু জানা গেল না। সমুখের জানলাগুলি

খোলা, এদিকটায় এক মাড়োয়ারি পরিবার থাকে। তাদের পাশে দেবেনবাবুরা। সরোজিনী তাদের কেউ নয়। দক্ষিণদিকের দোতলা ফ্ল্যাটের পশ্চিম দিকটায় হিন্দুস্থানীদের বাসা। তাদের গায়ে রাসবিহারী মোড়ল, চাউল ব্যবসায়ী। নীচের তলায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, এস্ কে দত্ত। তার পাশে পাড়ার ছেলেদের ড্রামাটিক ক্লাব। পূর্বদিকের তিন তলার ফ্ল্যাটে বালক-বালিকার ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, সেখানে জ্ঞানানন্দ সরস্বতী। প্রণতি খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়ে এক সময় জানলা বন্ধ ক'রে দিলে।

কাজের অছিলায় অশোক একবার গেল খোঁজ নিতে। কোন্ দরজায় খোঁজ পাওয়া যায়, ঠিক পাওয়া গেল না। অতএব বড় রাস্তার দিক দিয়ে সে ভিতরে ঢুকল। অন্তত তাঁর ফ্ল্যাটটা একবার দেখেও যাওয়া দরকার, নৈলে সে প্রণতিকে নিয়ে আসবে কেমন ক'রে? কিন্তু এদিক ওদিক চেয়ে তার কিছুই বোধগম্য হোলো না, যেন একটা প্রকাণ্ড গোলকধাঁধাঁ। সিঁড়ি দিয়ে সে উপরে উঠে গেল। সেখান থেকে নানা পথ নানা দিকে চ'লে গেছে। অনেকক্ষণ টহল দিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করলে না। ব্যর্থ হয়ে নীচে নামছে, এমন সময় একটি লোক জিজ্ঞাসা করলে, কাকে খুঁজচেন মশাই?

সরোজিনী দেবীকে।

কার মেয়ে? ফ্ল্যাটের নম্বর কত?

অশোক মুস্কিলে পড়লো। বললে, সেটা ঠিক বলতে পারিনে? তবে—ওই যাঁর দারোয়ান আছে—

লোকটি বললে, দারোয়ানরা ত নীচে থাকে। নীচে গিয়ে খবর নিন। আচ্ছা, দাঁড়ান দাঁড়ান—সরোজিনী বললেন না? আমাদের রাখাল বাবুর মেয়ে?

তা ঠিক বলতে পারিনে, তবে—তিনি আমার স্ত্রীর বন্ধু···খুব সুন্দরী মেয়ে, বড়লোক—

হ্যাঁ,—সবই মিলছে বটে। দাঁড়ান, আমি খবর দিচ্ছি।—ব'লে লোকটি সেখান থেকে চ'লে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে বছর ষোল বয়সের একটি মেয়েকে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে সম্ভবত তার মা। অশোক সলজ্জে স'রে দাঁড়াল। মেয়েটি এসে বলল, কে আপনি?

অশোক বললে, আমি সরোজিনী দেবীকে চাই।

মহিলাটি বললেন, এর নাম সরোজিনী, আমার মেয়ে।

আজ্ঞে না, আপনাদের নয়।—ব'লেই তৎক্ষণাৎ অশোক পিছন ফিরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কানে এসে তার একটা কথা বাজল,—কে একটা লোক এসেছিল মা, আমি মনে করি ধীরেনদা বুঝি।

ভগ্নহৃদয় নিয়ে অশোক বাড়ী ফিরে এলো। এত নিকটে থাকেন তিনি অথচ এতটা চেষ্টা করা গেল—কেমন একটা পরাজয়ের গ্লানি এলো তার মনে। বিকেলবেলা আর একবার চেষ্টা করা যাবে।

কিন্তু বিকেলের চেষ্টাতেও কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। প্রণতি বললে, আমাকে নিয়ে চলো, সব ঘরের ভেতর গিয়ে খুঁজে আসব।

অশোক বললে, অত লোকের ভেতর গিয়ে যাওয়াটা ভালো দেখাবে না।

তবে জানলার কাছে কাছে থাকব। তিনি যখন দেখতে পান তখন আমরা পাবো নিশ্চয়ই।

অশোক নিশ্বাস ফেলে বললে, বোকা বনে গেলুম।

প্রণতি বললে, তোমার অত আগ্রহ দেখানো ভালো নয়। কিছু মনে করতে পারেন তিনি। ইচ্ছে যদি হয় তবে তিনিই খবর পাঠাবেন। অমন মেয়ে কলকাতা শহরে গড়াগড়ি যায়!

অর্থাৎ সে পছন্দ করে না তার স্বামী কোনো মেয়ের সম্বন্ধে এত উদ্বিগ্ন হয়।

অশোক বললে, সে ভালো—বুঝলে? কিছুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। একের গরজে বন্ধুত্ব হয় না। এই বলে সেদিন সে স্নানাহার করতে গেল। তার কণ্ঠস্বরে একথা সে কৌশলে প্রকাশ ক'রে গেল যে, পরনারীর প্রতি অতি-আগ্রহটা অন্যায়।

দুপুরবেলা নীচের ঘরে বসে সে আপিস সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দেখছে একটি ছোকরা এসে দাঁড়াল। একখানা চিঠি অশোকের হাতে দিয়ে বললে, ও-বাড়ী থেকে আসছি, মা পাঠালেন। আপনি কি অশোক বাবু?

হ্যাঁ—ব'লে দ্রুত অশোক চিঠি খুলে পড়ল,—স্নেহের প্রণতি দেবী, বয়সে আপনি আমার ছোট, তুমি বললে ক্ষমা ক'রো। আজকে কোন কাজ নাই, এখন থেকে অপেক্ষায় রইলুম। অশোক বাবুকে নিয়ে চা খেতে এসো ভাই, বিশেষ খুসী হবো। ইতি—তোমাদের সরোজিনী।

উৎসাহ এবং আনন্দ চেপে রেখে অশোক ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি করো ওখানে?

রান্না করি।

আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।—ব'লে সে ভিতরে গেল। উপরে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলে, প্রণতি ঘুমিয়ে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ পুরুষের গোপন দুষ্প্রকৃতি অনুযায়ী তার মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি খেলে গেল। গায়ে একটা পাঞ্জাবী চড়িয়ে চটি জুতোটা পায়ে দিয়ে সে চুপি চুপি নীচে নেমে এলো।

বাইরের দরজায় চাকরটা দাঁড়িয়ে ছিল, অশোক এসে বললে, তোমার মনিব কি করছেন, চলো একবার দেখে আসি। গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ত? কে কে আছেন এখন? তাঁর মা, বাবা, আর কে কে—?

আসুন না আপনি। ব'লে ছোকরাটা সোৎসাহে তাকে নিয়ে চলল।

একতলা, দোতলা, তেতলা, ঘরের পরে দালান আর দালানের পরে ঘর নানাদিকে নানা বাঁক নিয়ে ঘুরে অশোক একটা ছাদের কোলের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। চাকরটা ভিতরে গিয়ে খবর দিলে।

পরমুহূর্তে'ই বেরিয়ে এলো সরোজিনী। অশোক নমস্কার জানিয়ে হাসলে তার চোখে মুখে গভীর অনুরাগ। সরোজিনী বললে, আসুন ভেতরে, এ-ঘরে আপনাকে পাওয়া বিশেষ ভাগ্য!

সে কি কথা, লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে। আমারও এটা গৌরব!

ইত্যাদি, ইত্যাদি—সামাজিক চলতি বুলি।

সরোজিনী বললে, প্রণতি কই?

ওঃ, তাঁর কথা আর বলবেন না। পি পু, না ফি সু। ঘুমকাতুরে মেয়ে পেটে খেনোমদ পড়লে আর রক্ষে নেই, একেবারে কলসীর গায়ে কান জুড়ে দিয়ে চোখ বুজলেন।

তা হ'লে আপনি এসেছেন তাঁকে না জানিয়ে, কেমন?

অশোক হা হা ক'রে হেসে উঠল। বললে, তাঁর সম্পত্তি থাকে লোহার সিন্দুকে, পথে পড়ে থাকলেও ভয় নেই। কিন্তু কই, আপনার এখানে কাউকে দেখছিনে যে?

কা'কে দেখতে চান? সরোজিনী হেসে বললে।

মানে, এই ধরুন আপনাকে একা দেখছি কিনা—ধরুন আপনার আত্মীয়স্বজন, কিম্বা ধরা যাক মা বাবা,—আমি বোধ হয় একটু অনধিকার চর্চা করছি, ক্ষমা করবেন।

সরোজিনী বললে, ঢোঁক গিলচেন তবু আমার স্বামী আছেন কি না এ কথাটা বলতে বাধছে আপনার, এই না? ওসব আমার নেই অশোকবাবু। আর মা বাবা, ভাই বোন? সবাইকে একত্রে চিরকাল দেখা যায় না।

অশোক বললে, বলতে লজ্জা করব না, সেদিন থেকেই আমি আপনার একজন ভক্ত! নেমন্তন্ন ক'রে এনেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি এখানে নেই যে অতি-ভদ্রতার বালাই থাকবে,—যদি বেফাঁস কিছু বলি ক্ষমা করবেন।

বেফাঁসটা সহ্য হবে কিন্তু বেসামাল হ'লে—বলতে বলতে দুজনেই হেসে উঠল।

অশোক বললে, চোখে মুখে আপনার বুদ্ধির দীপ্তি, কিন্তু আপনার মতো এত রূপ আমি জীবনে দেখিনি; আপনি নিশ্চয় কোন রাজা-রাজড়ার ঘরের মেয়ে; আপনার সব পরিচয় আমি আজ নিয়ে তবে উঠব।

সরোজিনী বললে, বটে, আচ্ছা সঠিক পরিচয়ই দেওয়া যাবে, এখন বসুন। আপনি সিগারেট খান? আনিয়ে দেবো?

না, ধন্যবাদ।

সরোজিনী পুনরায় বললে, আমার পরিচয় পাবার আগে আপনার সঠিক পরিচয় দিন শুনি। বাস্তবিক, ছাদের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে আপনাদের ঘরের দিকে চোখ প'ড়ে যেতো। স্বামী আর স্ত্রী আপনারা,—দেখতে এত ভালো লাগত? হিংসে হোতো মনে মনে।—বলতে বলতে হেসে সে ঘরখানাকে মুখরিত ক'রে তুললে।

অশোক একেবারে লজ্জায় লাল। তার নিজের ব্যবহারের নানা চিত্র মনে পড়তে লাগল। ছি ছি!

সরোজিনী আবার বললে, একদিন একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি—চিঠিখানা আপনার স্ত্রীর নামে—দেখি আমার কাছে ভুল করে এসেছে। জানা গেল আপনাদের নাম অশোক আর প্রণতি। স্ত্রী নিশ্চয় আপনার খুব প্রিয়, না অশোকবাবু।

ফস্ ক'রে অশোক ব'লে ফেললে, প্রিয় না হয়ে আর উপায় কি আছে বলুন, বিয়ে ক'রে আনা হয়েছে। তবে কি জানেন, সেই গড়পড়তা মেয়ে! এরা আনন্দই দেয়, আলো দেয় না। এদেশের ছেলেরা বিয়ের পরেই তা ভাঙে। আমাদের কতদিনের আকাঙ্ক্ষা যে চাপা থাকে তা যদি জানতেন···এর চেয়ে বেশী আপনাকে বলাই বাহুল্য!

সরোজিনী উৎকর্ণ হয়ে শুনলে তার সব কথা। শুধু শুনলে না, চেয়েও দেখলে। দেখলে, এই ছেলেটির মুখে চোখে যে দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠেছে, তা শ্রদ্ধাও নয়, সম্মানও নয়—সে শুধু বাসনার উত্তাপ, অদ্ভুত আকর্ষণের চেহারা। সরোজিনী একটু বিপন্ন বোধ ক'রে বললে, এইবার আপনার স্ত্রীকে ডাকতে পাঠাই, কেমন? এতক্ষণে নিশ্চয় তাঁর ঘুম ভেঙেছে।

অশোক বললে, বাস্তবিক এত কাছে আপনি আছেন এ যদি জানতুম যেমন ক'রে হোক আলাপ করা যেতো। সেদিন আপনি ডেকে আলাপ করলেন, অবাক হ'য়ে গেলুম।

স্ত্রীকে এখানে আনার কথাটা সে এড়িয়ে গেল। অর্থাৎ এই কথাটা বোঝ যাচ্ছে, একা বসে গল্পগুজব করতেই সে চায়, স্ত্রীর উপস্থিতি পছন্দ করছে না। সরোজিনী মনে মনে কৌতুক বোধ করলে। পুরুষের প্রকৃত চেহারা অনেকটা বোধ হয় এই রকম।

এমন সময় বাইরে থেকে তার ডাক পড়ল। ছোকরা চাকরটা খবর দিতেই সে গেল বেরিয়ে। অশেকে চুপ ক'রে ব'সে রইল বটে কিন্তু বুকের ভেতরটা তার ধক্ ধক্ করছে। তার মতো অল্পবয়স্ক যুবক যদি বুঝতে পারে, বেফাঁস কথা বলার পরও অমুক সুন্দরী মেয়েটি বিরূপ হচ্ছে না, বরং উপভোগই করছে, তবে প্রশ্রয়ের আনন্দে যুবকের বুকের রক্ত তোলপাড় করবে না কেন? থাক না স্ত্রী, থাক না নীতিজ্ঞান,—তার পরেও কি পুরুষের পক্ষে আর কোনো কথা নেই?

বাইরে থেকে হঠাৎ রূঢ় আলোচনার আওয়াজ তার কানে এলো। সরোজিনীর শান্ত নম্র কণ্ঠের পাশে কোনো এক পুরুষের চাপা কর্কশ তিরস্কার বেশ শোনা যাচ্ছে। ব্যাপারটা বোঝা গেল না কিন্তু অশোক উদ্বিগ্ন হ'লো। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না বটে, বক্তব্যটাও কিছু দুর্বোধ্য, কিন্তু কেউ এসে যে তার এই কল্পকন্যার প্রতি আপত্তিকর আচরণ ক'রে যাবে এ তার সইবে না। এই লাবণ্য আর এই রূপের প্রতি মানুষ নিষ্ঠুর হয় ?

তারপরে কিছুক্ষণ চুপচাপ। অশোক কান খাড়া ক'রে রইল। লোকটা কি চায়, বচসার কারণই বা কি, তিরস্কারেরই বা অর্থ কোথায়—সব কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু এ কথাটা সে সমস্ত মন দিয়ে ভাবতে লাগলো, এমন যে মেয়ে, তার মাথার উপর কেউ নেই। না রক্ষক, না সাহায্যকারী, না কোনো পরামর্শদাতা! অশোক অবাক হয়ে গেল। মনে হলো সমস্তটাই যেন কঠিন রহস্য-ভরা।

কিছুক্ষণ পরে সরোজিনী ফিরে এলো। কেমন যেন ম্লান হেসে বললে, অনেকক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রেখেছি…এক এক সময়ে নানা ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়।

অশোক বললে, গোলমাল শোনা যাচ্ছিল, উনি কে এসেছিলেন বলুন ত ?

উনি হচ্ছেন এ বাড়ীর মালিক।

ওঃ বুঝতে পেরেছি এবার, বাড়ীর ভাড়া পাওনা আছে বুঝি ? বাস্তবিক আজকালকার বাড়ীওয়ালারা ভয়ানক—

সরোজিনী বললে, না, ইনি তেমন নয়। লোকটাকে ভালই বলতে হয়। আগাম একমাসের ভাড়া দিয়েছিলাম, উনি সেটা ফেরত দিতে এসেছিলেন।

অশোক বললে, ফেরৎ দিতে কেন ?

সরোজিনী একবার ঘরের ভিতরে পায়চারি ক'রে নিলে। ওটা এটা একবার নাড়াচাড়া ক'রে বললে, সামান্য কারণ। এ বাড়ীতে আর আমার থাকা হবে না অশোকবাবু।

কণ্ঠস্বর তার করুণ। অশোক বললে, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি বলুন ত ?

সারোজিনী হঠাৎ বললে, চা খেয়ে আমাকে বাধিত করতে পারেন। ওরে অমূল্য, চা হয়েছে ?

হয়েছে মা, নিয়ে যাচ্ছি,—বাইরে থেকে সাড়া এলো।

অশোক বললে, এ বাড়ী যদি ছেড়ে দিতেই হয় তবে আমি বাড়ী খুঁজে দেবো আপনার জন্য। কলকাতা শহরে কি বাড়ীর অভাব ? কিন্তু একটা কথা—

অমূল্য চা খাবার নিয়ে এলো। অশোক পুনরায় বললে, আপনার সঙ্গে আত্মীয়েরা যদি থাকেন তবে সুবিধে হয়, আপনি একা থাকেন কিনা তাই লোকে—

সরোজিনী হাসি মুখে বললে, আচ্ছা, এবার আপনি খেতে আরম্ভ করুন। যেখানে হোক এক জায়গায় থাকতে পাবোই—এত বড় পৃথিবীতে—

চা খেতে খেতে অশোক বললে, সে হবে না, আপনার কিছু কাজের ভার আমি নেবোই। এতে আমার আনন্দ। পৃথিবী অনেক বড় তা জানি, আপনি বড় লোক, টাকার বদলে সবই পাবেন তাও জানি, তবু আমাকে এ গৌরব থেকে বঞ্চিত করবেন না।

বিবাহিত লোকের পক্ষে এমন কথা বলা উচিত নয়, অশোকবাবু। আপনার স্ত্রী এতে ক্ষুন্ন হ'তে পারেন। ব'লে সরোজিনী আবার হাসতে লাগল।

মানলুম আপনার কথা। তা বলে কি বিবাহিত লোকের বাইরে আর কোনো কর্তব্য থাকবে না? স্ত্রীর পায়ে কি তাদের মনুষ্যত্ব শৃঙ্খলিত থাকবে? বিবাহ মানে কি উদারতার অপমৃত্যু?—লুব্ধ ব্যকুল উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অশোক এই একাকিনী রমণীর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

এমন সময় আবার অমূল্য এসে দাঁড়ালো। সরোজিনী বললে, আঃ, একটু দাঁড়াতে বল্ না অমূল্য, আসছি আমি। আপনাকে এবার বিদায় দেবো অশোকবাবু—দেখছেন ত, বাড়ীওয়ালা বড়ই অধীর হয়ে উঠেছেন, ও'র নালিশের আর শেষ নেই।

অশোক বললে, ও'রা কি চান আজকেই আপনি এ বাড়ী ছেড়ে দেন?

হ্যাঁ অনেকটা তাই। অতটা বুঝতে পারিনি—ব'লে সরোজিনী ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো। বললে, আপনার সামনেই যে ওরা এতটা বাড়াবাড়ি করবে···অপমান আর লজ্জায় আমার মাথা হেঁট ক'রে দেবে,—অমূল্য, ডাকতো বাবা রামশরণকে—

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে বললে, কি হোলো আপনার সরোজিনী দেবী?

অধীর কণ্ঠে সরোজিনী বললে, কিছু না, এ তো অতি সামান্য। আচ্ছা, এবার তাহ'লে আপনাকে যেতে হবে অশোকবাবু! হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে ব'লে রাখি, স্ত্রীর সম্বন্ধে আপনি আর একটু খাঁটি থাকবেন, অন্যকে ফাঁকি দিলে নিজেকেই এক সময়ম ফাঁকিতে পড়তে হয় অশোকবাবু।

তার মুখের দিকে চেয়ে দেখা গেল, এই রহস্যময়ীর চোখে অশ্রু ভ'রে এসেছে। তার কারণ নেই, তার কৈফিয়ৎ নেই। অশোক বললে, কি বলছেন আপনি সরোজিন দেবী?

হঠাৎ সরোজিনীর কণ্ঠ বিদীর্ণ হয়ে উঠলো। অস্বাভাবিক কণ্ঠে আরক্ত চক্ষে সে ব'লে উঠলো, অতি নির্বোধ আপনি, লোভের বশীভূত হয়ে দেখতে পাচ্ছেন না যে কোথায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। ইতি-মধ্যেই কি বিদায় নেওয়া আপনার উচিত হয়নি? আমার অপমানটা কি নিজের চোখে দেখে যেতে এতই সাধ?—বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত কান্নায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো।

মাথা হেঁট ক'রে অশোক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। দ্রুতপদে বারান্দার মহলগুলো পার হ'য়ে সে নীচের সিঁড়িতে নামবে,—দেখা গেল রামশরণ আর অমূল্যকে সঙ্গে নিয়ে জনচারেক ভদ্রলোক উপরে উঠছেন। তাঁদের মধ্যে একজন আর একজনকে বললেন, কস্তুরীর গন্ধ কত দিন চেপে রাখা যায় হে ?

একজন বললেন, সিনেমার য়্যাক্‌ট্রেস্‌ বলছিলে না ?

হ্যাঁ, ওইতো পয়সা ক'রে আজকাল ভদ্রপল্লীতে থাকবার চেষ্টা করছে। চেহারাটা ভালো কিনা তাই ধরবার যো নেই। সম্ভ্রান্তবংশের মেয়ে হে,—কিন্তু বুঝলে কিনা, চরিত্র মন্দ হ'লে—হেঁ হেঁ—

অবচেতন পদক্ষেপে অশোক ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নেমে গেল।

ঐশ্বর্য

নিমন্ত্রণ যাবার আয়োজন চলেছে। শরদিন্দু অফিস থেকে এসেছে সকাল-সকাল। তার স্ত্রী মিনু এর মধ্যে বাসন মাজা, ঘর ধোয়া ইত্যাদি বিকেলবেলার পাট সেরে স্বামীর জন্য চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখেছে। অনেক দিন আগেকার কেনা সেই চন্দন সাবানখানা আজ ব্যবহার করা গেল। স্বামীর জন্য মিনু বার করে রাখল বিয়ের সময়কার শিমলের ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবীটি।

'হ্যাঁ, গো শুনছো? সেই যে সোনার মাথার কাঁটা কিনে দিয়েছিলে খোকা হবার পর, মনে আছে ত? মাথায় গেঁথে নেবো, সেই কাঁটা দুটো?—স্বামীর মুখের কাছে মুখ এনে মিনু প্রশ্ন করলে।

শরদিন্দু বললে, 'নিশ্চয়। বড় লোকের বাড়ীতে নেমন্তন্ন, যা কিছু পোযাকী সব আজ প'রে যেতে হবে, বুঝতে পেরেছ? কাঁটা ক্লিপ চিরুণী টায়রা—মায় ঝাপটা পর্যন্ত—'

'আহা অত ক'রে আর ঠাট্টা করতে হবে না। মাথায় গয়না অত, আর হাতে পরব কি?'—মিনু কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, 'খোকার অসুখে সেই যে চুড়ি চারগাছা বাঁধা পড়ল, সে আর আজ পর্যন্ত...এবার পুজোয় কিন্তু খালাস ক'রে দিতেই হ'বে, ব'লে রাখলুম!—ব'লে মিনু স্বামীর জন্য পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলো।

'অবশ্য দেবো, এ তো সামান্য কথা! এবার একমাসের মাইনে বোনাস পাবো তা খেয়াল রেখেছ কাপড় জামা চুড়ি তাগা নেকলেস— কোমরের একগাছা চন্দ্রহার—'

'ওমা, আমাকে খোঁটা দেওয়া, কেমন? আমি বুঝি চেয়েছি কিছু? নাই বা পরলুম চুড়ি,—তোমারই জন্যে বলি গো, সময়ে অসময়ে সোনা ঘরে থাকলে,—হ্যাঁ গা, একটা কথা আমাকে বলবে?'—ব'লে সে চায়ের পেয়ালাটা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে পাশে দাঁড়ালো।

শরদিন্দু বললে, 'কি বলো তো?

'ঠিক বলতে হবে কিন্তু।

'তোমার ভূমিকা শুনে মনে হচ্ছে কথাটা অত্যন্ত বাজে!' ব'লে শরদিন্দু হাসলে।

মিনু ঢোঁক গিলে মুখ উজ্জ্বল ক'রে বললে, 'এত বড় লোকের সঙ্গে তোমার কেমন ক'রে ভাব হোলো গো?'

উচ্চকণ্ঠে শরদিন্দু হেসে উঠল, 'কী পাগল তুমি! এক সঙ্গে যে পড়েছিলুম আমরা। রণেন গেল ব্যারিষ্টার হ'তে বিলেতে, আর আমার ভাগ্যে জুটল কেরানীগিরি। আমরা দুজনে একই ঝাড়ের বাঁশ।'

'তুমি তা'হলে ভালো জায়গায় পড়তে বলো? নইলে অমন ছেলের সঙ্গে ভাব হয়? ওরা সব হীরের টুকরো!'

'কী পাগল তুমি।'—শরদিন্দু বললে, 'আমার ওপর কি তোমার কোনো রকম শ্রদ্ধাই নেই? আরে আমি যে একটা অন্তত বি-এ পাশ-করা কেরানী এ তো তুমি জানো? নাঃ, বিদ্বান ব্যক্তি গরীব হলে স্ত্রীর কাছেও আদর কম।'

'ওমা, ও কি কথা? আমি কি তাই বললুম?' ব'লে মিনু স্বামীর গায়ে গা ঠেকিয়ে অতি যত্নে তার মাথার চুলগুলি গুছিয়ে দিতে লাগল।

'আর শোনো, অনেক লোক জমায়েৎ হবে, তুমি সেই ফিরোজা রংয়ের মাদ্রাজী সাড়ীটা আজ পোরো, কেমন?'

মিনু বললে, 'আহা আমাকে আবার শেখানো হচ্ছে। তাই পরবো গো পরবো; তোমার পছন্দতেই আমার পছন্দ। তোমাকে কিন্তু আজ সেই চুণী বসানো আংটটা পরতে হবে, তা ব'লে রাখলুম।'

শরদিন্দু বললে, 'কিন্তু গরদের পাঞ্জাবী আমি আজ পরবো না মিনু, লক্ষ্মীটি।'

'পরবে না? মাথা খুঁড়বো কিন্তু। আমি আজ তিন দিন থেকে আশা করে আছি তুমি ওটা পরবে। ওটাতে কী চমৎকার দেখায় তোমাকে, যেন শিবের জটায় গঙ্গা নেমেছে।'

'ওরে বাবা, অবাক কল্লে! এত শিখলে কোথা মিনু? আচ্ছা, ওটাই পরবো। পায়ে কি দেবো, সেই বর্মি' শিলপারটা?'

'রাম বলো! সেই পামশুটা ঝেড়ে মুছে রাখলুম কি জন্যে তবে। একটারও ফিতে ছিল না, মুচি ডাকিয়ে সেলাই ক'রে রাখলুম।'

'কি লক্ষ্মী মেয়ে তুমি মিনু।' ব'লে শরদিন্দু স্ত্রীকে একটু আদর করলে।

খোকা রইল ঠাকুমার কাছে। অনেকদিন পরে আজ মিনু বেরুলো পথে। পথে না বেরুলে মনেই হয় না যে সে শহরে আছে। কী ঘিঞ্জী গলিতেই তাদের বাড়ী। স্বামীর চাকরির কিছু উন্নতির আশা হয়েছে, আর বছরখানেক পরে সে নিশ্চয়ই গিয়ে থাকবে ও'দিকে। ভবানীপুর সম্বন্ধে তার একটি অদ্ভুত উজ্জ্বল কল্পনা আছে।

'হ্যাঁ গা, গিয়ে দাঁড়ালে আমাদের তারা চিনতে পারবে ত? শুনেছি বড়লোকেরা কখনো চেনেনা কখনো ফিরেও তাকায় না।'

'কী আশ্চর্য মিনু, তুমি ভারি ছেলেমানুষ। পথে আমাকে দেখতে পেয়ে রণেন মোটর থেকে নেমে নেমন্তন্ন ক'রেছে, তা জানো? আমাদের মধ্যে দারুণ ভাব ছিল, লুকিয়ে দুজনে প্রথম সিগারেট টানতে শিখি,—এই ক'বছর কেবল

দেখাশোনা নেই। রণেনটা একেবারে সায়েব ব'নে গেছে। বিলেতে গিয়ে কী করেছিল জানো?'

মিনু তার মুখের দিকে তাকালো। শরদিন্দু চুপি চুপি বললে, 'একটা মেম সাহেবের প্রেমে প'ড়ে গিয়েছিল, মাইরি!'

'মেম সায়েব? তারা বুঝি প্রেমে পড়ে? তুমি যেন কোনো দিন সাহেবদের পাড়ায় যেয়ো না।'—ব'লে মিনু আস্তে আস্তে স্বামীর হাত চেপে ধরল।

'নাঃ, তুমি একেবারে অজ পাড়াগেঁয়ে। ওগো, মেম সায়েবরা ভালবাসলে কি হয় জানো?'

'কি হয়?'—সরল দৃষ্টিতে মিনু স্বামীর দিকে তাকালো।

'এই ধরো যার বিয়ে হয়েছে, একটা মেম যদি সেই ছেলেকে ভালেবাসে, তা'হলে ছেলেটার স্বাস্থ্য ফিরে যায়, বাঁচে অনেকদিন, লটারির টাকা পায়।'

'তাই না কি? হ্যাঁ গা, তোমাকে একটা কোনো মেম ভালোবাসে না?'

'খুব ভালোবাসতে পারে। তবে কি জানো, ভালোবাসাবাসি হ'লে ছেলেরা কিন্তু স্ত্রীদের একেবারে ভুলে যায়।'

'ওমা, সে কি কথা! অমন অলুক্ষুণে লটারি আর স্বাস্থ্যে আমার কাজ নেই। আমার হাতের নোয়া বজায় থাকুক, অমন প্রেমের কপালে আগুন!'

শরদিন্দু দুষ্টামির হাসি হাসতে লাগল।

বাস থেকে নেমে একটা পার্ক পার হয়ে যেতে হয়। এপার থেকেই দেখা যাচ্ছে ওপারের কোনো বাড়ীটায় আজ উৎসব। মিনু বললে,'ছেলের ভাত দিতে গিয়ে এত ঘটা কেউ করে?'

শরদিন্দু বললে, 'ওরা যে বড়লোক।'

'বিলিয়ে দিক না টাকা, গরীব দুঃখী খেয়ে বাঁচুক।'

'গরীব দুঃখীকে খাওয়াতে ত আর ওরা পৃথিবীতে আসেনি।'

মিনু পথের মাঝখানেই স্বামীর কথার প্রতিবাদ জানালে, 'ওমা সে কি কথা গো, বড় গাছেই ত ঝড় লাগে। বড়লোকদের তুমি বুঝি মানুষ ব'লে ঠাওরাও না?'

শরদিন্দু বললে, 'কি জানি মিনু, আমরা ত গরীব,—আদার ব্যাপারি।'

গেটের কাছে এসে স্বামী-স্ত্রীতে দাঁড়ালো। এ বাড়ী দুজনেরই অপরিচিত। সামনে বাগানে, মাঝখানে রাঙা সুরকির পথ, দুধারে দুটো ফোয়ারা। উপরের গাড়ী-বারান্দার ধার থেকে দূর অন্দরমহল পর্যন্ত আলোর রাশি ঝলমল করছে। নানা দিকে নানা লোকজনের দ্রুত আনাগোনা। দ'জনে সন্তর্পণে গিয়ে ঢুকল। মিনু এক সময় চুপি চুপি বললে, 'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারব না বাপু, যেন দম আটকায়।'

শরদন্দু বললে, 'বেফাঁস ব'লো না মিনু। এসো।'

'হ্যাল-লো শরদিন্দু—? আরে বৌদিদি, আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার। আসুন ওপরে নিয়ে যাই। শরৎ, তুই একটু দেরি ক'রে ফেলেচিস ভাই।'

শরদিন্দু বললে, 'খাবার কি ফুরিয়ে গেছে ?'

'কী পাজি তুই, গাধা, রাস্কেল ! বৌদিদি আপনার দেবতাটিকে গাল দিচ্ছি, কিছু মনে করবেন না যেন। বাস্তবিক, আপনি ত বড় কাহিল ?'

মিনু হেসে স্বামীর পাশে দাঁড়ালো। শরদিন্দু বললে, 'এই আমার বন্ধু শ্রীমান্ রণের চ্যাটার্জি দি গ্রেট, তারপর ? শ্রীমতী কোন্ রহস্যপুরীতে ?'

'এই যে ওপরে এলেই দেখা মিলবে। আসুন বৌদিদি, আপনার বড় কষ্ট হলো।

'কষ্ট ত হয় নি।' মিনু সহজ কণ্ঠে ব'লে ফেললে।

'হোলো বৈকি, এতটা রাস্তা এলেন।'

'ওমা বেশ ত এলুম বেড়াতে বেড়াতে !'

শরদিন্দু স্ত্রীর হাতে একটা চিমটি কেটে নিষেধ জানালে। মাত্র সামাজিক সৌজন্য, সেখানে বাদ-প্রতিবাদ নেই। দ্রুতপদে রণেন হাসতে হাসতে উপরে উঠে এলো। শরদিন্দু বললে, 'ভাই, আমাদের একটা নিরিবিলি ঘরে বসতে দাও, ভিড়ের মধ্যে আমার স্ত্রীর বিশেষ লজ্জা করবে।'

'বেশ বেশ, তাই এসো।' ব'লে দু-তিনটে বারান্দা পার হয়ে ছোট একটা ঘরে ঢুকে রণেন বললে, 'টেবল সাজানো আছে, বিছানা পাতা, এইখানে ব'সো। এটা আমার প্রাইভেট। আচ্ছা বৌদিদি, আমার স্ত্রীকে এবার ডেকে আনি।'

মাথার উপর বোঁ বোঁ ক'রে ইলেকটিক পাখা ঘুরছে। বাতাসটা লাগছে মধুর। খুসী হয়ে মিনু বললে, 'হ্যাগা, একটু হাত পা ছড়িয়ে বসবো ? চমৎকার হাওয়া)'

'সত্যি মিনু এমন ঘরে দু-চারদিন থাকতে পারলে বেশ হোতো নয় ?'

মিনুর বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না, বললে, বডড আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়। এ আমাদের পোষায় না।'

শরদিন্দু বললে, 'একটু ব'সো তুমি এখানে, ঘুরে ফিরে ওদিক থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।'

'ওমা না' সে আমি পারব না। উটকো জায়গা, ভয় করবে বাপু।' ব'লে মিনু স্বামীর হাতটা আঁকড়ে ধরল।

এমন সময় স্বামী-স্ত্রীতে এসে দাঁড়ালো। রণেনের কোলে একটি ছোট ছেলে। শরদিন্দু হেসে ছেলেটিকে কোলে টেনে নিল। রণেন স্ত্রীর সঙ্গে তাদের পরিচয় ক'রে দিয়ে বলল। এ'র নাম সুচিত্রা দেবী।'

শরদিন্দু বললে, 'ও'র নাম মিনু। আমার পায়ের বেড়ী।'

সুচিত্রা গিয়ে মিনুর হাত ধরলে। মিনু তাকালো তার মুখের দিকে। যেমন রূপ, তেমনি লাবণ্য। পোষাক-পরিচ্ছদের কোথাও আড়ম্বর নেই, সাদাসিধে একখানা সাড়ী, চোখের মধ্যে শান্তশ্রী। মিনু বললে, 'ছেলের নাম কি রাখলেন ?'

সুচিত্রা বললে, 'ওর নাম সলিলকুমার।'

রণেন প্রতিবাদ ক'রে বললে, 'না বৌদিদি, ওর নাম হচ্ছে বারিদবরণ !'

সুচিত্রার মুখের হাসি গেল মিলিয়ে, মুখখানা কেমন ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল, বললে, 'না শরদিন্দুবাবু, ছেলের নাম সলিলকুমার।'

রণেন বললে, 'I refuse to accept.'

উত্তরে মিনুর হাত ধ'রে একটু এগিয়ে গিয়ে সুচিত্রা দসলে, 'I care a little.'

মিনু তাকালো শরদিন্দুর দিকে, আর শরদিন্দু নির্বোধ দৃষ্টিতে একবার রণেন ও একবার সুচিত্রার দিকে তাকাতে লাগল। দুজনের কথাবার্তার ভিতরে কোথায় যেন একটা জ্বালা আছে। কেউ কারুকে পথ ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজি নয়। রণেন কি একটু কাজের ছুতো ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেল।

মিনু একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। সুচিত্রা বললে, 'মিনুদিদি, তোমার ক'টি ছেলেপুলে ভাই?'

মিনু এতক্ষণে একটু সাহস পেয়ে হেসে বললে, 'ওই একটি ছেলে, বছর দেড়েকের হ'লো। উনি নাম রেখিছেন হেমন্ত। কেমন, ভালো নাম নয় সুচিত্রাদিদি?'

'বেশ নাম। কী সুন্দর মুখখানি তোমার মিনুদিদি! শরদিন্দুবাবু মিনুদিদিকে মাঝে মাঝে এখানে আনবেন ত?'

শরদিন্দু বললে, 'নিশ্চয় আনব।'—এই ব'লে সে সলিলকুমার ওরফে বারিদবরণকে আদর করতে লাগল।

এইবার মিনু ছেলেটিকে কোলে নিলে। আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে তাকে চুম্বন ক'রে বললে, 'কি চমৎকার ছেলে, যেন মোমের পুতুল। সুখের ঘরেই রূপের বাসা। একটা ঝুমঝুমিও তুমি এর জন্যে আনতে পারলে না গা?'

শরদিন্দু হেসে বললে, 'তা'তে আমার লজ্জা নেই, এমন ছেলেকে যা দিতে যাবো তাই হবে ম্লান! কি বলেন বৌদিদি?'

সুচিত্রা হাসল। সে হাসি যেন নীরস। সে হাসিতে দুঃখের চেয়ে বেদনার ছায়াটাই যেন ঘন। এত একটা আনন্দময় উৎসবের সঙ্গে তার যেন প্রাণের যোগ নেই। মুখ তুলে চেয়ে সে কেবল বললে, ম্লান কেন হবে, আপনি তাই দেবেন। মিনুদিদি, তোমার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাবে না ভাই?'

'আমাদের বাড়ীতে?'—ব'লে মিনু একবার স্বামীর দিকে তাকালো। বললে, 'কথা শোনো সুচিত্রাদিদির, সেখানে নিয়ে গিয়ে বড়লোকের বউকে বসাবো কোথায়? ওইটুকু ত জায়গা। না ভাই, সে আমার বড় লজ্জা করবে। তার চেয়ে আমরা যখন ভবানীপুরে যাবো—'

এমন সময় ঘুরে এলো রণেন, তার সঙ্গে দুটি চাকর। তাদের হাতে ট্রের উপর নানাবিধ খাদ্য-আয়োজন। লোক দুটি ভিতরে ঢুকে দুখানা টেবল সাজালো।

রণেন বললে, 'বাইরের দিকে বড় ভিড়, এইখানেই গল্প করতে করতে খাওয়া যাক. কি বলুন বৌদি ?'

মিনু ঘাড় নেড়ে হাসল। কিন্তু চোখে তার বিস্ময় দেখা গেল। স্ত্রী রইলেন বসে, আর স্বামী ছুটোছুটি করছেন অতিথি-ভোজনের তত্ত্বাবধানে ? এ একটা ভয়ানক অস্বাভাবিক ব্যবস্থা। লজ্জায় মিনুর মুখ পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। শরদিন্দু স্ত্রীর মনের কথা জানে, সুতরাং অলক্ষ্যে চোখ টিপে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে নিষেধ করলে।

মিনুর হাত থেকে সুচিত্রা ছেলেকে চাকরের কাছে দিলে, চাকরটা চ'লে গেল বাইরের দিকে। ছেলেটির চাহিদা আজ অনেক, সবাই তাকে দেখতে চায়। রণেন যখন শরদিন্দুর কাছে এসে বসল, সুচিত্রা তখন বাইরে চ'লে গেল একটা কাজের নাম ক'রে। জানিয়ে গেল এখনি সে আসবে। রণেন একবার বিরক্ত হয়ে তাকালো তার পথের দিকে।

'আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, না রণেনবাবু ?'

'না, ঝগড়া আর কি।' ব'লে রণেন হেসে সিগারেট বার ক'রে দিলে শরদিন্দুর দিকে।

মিনু বললে, 'সুচিত্রাদিদি থাকলে আপনি যাচ্ছেন চ'লে, আর আপনি যেই আসছেন অমনি উনিও—'

রণেন আর শরদিন্দু হা হা ক'রে হেসে তার কথাটাকে হাল্কা ক'রে দিলে। এমন সময় একটি লোক এসে খবর দিলে, 'জজসাহেব এসেছেন !'

'তোমার বৌদিদি কোথায় ?'

'তিনি জজসায়েবকে বসিয়েছেন ঘরে।'

'তাঁকে আগে পাঠিয়ে দাও এখানে। আচ্ছা বৌদিদি, শরদিন্দু, আমি আসছি এই এখুনি।'—ব'লে রণেন উঠে বেরিয়ে গেল।

দুমিনিট পরেই এলো সুচিত্রা। মিনু তাড়াতাড়ি খাবার ফেলে রেখে দিয়ে হাতখানি ধ'রে বললে, 'আপনাদের মধ্যে কি হয়েছে সুচিত্রাদিদি ? কেউ কারো সঙ্গে হেসে কথা বলছেন না—'

সুচিত্রা করুণ হাসি হাসতে লাগল, এবং তারপরে বললে, 'কষ্ট হোলো আপনাদের, তেমন যত্ন হোলো না।'

শরদিন্দু বললে, 'বিলক্ষণ, এর নাম কষ্ট ! চমৎকার কাটলো সন্ধ্যেটা—'

মিনুর মনে নানা রকম প্রশ্নে ঘুলিয়ে উঠতে লাগলো। এক সময়ে বললে, 'আজ ত এখানে এসেছি, অন্য দিন বাড়ীতে থাকলে ছাদে বসে ও'র কেবল ফষ্টি-নষ্টি। যত আজগুবি কথা বলে আমাকে বিপদে ফেলবে।'

'বা রে আমার দোষ হোলো অমনি ? আর তুমি যে চোখ বুজে বুঁজে রাজ-পুত্রের গল্প শুনতে চাও ?'

'ওমা কি মিথ্যুক, আর তুমি যে বলো, যুধিষ্ঠিরের একটা প্রকাণ্ড ল্যাজ ছিল ?'

সুচিত্রার হাতের আঙুলগুলি মিনু নাড়াচাড়া করছিল। চাঁপার কলির মতো আঙুল, তাতে একটি হীরের আংটি। নিজের আঙুলগুলি সে লক্ষ্য করছিল। সবুজ শিরাগুলি সেখানে সুস্পষ্ট, শীর্ণ—হাতে তখনও মসলা বাটার ছাপ, বাসন মেজে মেজে নখগুলি গেছে ক্ষয়ে, কুটনো কুটে আঙুলের টিপে বঁটির দাগ। দুজনের দুখানি হাতে পরস্পরের ভাগ্য যেন আত্মপ্রকাশ করছে।

এমন সময় একটি তরুণী এসে ঘরে ঢুকল। বললে, 'এই নাও বৌদিদি—' বলে একটি কৌটো দিলে সচিত্রার হাতে।

সুচিত্রা পরিচয় করিয়ে দিলে, বললে, 'এর নাম লীলা, আমার ননদ। মিনুদিদি, এই বন্ধুত্বের চিহ্নটুকু নিয়ে যেতে হবে, সামান্য কানের ঝুমকো,—আপত্তি শুনবো না।'—মিনুর হাতে সে এক প্রকার গছিয়ে দিলে।

এমন সময় এসে দাঁড়ালো রণেন। বললে, 'শরৎ, ছোটবেলাকার বন্ধু আমরা, কত সিগারেট খেয়েছি তোর কাছে। এই বোতামটা তোকে প্রেজেণ্ট করলুম, না নিলে মার খাবি কিন্তু।'—এই বলে বোতামের একটা কেস সে শরদিন্দুর পকেটে গুঁজে দিলে।

দরিদ্র স্বামী স্ত্রী দু'জনেই বিস্ময়ে হতবাক! খাওয়া তাদের হয়ে গিয়ে ছিল। এত দামী উপহার,—গা তাদের ছম ছম করতে লাগলো।

রাত হয়েছে, আর থাকা চলে না। নানারূপ সামাজিক সৌজন্যের পর তারা বিদায় নিলে। ঘর থেকে বেরিয়ে দালান পার হয়ে নীচের বারান্দায় নেমে এল। যতই তারা সাজসজ্জা করে' আসুক কারো চোখেই তাদের দুরবস্থাটা গোপন থাকছে না। সুচিত্রা আর রণেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

এক সময়ে মিনুর বাঁ-হাতখানা টেনে নিয়ে সুচিত্রা তার হাতের সেই হীরের আংটিটা খুলে পরিয়ে দিতে দিতে বললে, 'এ আংটি আমার বাবা দিয়েছিলেন আমাকে, তোমাকে আমি অনায়াসে দিতে পারি মিনুদিদি।'

তৎক্ষণাৎ রণেন তার সোনার হাতঘড়িটা খুলে ফেললে এবং সেটা স্তম্ভিত শরদিন্দুর হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললে, 'বিলেতে থাকতে কিনেছিলুম ঘড়িটা, তুই নে শরৎ, কিছু মনে করিসনে ভাই।'—গলাটা যেন তার কাঁপছিল।

এ যেন একটা হিংস্র প্রতিযোগিতা। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ এর মধ্যে সুস্পষ্ট। শুধু যে কেউ পরাজয় স্বীকার করবে না তাই নয়, পরস্পরকে তারা অপমান করবে, আঘাত করবে। অভিশপ্ত ঐশ্বর্যের ওরা ক্রীড়নক!

বাগান পার হয়ে পথে এসে দাঁড়ালো শরদিন্দু আর মিনু। রণেন বললে, 'ট্যাক্সি ডেকে দিই।'

সুচিত্রা বললে, 'আমার গাড়ীখানা দিচ্ছি, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এইবার মিনুর মুখে কথা ফুটল। বললে, 'কাজ নেই সুচিত্রা দিদি, আমরা

হেঁটেই যাবো। হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনাদের এই উপহার আমরা নিতে পারবো না রণেনবাবু।' বলে ঝুমকোর কৌটো আর আংটি সে হাতের মধ্যে নিলে, তারপর শরদিন্দুর কাছ থেকে বোতাম আর ঘড়ি বার করে সবগুলি একত্রে সুচিত্রার হাতে জোর করে গুঁজে দিলে। হেসে বললে, 'আমাদের সংসারে শান্তি থাকুক, ওসব গরীবের ঘরে কোথায় নিয়ে রাখব ভাই? কিছু মনে করো না সুচিত্রাদিদি, আবার এক দিন আসব। আসি রণেনবাবু।'—এই বলে নমস্কার জানিয়ে স্বামীর হাত ধরে সে হেসে চলে গেল।

রণেন মাথা হেঁট করে ভিতরে এলো। অশ্রু-ছলোছলো চোখে সুচিত্রা সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

কোনো উদ্বেগই ছিল না। স্ত্রীটি ছিল গ্রাম্য, সরল, ভদ্র এবং একটু নির্বোধ। স্বামীকে ভয় করে, সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে, তিরস্কারের প্রতিবাদ করে না, হাজার অপমান সয়েও স্বামীকে যত্নের ত্রুটি করে না। স্বামী ভিন্ন তার জগতে কেউ নেই, পতিসেবায় ক্লান্তি ছিল না। গৃহবধূর যে গুণগুলি থাকলে স্বামী এবং আর সকলেরই সুবিধা, সুহাসিনীর সেগুলি সমস্তই ছিল।

স্বামীটি কলকাতার আফিসে কেরানীগিরি করে। লোকটি একটু বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমত্তার অনেক প্রমাণই পাওয়া যেত। অশিক্ষিত স্ত্রীর কাছে গ্রাম্যভাষায় সে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করত।

'জরু, গরু, পাটুনি, তিন সন্ধ্যে আটুনি—আমি বাবা স্রেফ্ এই বুঝি!'

পাখার বাতাস করতে করতে সুহাসিনী মুখে কাপড় চাপা দেয়। হাসে কি না কে জানে।

ছোট্ট সংসারটির বিশৃঙ্খলা কোথাও কিছু ছিল না। উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর প্রতিদিনের জীবন একটি মাত্র সুরে বাঁধা। কোনো বৈচিত্র্য, কোনো চাঞ্চল্য, কোনো অশান্ত গতিভঙ্গী—কিছুমাত্র ছিল না। সকালে উঠে সুহাসিনী পেয়ালা করে চা এনে দিত, স্নানের সময় দিত তেল সাবান আর গামছা, আহারের সময় নানা অনুরোধ করে পরম যত্নে স্বামীকে খাওয়াতো, সন্ধ্যার সময় আফিস থেকে ফিরলে পায়ের জুতো আর জামার বোতাম খুলে দিত, এবং রাতের বেলা নির্বিকারে স্বামীর কাছে আত্মদান। সুহাসিনীর দুটি চোখের একটিতে ছিল স্বামী আর একটিতে ছিল সংসার।

—ও সব আমি ভালবাসিনে, এই তোমার গিয়ে যাকে বলে মেয়েদের লেখাপড়া! কেন রে বাপু, অত কেন?

সুহাসিনীও সে কথায় পরমানন্দে সায় দিত। সত্যি ত, পুরুষ মানুষের মতো মেয়েদের আবার ওসব কি? স্বামীকে ছাড়িয়ে সুহাসিনীর অন্তরে আর কোনো বস্তুই রেখাপাত করত না। স্বামীর কথা বেদবাক্য বলে তার ধারণা ছিল এবং বিশ্বাস ছিল।

ছোটবেলায় সুহাসিনী নাকি দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়েছিল, সে বিদ্যার জোরে সেদিন সে একটুকরো বাঙলা খবরের কাগজ কোথা থেকে কুড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করতেই অমরেশ—সুহাসিনীর পতিদেবতা—কটু কঠিন কণ্ঠে বললেন—'ও আবার কি? কাজ নেই? কতদিন বলেছি যে,—আজকাল বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে ওইসব হচ্ছে?'

বিনীত কণ্ঠে সুহাসিনী বললে—'মসলা-বাঁধা কাগজ পড়েছিল, তাই একবার হাতে ক'রে—কিছুই নেই ওর মধ্যে!'

'না, হাতে নেবারই কি দরকার। জানো আমি ও সব পছন্দ করিনে? তায় আবার চোতা খবরের কাগজ। দেখলেই ঝেঁটিয়ে ফেলে দেবে!'

সুহাসিনীর বেশভূষার প্রতি অমরেশের নজর ছিল খুব কড়া। দুবেলায় দুটি সেমিজ আর দুখানি শাড়ী ছাড়া পরিচ্ছদের আর কোন বাহুল্যই অমরেশ পছন্দ করত না। সাবান কিম্বা সুগন্ধি তেল মেয়েদের ব্যবহার করা ছিল তার দু'চোখের বিষ। আফিস থেকে ফিরে সে যদি সুহাসিনীকে রান্নাঘর ছাড়া আর কোথাও অর্থাৎ বারান্দায়, জানলায়, অথবা ছাদে দেখত তাহলে সুহাসিনীর একেবারে অপমানের একশেষ হতো।

পাশের বাড়ীতে কোথায় একদিন কলের গান হচ্ছিল, অমরেশ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললে—'বিবির যে গান শোনা হচ্ছে ঘরে বসে বসে! লজ্জা করে না? জানলাটা কি বলে এতক্ষণ খোলা রয়েছে? আমাকে তুমি শান্তিতে দেবে না দেখছি।'

সুহাসিনী লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে জানলাটা বন্ধই করতে যাচ্ছিল। 'থাক্, তোমর ওধারে যেতে হবে না!'—ব'লে অমরেশ নিজেই গিয়ে জানলাটা ঝপাৎ ক'রে বন্ধ ক'রে দিল।

গ্রামের মেয়ে সুহাসিনীর জীবনে কোনো উচ্চ আশা-দুরাশা ছিল না। মনে তার না ছিল গ্লানি, না গলদ। সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকা ছিল তার অভ্যাস। জ্ঞান বুদ্ধি এবং বিদ্যার চর্চা তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। স্বামীর কথাই তার শাস্ত্র, স্বামীর সেবাই তার ধর্ম, স্বামী সংসারই ছিল তার কল্পনার লীলা-ক্ষেত্র!

সহরের কোন গোলমাল, কোন আন্দোলন, কোন ঝড়ঝাপটা সুহাসিনীর কাছে পৌঁছতে না! নগরীর বিচিত্র কোলাহল, মানব-সভ্যতার নব নব সম্ভাবনা, সমাজ-জীবনের বহুমুখী ধারা এসব ছিল তার কাছে স্বপ্নবৎ। ঘরের বাইরে কি আছে, বৃহৎ জগতের চারিদিকে কী ঘটছে, প্রতিদিনের ধ্বংস-সৃষ্টি—এর কিছুরই সঙ্গে সুহাসিনীর বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না! উঠানের মাথায় যেটুকু খণ্ড ও ক্ষুদ্র আকাশ, তার বেশী দূরে মেয়েটির আর নজরই চলত না।'

সেদিন বললে—'আচ্ছা, এখানে কোথাও কথক-ঠাকুরের রামায়ণ গান হচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ হচ্ছে, তা কি হবে কি? ভারি আমার রামায়ণ গান। রামচন্দ্র বনে গিয়েছিল আর বন থেকে ফিরে এসে রাজা হয়েছিল, এ কথা সবাই জানে।'

সুহাসিনী বললে—'সীতার গল্প আমার বেশ শুনতে ইচ্ছে করে।'

'তা হলে আর কি করবে। তুমি কি বলতে চাও তোমাকে নিয়ে আমি ওদের সকলের মাঝখানে রামায়ণ শোনাতে যাবো? সত্যি, মেয়েদের লজ্জা গেলে আর কিছুই থাকে না।'

নিতান্ত ভয়ে ভয়ে সুহাসিনী বললে—'না, আমি তা ত' বলিনি!'

অমরেশ মুখের একটা শব্দ ক'রে চুপ ক'রে রইল।

এমনি ভাবেই স্বামীর পায়ে এবং সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সুহাসিনী আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। স্বামীর কাছে তার যে অধীনতা তার মধ্যে না ছিল কোন ফাঁক, না ছিল কোন ছিদ্র। সুহাসিনীও তার সহজ প্রকৃতি-অনুযায়ী স্বামীর কাছে বশ্যতা স্বীকার ক'রে পরম নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাচ্ছিল।

সেদিনও ছিল অফিসের বার। খাওয়ার পর রাতের বেলা স্বামীর হাতে একটি পান তুলে' দিয়ে সুহাসিনী বললে—'দেখ?'

অমরেশ মুখ তুলে তাকাল। বললে—'হাসি মুখ যে, ব্যাপার কি? চোখ দুটি যে একেবারে খুশিতে ভরা।'

একটি দুর্লভ শুভ সংবাদ দেবার আগে সুহাসিনী টিপে টিপে একটুখানি হাসল। পরে বললে—'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে! দিনটা ভারি চমৎকার কেটেছে।'

স্ত্রীর কোনো কথা অমরেশ কোনোদিন গ্রাহ্যই করে না। নিতান্ত তাচ্ছিল্যকণ্ঠে বললে—'কি রকম?'

আনন্দে সুহাসিনী অধীর হয়ে উঠেছিল। বললে—'তবে বলি শোনো গোড়া থেকে!···খেয়েদেয়ে আঁচিয়ে উঠছি, বলি কে আবার ডাকে। ওমা, মুখ ফেরাতেই দেখি মাসিমা···হ্যাঁ গো, আমার মা'র মামাতো বোন।···কতদিন বাদে দেখা, প্রথমে চিনতেই পারি না,—বিধবা হবার পর ত আর দেখাশোনা নেই···তোমার শ্বাশুড়ী হন গো···কি বললেন জানো?'

অমরেশ মুখ তুললে।

—'কি সব বললেন, আমার মুখ দিয়ে আবার ওসব বেরোয় না, লজ্জা করে,—শুনতে কিন্তু বেশ লাগে!'

'তবু কি বললেন শুনি?'

গলার আওয়াজে সুহাসিনী একটু দমে গেল। স্রোতের মুখে যেন একখানা বড় পাথর এসে পথ রুদ্ধ করল। বিচারকের জেরায় আসামী যেমন দোষ স্বীকার করে, তেমনি ক'রে সুহাসিনী বলতে লাগল—'বললেন, মেয়েদের জাগতে হবে, পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাদের শক্তি জোগাতে হবে!'

'আর কি বললেন?—চাপবার দরকার নেই, সব বলো।'

'বললেন—আমরা নাকি তোমাদের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নই! আমরাও মানুষ, আমাদেরও মন আছে, হৃদয় আছে,।'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে অমরেশ বললে—'এসব বক্তৃতা আমার কাছে দিলেই ত তিনি ভাল করতেন। দেখতাম তিনি কত বড় বিদ্বান। কোথায় তিনি?'

ভয়ে ভয়ে সুহাসিনী বললে—'এই পাশের বাড়ীতেই আছেন। ও বাড়ীতে তাঁর দেওর থাকেন।'

'আচ্ছা, সকাল ত হোক'—বলে অমরেশ চুপ ক'রে গেল।

সুহাসিনীর দম বন্ধ হয়ে আসছিল, আস্তে আস্তে উঠে বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই চোখ পাকিয়ে অমরেশ বললে—'কোথায় যাচ্ছ অন্ধকারে?'

'রান্নাঘরে তালা দিতে ভুলে গেছি।'—ব'লে সুহাসিনী বেরিয়ে নীচে নেমে গেল। সমস্তদিন ধরে মনে মনে যাঁকে সে এত বড় শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিল, রাতের বেলা তাঁর প্রতি স্বামীর এই নিদারুণ অবহেলা ও অনাদর সুহাসিনী সইতে পারল না। হু হু ক'রে তার চোখ দুটি জলে ভেসে গেল।

সকালবেলা মুখখানা হাঁড়ির মতো করে অমরেশ উঠে এল। রুদ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে—'খবরদার ওসব আলোচনা আর না হয়, বলে দিয়ে যাচ্ছি। উনি কখন আসেন শুনি?'

সুহাসিনী বললে—'দুপুর বেলা।'

'ওসব কথা উঠলে ব'লো, আমার অনেক কাজ মাসীমা, ওসব শোনবার সময় আমার নেই;'

এই সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে অতিরিক্ত ক্ষোভে, ব্যর্থ রোষে এবং চিন্তিত মনে সেদিন অমরেশ দোমনা ক'রে আফিস বেরোলো। পথে যেতে যেতে সে সুহাসিনীর কথা ভাবতে লাগল। প্রতিদিন সে যদি ওই বিধবা আত্মীয়াটির কথাবার্তা এমনি ভাবে শুনে যায় তাহলে কি তার মাথার ঠিক থাকবে? রাস্তা পার হতে হতে অমরেশ ভাবতে লাগল, মেয়েদের শিক্ষিত করার মতো অনাচার সমাজে আর কিছুই নেই। স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা এবং সংসারের প্রতি বৈরাগ্য—এই হচ্চে আজকালকার মেয়েদের শিক্ষা!

আফিসে সেদিন অমরেশ কোনো কাজই মন দিয়ে করতে পারল না, সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। অপরিচিতা সেই মহিলাটির প্রতি সে নানা কটূক্তি করতে সুরু করল। তারপর মনে হ'লো, ভাগ্যি সুহাসিনী লেখাপড়া জানে না তাই, নৈলে জ্ঞানের আলোক দিয়ে সেই স্ত্রীলোকের কথাবার্তাগুলি হৃদয়ঙ্গম করলে আর কি রক্ষা ছিল? অমরেশ একটু স্বস্তি অনুভব করল; সুহাসিনী অশিক্ষিত না হলে তার সংসারযাত্রা নির্বাহ করা দুষ্কর হতো আর কি।

বাড়ী ফিরে সেদিন অমরেশ অবাক হয়ে গেল। দেখলে ঘরের মধ্যে সুহাসিনী কতকগুলি সেলাইয়ের জিনিসপত্র নিয়ে বসে আছে, আশেপাশে কতকগুলি বই কাগজ ছড়ানো। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সুহাসিনী একটা কাপড়ে ফুল তোলবার চেষ্টা করছে।

গুম্ হয়ে সে বললে—'কী এ সব? রান্না হয়েছে?'

হাসিমুখে সুহাসিনী বললে—'হয়েছে। খেতে দেবো?'

'থাক্'—ব'লে অমরেশ সেখান থেকে চ'লে গেল।

রাতের বেলা অস্থির হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—'আজও তিনি এসেছিলেন দেখছি। কি বললেন ?'

সুহাসিনী বললে—'বই কিনে পড়া দিয়ে গেছেন, আর এইসব সেলাইয়ের কাজটাজ—'

'হুঁ, কথাবার্তা কি হ'লো ?

'এইসব মেয়েদের কথা। আমাদের জীবনের কি সুখ, কি লক্ষ্য, আমরা নাকি পঙ্গু হয়ে গেছি, পুরুষেরা আমাদের চিরকাল দাবিয়ে রেখেছে—এইসব।'

কঠিন কণ্ঠে অমরেশ বললে—'আর কি ?'

সুহাসিনী আজ আর ভয় পেল না। সহজ গলায় বললে—'বললেন, আমাদের এ সতীত্বের কোনো মানে হয় না, মুর্খ হয়ে স্বামীর সংসারে বন্দী হয়ে থেকে—অশিক্ষায় অন্ধ হয়ে—'

অমরেশ অধীর হয়ে বললে—'সতীত্ব! সতীত্বের তিনি কি বোঝেন ? তিনি কত বড় সতী ?'

'চুপ করো!'—স্বামীর দিকে স্পষ্ট চেয়ে সুহাসিনী বললে—'তাঁকে কোনো কথা তুমি বলতে যেয়ো না!'

মুখে একটা শব্দ ক'রে অমরেশ অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে রইল।

দিন চারেক বাদে দুপুর বেলা হঠাৎ অমরেশ বাড়ীতে ঢুকলো। মাসিমার কাছে ব'সে সুহাসিনীর তখন গভীর আলোচনা চলছিল, স্বামীকে দেখেই সে মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে স'রে বসল। অসময়ে স্বামীকে এই রণমুর্তি'তে ঢুকতে দেখে ভয়ে তার বুকের ভিতরটা গুরু গুরু করে উঠল।

অমরেশকে দেখেই মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'এস বাবা, এস!'

অমরেশ এক নজরে তাঁর দিকে তাকালো। বয়স বছর-ত্রিশ, সুন্দরী, কালো দুটি চোখে জ্ঞানবুদ্ধির দীপ্তি, শিক্ষার একটি ঔজ্জ্বল্য মুখখানিকে স্নিগ্ধ ক'রে রেখেছে। বিধবা হলেও হাতে দুগাছি সোনার চুড়ি। পরণে খদ্দরের সরু পাড় ধুতি এবং গায়ে জামা।

স'রে গিয়ে সে পায়ের কাছে মাথা হেঁট ক'রে প্রমাণ করল। কুশল জিজ্ঞাসার পর মহিলাটি বললেন—'এ কি ক'রে রেখেছ বাবা, এই তোমার স্ত্রীকে ?'

অমরেশের সমস্ত কথা অকস্মাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল। মহিলাটি বললেন—'এ ত' চলবে না, চারিদিকে আজ অন্ধকার হয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে মেয়েদের ওপর অজ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে বন্দী ক'রে রাখলে ত আর চলবে না, বাবা ? দরজা যে তাদের আজ খুলে দিতে হবে!'

আবেগে অধীরতায় আনন্দে ও এক অপরিচিত আলোকের বৈদ্যুতিক স্পর্শে সুহাসিনী পাশে বসে কাঁপছিল। অমরেশের মুখের দিকে মুখ তুলে মহিলাটি

আবার বললেন—'পারবে ত বাবা, এ উদারতাকে বরণ ক'রে নিতে পারবে ত? আমার হাতে তোমার স্ত্রীকে তুলে দিতে আপত্তি হবে না?'

'না, আপত্তি আর কি!'—ব'লে অমরেশ পিছন ফিরে আস্তে আস্তে বাইরে চলে' গেল।

সুহাসিনীর দুটি চোখ জলে ভ'রে উঠেছিল। মহিলাটির একটি হাত ধ'রে সে বললে—'আমায় তুমি ছেড়ে যেয়ো না মাসীমা।'

'পাগল মেয়ে!'—মাসীমা হেসে বললেন—'ছেড়ে যদি যাই তখন কি আর তোর কোনো দুঃখ রেখে যাবো?'

ব্যর্থ আক্রোশ, প্রচণ্ড ক্ষোভে, অধিকার-বিচ্যুতির সম্ভবনায় অমরেশ তখন বাইরে ব'সে নিজের হাত-পা কামড়াবার চেষ্টা করছিল। রাতের বেলা সে আজ তার স্ত্রীর সঙ্গে যা হোক একটা শেষ বোঝাপড়া ক'রে নেবে।

সমস্ত বিকেল আর সন্ধ্যা সে আর কোথাও বেরোল না। আশায় আশায় অপেক্ষা ক'রে রইল। রান্নাবান্না শেষ ক'রে রাত আটটা নাগাৎ সুহাসিনী তাকে খেতে ডাকল। মুখ বুজে নিঃশব্দে এসে অমরেশ আহার শেষ ক'রে ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে নীচের ঘরে তালাচাবি দিয়ে সুহাসিনী উপরে উঠে এল। কোনোদিকে তাকাবার সময় যেন তার নেই। একটি রেকাবে দুটি পান গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াতেই অমরেশ বললে—'ঘোড়ায় চ'ড়ে এলে নাকি? এত তাড়াতাড়ি কেন?'

'এখুনি যেতে হবে।'

'যেতে হবে? কোথায় শুনি? বড় বেড়ে উঠেছ দেখছি।'

'চুপ করো, একটু আস্তে কথা বলো। নীচে মাসীমা দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

গলা নামিয়ে অমরেশ বললে, —'তিনি এত রাতে কেন?'

'আজ তাঁর ওখানেই থাকবো। অনেক কথা আছে, কাজও পড়ে' রয়েছে অনেক। আজকের মতন ঘর দোর দিয়ে শুয়ে থাকো।'—বলতে বলতে সুহাসিনী আর কোনো দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

বাইরে এসে দুজনে চলে গেল কি না—একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে অমরেশ হঠাৎ বারুদের মতো জ্বলে উঠলো—'দেখে নেবো আমি···এর শোধ তুলবই, এ আমি সহ্য করবো না। দিনের বেলা না হয় ও সব চলে, কিন্তু রাতে আমায় একলা ফেলে রেখে···এ কিন্তু ভাল হবে না। অমন স্ত্রীকে ত্যাগ করব ব'লে দিচ্ছি··· এতদিন কিছু আমি বলিনি। রাতের বেলা স্বামীকে ছেড়ে যাওয়া···মেয়েমানুষকে আমি বিশ্বাস করিনে···খুন করবো···

আহত ক্রুদ্ধ পশুর মতো ঘরের মধ্যে সে দাপাদাপি করতে লাগল।

একটিমাত্র পা

কিসের পয়সা জানো ? যুদ্ধের বাজারে লোকটা রংয়ের কারবার করেছিল—

চুপি চুপি ঈশ্বর মুখের কাছে মুখ এনে বলতে লাগল, মাটি মিশিয়ে দিত হে··· মা-গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি বাঁউনের ছেলে, রঙের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে দিত। জোচ্চুরি না থাকলে চট্‌ ক'রে কপাল ফেরে না।

এই ব'লে সে পাশে এসে বসল। বসত এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে। একটা পা তার হাঁটু পর্যন্ত কাটা, বাকি অংশের ক্ষতিপূরণ করেছে সে কাঠের পায়া লাগিয়ে। হাতের তলা থেকে দুটো লাঠি মাটিতে ফেলে সে ব'সে পড়ল।

আঃ, বসলেই আমি বাঁচি, ইচ্ছে করে আর আমি উঠব না। হ্যাঁ শোনো, এই যা তোমাকে বললুম যেন ব'লে দিয়ো না ভাই, তা হলে যাবে আমার পনেরো টাকা মাইনের চাকরিটা।

বললাম, পনেরো টাকা ক'রে মাইনে পাও ?

সে হেসে বললে, এই মা-গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি বাঁউনের ছেলে,—আর একটা পা থাকলে তিরিশ টাকা ক'রে পেতুম। আচ্ছা, তুমি বলো ত, তিরিশ টাকার উপযুক্ত কি আমি নই ?

প্রশ্ন করলেও উত্তর সে চায় না। চুপ ক'রে শুনলে সে আরো খুশি হয়। চুপ ক'রে রইলাম।

এই যে বাড়ীটা তৈরি হচ্ছে দেখছ—ঈশ্বর বলতে লাগল—সবসুদ্ধ সাঁইত্রিশখানা ঘর হবে, হাওয়াখানা হবে দুটো—নদীর ধার কিনা, ভাগ্যবানদের হাওয়া খাওয়া দরকার।

ছিটের কোটের পকেট থেকে সে তার বহু পুরাতন গাঁজার কল্‌কেটা বা'র করলে এবং তারপর তার আনুষঙ্গিক। কল্‌কে ধরাতে ধরাতে বললে, ঈশ্বর পালও একদিন কম ভাগ্যবান ছিল না হে !

নিজের নামটা প্রায়ই সে নির্লিপ্ত ভাবে উচ্চারণ করত। নিজেকে বিদ্রূপ করা ছিল তার কথাবার্তার একটা রীতি। এই নদীর ধারেই তার সঙ্গে আমার আলাপ, এইখানেই আমাদের ক্ষণস্থায়ী বন্ধুত্ব। সুমুখে যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে, ওরই মালিকের কাছে ঈশ্বরের পনেরো টাকার চাকরি। এইখানেই বসে রাজমজুরদের কাজ দেখাই তার কাজ। ব'সে থাকাটাই তার দাসত্ব।

কল্‌কে ধরে একটা বড় ক'রে টান দিয়ে ঈশ্বর বললে,—ভাগ্যবান একদিন ছিলুম। তুমি কি মনে করো পা আমার চিরকাল এমনি খোঁড়া ছিল ? আমি ছিলুম পাড়ায় সকলের চেয়ে জোয়ান, ইয়া আমার বুকের ছাতি—

অস্থিসার শীর্ণ চেহারাটা সে একবার সোজা ক'রে দেখাবার চেষ্টা করলে।

সরকারী চাকরি থেকে পানের দোকান পর্যন্ত—বুঝলে হে, এই শর্মার হাত দিয়ে সব হয়েছে।

বললাম, সে সব ছাড়লে কেন ?

কেন ছাড়লুম ? আ, তুমি মানুষের মন বোঝ না। তাই ত বলছি, আমি ভাগ্যবান। ছুঁয়ে ছুঁয়ে এলুম সব, দেখলাম এদের সবাইকে—

কাদের দেখলে ?

কল্‌কের আর একটা টান দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ঈশ্বর কাসলো ; একটু হাঁপানির টান ছিল তার। সুস্থ হয়ে সে ভালো ক'রে একবার দম্ নিলে। বললে, কাদের ? এই ধরো তোমাদেরই দেখা গেল ! বলো কি, আমি ভাগ্যবান নই ? ধরো, আর বোধ হয় নেই।—ব'লে সে মুমূর্ষু কল্‌কেটা আমার হাতে সস্নেহে ছেড়ে দিল !

নদীর তীরে বটগাছের এই ছায়াটুকুতে আমাদের এই আড্ডা অনেক দিন থেকে চ'লে আসছে। বটগাছের একটা ডাল গঙ্গার স্রোতকে স্পর্শ করেছে, আমরা তার দিকে মাঝে মাঝে নিঃশব্দে চেয়ে থাকি, দেখতে দেখতে কোন্ অলক্ষ্যে বেলা চ'লে যায়।

ঈশ্বর তার পা-খানা টান ক'রে সোজা হয়ে বললে,—প্রথম বয়সে আমারও মনটা তোমার মত নরম ছিল, কত কি ভাবতুম। আশা ছিল আমার। হেসো না, আমি যেন কিসের অপেক্ষায় ব'সে থাকতুম। হরি হরি, মনে ঘুণ ধ'রে গেল। ওহে, বড় রকম কিছু আশা করো না, ছুটোছুটিই কেবল সার হবে।

একেবারে সিঙ্গাপুর থেকে আফ্রিকায়, মায়াবিনীর পিছনে পিছনে ছুটলুম। কেন বল ত ? আমার কি খুব টাকাকড়ির লোভ ছিল ? ভাগ্য ফেরাতে গিয়েছিলুম।

নদীর দিকে ঈশ্বর চেয়ে রইল। অপরাহ্নের রোদে জলটা ঝলমল করছে ! অদূরে খেয়াঘাটে তখনও নৌকায় লোকজন উঠছিল। রাজমজুরদের 'রোজ' শেষ হ'তে আর দেরি নেই।

একদল গোরুর গাড়ী ইঁট বোঝাই নিয়ে এসে পেঁছিল। ঈশ্বর ব্যস্ত হয়ে বললে, আয় বেটারা, পর্বতের কাছেই আয়। এইখানে বসেই চালান সই করি, আয়। দেখছিস ত, একটা পায়েরই কত দাম ! সই না নিয়ে তোরা যাবি কোথায় বল ?

গাড়োয়ানের দল এসে তাকে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো। চালান বা'র ক'রে একে একে তার হাতে দিল। বললে, সহি লাগাও বাবু।

সহাস্য পরিতৃপ্ত মুখে ঈশ্বর একে একে সই দিয়ে বললে, খালাস ক'রে দে। গুণে গুণে রাখবি।

আজও যে সে সেলাম আর সম্মান পায়—এই আনন্দ আর তৃপ্তিটা সে প্রকাশ না ক'রে পারে না। হঠাৎ সে যেন স্বাস্থ্যবান আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কোটের ভিতরের পকেট থেকে ছোট একখানা নোট বই বা'র করলে। মুখ তুলে বললে, সাত গাড়ী মাল ত?—এই ব'লে সে তাড়াতাড়ি সাতের বদলে আট লিখে রাখল।

আট লিখলে কেন ?

চুপ। ব'লে ঈশ্বর হাসলো, এবং পুনরায় বললে, অত চেঁচাও কেন হে ? অনেকে দিনকে রাত বানিয়ে দেয়, আর আমি সাতকে আট করবো না ? পনেরো টাকা মাইনেয় কি কারো চলে ? মাইনের চেয়ে আমার উপ্‌রি মিষ্টি।

কিছুই বলিনি তবুও বোধহয় হঠাৎ ঈশ্বর একটু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল,—তোমার চোখ টাটালো, কেমন ? ওঃ তুমি ভারি ধার্মিক, অনেক দেখেছি তোমার মতন। দাও আমার কল্‌কে।

কল্‌কেটা হাতে নিয়ে সে শান্ত হোলো। বললে, রাগ ক'রো না হে, তোমাকে কিছু বলিনি। অনেক পুণ্য করেছি, স্বর্গে যাবার ভয় আছে। কিছু জোচ্চুরি না করলে পরকালে বিপদ ঘটবে।—নদীর দিকে তাকিয়ে সে পুনরায় বললে, আচ্ছা বলতে পারো তুমি, ওপারে, কি আছে ? জানা যায় না এপার থেকে ?

আলোছায়ার বিচিত্র আবছায়ার ভিতর দিয়ে সে দূরের দিকে একবার তার দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিলে। বললে, অনেক কিছু আশা করো না হে, ভয়ানক ঠক্‌বে। যা পাও তাই খুসী হয়ে নাও।—চলো আমার বাসায়, আজ তোমাকে সরভাজা খাওয়াবো।

দুই হাতে লাঠির উপর ভর দিয়ে একটা পায়ে চলতে চলতে ঈশ্বর পুনরায় বললে, আচ্ছা, জন্মান্তর তুমি বিশ্বাস করো ? বলতে পারো এবারের ইচ্ছেগুলো পরের বারে গিয়ে ফলে কি না ? আশা করাটা কি এত বড় মিথ্যে ?

গল্পের ভূমিকা

সকালে উঠিয়া লিখিতে বসিয়াছিলাম। বারান্দার ধারে হালকা রৌদ্রের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, শরতের সুস্নিগ্ধ আকাশ এখনো ঘন নীল হইয়া উঠে নাই, ঠান্ডা হাওয়া মুখে চোখে আসিয়া লাগিতেছিল,—বসিয়া বসিয়া মনে মনে একটি গল্প ফাঁদিতেছিলাম।

উপর তলায় আমি একাকী থাকি, আমি সৈন্যবিভাগের লোক। ব্যারাকের নীচের তলাগুলিতে নানা জাতীয় লোকের জটলা—চাপরাশি, দোকানওয়ালা, সরকারি ঝাড়ুদার, লরী-ড্রাইভার, পিওন ইত্যাদি। যথেষ্ট স্থানাভাব বলিয়া হিন্দু-মুসলমানের জাতিবিচার নাই। নীচে নানা কণ্ঠের গোলমাল চলিতেছিল।

গল্প একটা আরম্ভ করিতেই হইবে। দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরিয়া বাংলা দেশের কোনো একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদক আমার নিকট গল্পের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেছেন, গল্প একটি লিখিতেই হইবে। কিন্তু কি লইয়া গল্প লিখি? সুলভ প্রেমের উপাখ্যান আমার কলমের ডগায় আসে না, অশ্লীল গল্প লিখিয়া কলেজের ছাত্র-ছাত্রীকে নাচাতেও মন যায় না এবং আমিই একমাত্র বাঙ্গালী লেখক যিনি প্রেমের গল্প লেখেন না,—কিন্তু তবুও গল্প একটি লিখিতে হইবে।

সৈন্যবিভাগে চাকরী লইয়া বহুদিন এই পাঞ্জাব-সীমান্তে আসিয়াছি। রাওয়ালপিন্ডি হইয়া যে-পথটা হিমালয় পর্বতের ভিতর দিয়া ঝিলম্ নদী পার হইয়া সোজা কাশ্মীরের অন্দরে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, সেই পথের উপরেই এই ছোট পাহাড়ী সহরে আমাদের ছাউনী। ছাউনী স্থায়ী নয়, শীতকালে আমাদের দপ্তর নীচে নামিয়া যায়। এখানে শরৎকাল হইতেই প্রচন্ড শীত পড়ে, আমাদের চলিয়া যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

কেমন করিয়া গল্পটি আরম্ভ করিব এই লইয়া দিনের পর দিন ভাবিতেছিলাম। কল্পনা নয়, অভিজ্ঞতা লইয়াই গল্প লিখিতে আমি ভালবাসি। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সত্য অনুভূতি, ইহাই আমার যে-কোনো গল্পে প্রাণের উত্তাপ সঞ্চার করিবে।

বারান্দার উপর মস্ মস্ করিয়া জুতার শব্দ হইল। এই জুতার শব্দটা আমার অত্যন্ত পরিচিত, এই শব্দটা শুনিলেই আমার গল্প লেখার চেষ্টাটা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, রচনার আনন্দটুকু গ্লানিতে আবিল হইয়া ওঠে। জুতার শব্দটা পিছন দিক হইতে আমার কাছাকাছি আসিয়া গেল। এই থমকিয়া থামিবার অর্থও আমি জানি। মনে মনে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পাহাড়ী উর্দু ভাষায় বলিলাম, 'থাক্, এখানে জঞ্জাল নেই, ঝাড়ু দিতে হবে না।'

উত্তর আসিল, 'জঞ্জাল আছে, আপনি উঠুন, ঝাড়ু দিয়ে যাই।'

স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক করিতে আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। তা ছাড়া আমি মনে-প্রাণে আচারে-আলাপে, চলনে-ভোজনে একজন অকৃত্রিম সৈন্য, কখন কি করিয়া ফেলিব তাহার ঠিক নাই, স্ত্রীলোক বলিয়া ক্ষমা নাও করিতে পারি। ইজি-চেয়ার ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া সরিয়া গেলাম। লালি না কি যেন এই মেয়েটার নাম, সরকারি চাকরাণি। নন্দা দেবী পর্বতের ধারে কোন্ এক গ্রামে ইহাদের বাড়ী, বছরে ছয়মাস এখানে চাকরি করিতে আসে, বরফ পড়িতে থাকিলে চলিয়া যায়। মেয়েটার যে পরিমাণে টকটকে রূপ, সেই পরিমাণে ও নোংরা। গায়ে একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবী, পরণে আল্‌গা পায়জামা। মাথায় ঘোমটা দিবার জন্য একটুক্‌রা উড়ানী ব্যবহার করে, কিন্তু তাহার দুইটা প্রান্ত পিঠের দিকে ঝোলানো, আব্‌রুর চেয়ে আরাম তাহার প্রিয়। শুধু নোংরা হইলেও ইহাকে ক্ষমা করিতাম, কিন্তু মেয়েটা অত্যন্ত অসচ্চরিত্র। অসচ্চরিত্র মেয়েকে দেখিলেই আমি চিনতে পারি। তাদের ভঙ্গী, কথা, হাসি, চলন এবং চক্ষু আমার পরিচিত। তা ছাড়া এই মেয়েটাকে যেদিন একটা কাফিখানার ধারে কয়েকজন লোচ্চা স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানে বসিয়া সিগারেট টানিতে দেখিয়াছি সেই দিন হইতে ইহাকে আর সহ্য করিতে পারি না। তামাক খাওয়া এ-দেশের মেয়েদের অভ্যাস কিন্তু ইহার গোপন ঔদ্ধত্যটুকু আমাকে অতিশয় আঘাত করে। আর এই লালি ? ইহার সর্বাঙ্গে দুশ্চরিত্রের দাগ !

চেয়ার ও টেব্‌ল্ নাড়াচাড়া করিয়া ঝাড়ু দিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'সাহেবজী, বকশিস্ ?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম। বলিলাম, 'রোজ রোজ বকশিস ? রিপোর্ট লিখে এবার তোর চাকরি খাবো, বদমাইস !'

ঝাড়ু হাতে দাঁড়াইয়া সে হাসিল। বলিল, 'বারো টাকা মাইনে পাই, বকশিস না দিলে চলবে কেন ?'

স্পর্ধা ! মুখের কাছে দাঁড়াইয়া কথা বলিবার স্পর্ধা একমাত্র এই লালিরই দেখিতেছি। আমি কড়া মেজাজের লোক তাহা এ মহল্লার সকলেই জানে, কিন্তু জানিতে চাহে না এই ছোটলোক, এই নোংরা ঝাড়ুদারনি মেয়েটা। আমার আত্মাভিমান এবং অহঙ্কারের সীমানার মধ্যে কেহ আসিতে সাহস করে না, সকলকে আমি উপেক্ষা করি, তাচ্ছিল্য করি, দয়া করি,—কিন্তু এই লালি ? রোজ সকালে আসিয়া নিয়মিত বক্‌শিস্ চাহিয়া, অবলীলায় স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া, হাসিয়া, এ যেন আমার গাম্ভীর্যের কান মলিয়া চলিয়া যায়।

সহ্যের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া বলিলাম, 'ভাগ্ এখান থেকে। তোকে দেখলে আমার বমি আসে।'

'কাল আমার বক্‌শিস্ চাই, নৈলে তোমার ঘরের জিনিষ উঠিয়ে নিয়ে যাবো, এই ব'লে যাচ্ছি।'

'কি বললি ?' বলিয়া রুখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সে হাসিতে হাসিতে বারান্দা

ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়া গেল। সেখান হইতে বলিল, 'এই ত, তোমাদের চ'লে যাবার সময় হোলো, বক্‌শিস্‌ আর পাবো কবে?'

'দেবো না তোকে বক্‌শিস্‌, নিকালো হিঁয়াসে!'

সে হেলিয়া দুলিয়া তিরস্কার উড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

চেয়ারে আবার আসিয়া বসিলাম বটে কিন্তু গল্প লেখা আর হইল না। রৌদ্রালোকটুকু প্রতিদিনের মতো আজো চক্ষে বিসদৃশ হইয়া উঠিল। গল্পের আবহাওয়াটা চুরমার হইয়া গেল, শরতের আকাশের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যটুকু কে যেন ঝাড়ু দিয়া মুছিয়া দিল। লালিকে চাকরি হইতে বরখাস্ত না করাইলে আর আমার শান্তি নাই। উহাকে এই পাহাড় হইতে তাড়াইব, তবেই আমার নাম নিবারণ চক্রবর্তী!

সকাল বেলা আমার কাটে এম্‌নি করিয়া, এই আমার সকালের ইতিহাস। ধড়া-চুড়া চড়াইয়া আপিস চলিয়া যাই। লালিকে চাকরি হইতে তাড়াইব এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহাকে মন হইতে তাড়াইবার কথা ভুলিয়া যাই। আমি বিশেষ কাহারো সহিত কথা বলি না, সকলের সঙ্গে অত মাখামাখি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। ইহাদের কাহাকেও আমি তেমন পছন্দ করি না, নিজের আশপাশ নির্জন এবং নির্বান্ধব করিয়া রাখাই আমার প্রকৃতি, আমার নিষ্ঠুর বৈরাগ্যের পরিধির মধ্যে আমি কাহাকেও প্রশ্রয় দিই না। আপন গৌরবে ও অভিমানে সকলের শীর্ষস্থানে বসিয়া সকলের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকাই আমার অভিরুচি। মানুষের প্রতি আমার প্রাকৃতিক বিতৃষ্ণা।

অফিস হইতে ফিরিয়া আবার গল্প লেখার চেষ্টায় বসিয়া যাই। সুন্দর একটি আবহাওয়া সৃজন করিয়া মনে মনে আপনাকে মুখর করিয়া তুলি। ইচ্ছা করে একটি সত্যকারের ক্লিষ্ট জীবনের চিত্র আঁকি, তাহার সকল লজ্জা এবং সমস্ত আশা লইয়া। প্রাণঝড়ে উন্মত্ত হইয়া ছুটিবে আমার সেই নায়ক-চরিত্র, সেই চরিত্র-তত্ত্ব হইবে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবাদ, সর্বোচ্চ মনুষ্যত্ব।

বিকাল বেলা আমার প্রিয় সেতারটি লইয়া বাজাইতে বসিলাম। ওস্তাদ সেতারী নই, তবু নিজের বাজনা আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। আমিই আমার অনুরাগী শ্রোতা। আর একটি শ্রোতা আছে কিন্তু তাহার কথা বলা শোভন হইবে না এবং বলাটা আমার পক্ষে রুচিকরও নয়। রুচিকর নয়, তাহার কারণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমি যেন কোথায় একটি অশ্রদ্ধা পোষণ করি। স্ত্রীলোক দেখিলেই আমার লালিকে মনে পড়ে, স্ত্রীলোকের কথা চিন্তা করিতে গেলেই লালির সুকৌশল অঙ্গভঙ্গী, দুর্বিনীত হাসি, ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ, তাহার কদর্য ধরন-ধারণ আমার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠে। যে-নারী স্বাভাবিক সলজ্জ সুষমাকে এমন অকাতর বিসর্জন দিতে পারে, পৌরুষের উদ্ধত অনুকরণ করিয়া যে পুরুষকে এমন করিয়া ব্যঙ্গ করিতে থাকে, সে পারে না কি? লালি শুধু মাত্র আমাকে এই কথাটাই জানাইয়াছে, নারী কেবলমাত্র ভোগের ও অপমানের, শ্রদ্ধার নয়।

সেতার বাজাইতে বাজাইতে আমি যেন কোথায় চলিয়া যাই, ডুবিয়া যাই। একটি নির্মল সুরলোকের ভিতর প্রবেশ করিয়া সুন্দর গল্পের সূত্র খুঁজিয়া বেড়াই। এমন একটি গল্প, যাহার ভিতর দিয়া জীবনের সুদূর ও গভীরতম অর্থটিকে টের করিয়া দিতে পারি।

মুখ তুলিয়া দেখিলাম, নীরব শ্রোত্রীটি পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে। আপাদমস্তক তাহার বোরখায় ঢাকা। প্রতিদিন তাহাকে দেখিয়া আসিতেছি, এমনি করিয়া কাঠের পার্টিশানের পাশে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া স্থাণুর মতো সে বসিয়া থাকে। নড়ে না, মুখ ফিরায় না, নারীসুলভ ছল-চাতুরী করিয়া কোনো কাজের অছিলায় বসিয়া থাকে না, তাহার অচঞ্চল ভঙ্গী কথাটাই আমাকে কেবল জানায়, সে আমার সেতারের একজন বিশিষ্ট শ্রোতা। অনুরাগ নয়, আসক্তি নয়, প্রয়োজন নয়, আমার সুরের আকর্ষণ ওই বোরখা-পরা মেয়েটিকে নিত্যদিন ওই জায়গাটিতে আসিয়া বসায়। রাগ করিয়াছি, মনে মনে অভিসম্পাৎ করিয়াছি, কিছু একটা অভিসন্ধি আছে বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি, গলায় আওয়াজ করিয়া তাহাকে উঠিয়া চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়াছি, এবং পরিশেষে সেতার ফেলিয়া আমার বাঁশের বাঁশীটা লইয়া বাজাইতে বসিয়া গিয়াছি, তবু সে উঠিয়া যায় না। আগে ছিল বিরক্তি, এখন হইয়াছে করুণা। বুঝিলাম জীবনে সে গুণীর গান শুনে নাই, সুরের আনন্দ সে পায় নাই। লালিকে দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, ললিতকলা সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের জ্ঞান ও উপলব্ধি এতটুকু নাই, তাহাদের বাহিরে আছে রসের ইঙ্গিত কিন্তু ভিতরে রসের সঞ্চয়ের একান্ত অভাব! তাহারা জীবসৃষ্টি করিতে পারে, আনন্দ সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু এই মেয়েটি?

এক এক দিন মনে হইত মেয়েটি বুঝি পাশ ফিরিয়া বসিয়াছে। তাহাকে জানি না, কোনোদিন তাহার সুরমুগ্ধ মুখখানি একবার দেখিতে পাইব এ আশা বা ইচ্ছা আমার এতটুকু ছিল না, তবু তাহাকে পাশ ফিরিয়া বসিতে দেখিয়া আমি আড়ষ্ট হইয়া যাইতাম। বোরখার জালের ভিতর হইতে দৃষ্টি ফেলিয়া সে কি আমার কঠিন গাম্ভীর্যের অন্তরাল হইতে এক দীন ও দরিদ্র শিল্পীকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে? কেন, ইহাতে তাহার কী লাভ? এ কি কেবলমাত্র স্ত্রীলোকের আজন্মের অকারণ কৌতূহল?

লালির এমনি একটা কুৎসিত-কৌতূহল দেখিয়াছি, আমার মনের উপর তাহার রূঢ় আঘাত অনুভব করিয়াছি। সেই কৌতূহলের পাশে আছে তাহার বিকৃত কামনা, যৌবনের তৃষ্ণা। আমার তিরস্কার, কটূক্তি, বিরক্তি ও গাম্ভীর্য—ইহাদের অগ্রাহ্য করিয়া সে-কৌতূহল আমাকে খোঁচাইয়া জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু এ-মেয়েটি প্রতিদিন ধরিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে! আমার ভিতরে যে-মানুষ বাঁশী বাজায়, যে-মানুষ বাজায় সেতার, যে-মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া জীবনের তত্ত্ব খোঁজে সম্ভবতঃ ওই বোরখার ভিতরের ব্যাকুল কৌতূহল আমার সেই মানুষটিকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে। তাহার

চাঞ্চল্য নাই, উত্তেজনা নাই, তাহার আছে ধ্যানমৌন সুগভীর দৃষ্টি, সহজ সাধনা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, আকাশে একটি একটি করিয়া তারা দেখা দিল, পাহাড়ে পাহাড়ে কোথাও কোথাও আলো জ্বলিয়া উঠিল। বাঁশী থামাইয়া আমি চুপ করিয়া বসিলাম। শীতের হাওয়ায় হাত-পাগুলা ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে। ভিতরে গিয়া চিমনীর ধারে আগুনের আভায় বসিয়া এইবার আমার গল্প লিখিবার সময়। কিন্তু আজিকার এই সকরুণ সন্ধ্যাটিকে, এই স্বল্পচন্দ্রালোকিত নিস্তব্ধ পর্বতরাজির প্রশান্তিটিকে যদি ভাষায় ধরিয়া না দিতে পারি, তবে মিথ্যাই আমার গল্প-রচনার এ আড়ম্বর!

আপন অহঙ্কারকে লইয়া একটি গল্প সুরু করিব। দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী যাইবার দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিল, সমতল শহরে গিয়া আবার নূতন জীবন শুরু হইবে। তাহার আগে বৈরাগ্য-দিয়া-ঘেরা আমার এই অহঙ্কারটুকুকে লইয়া একটি রচনা লিখিয়া যাই। আমার অহঙ্কারের যে-আভিজাত্য সেখানে জনসাধারণের আঘাত পেঁছায় না। আমার সে-অভিমান উদ্ধত নয়, রূঢ় নয়, প্রতিদিনের,জীবনের লাভ ক্ষতি লজ্জা কলহ ও সংশয়ের মধ্যে নামিয়া আসিয়া আপনাকে সে অপমান করে না, সংকীর্ণ করে না। আমার সে-অহঙ্কার সন্ন্যাসী, মানুষের প্রতি তাহার অপরিসীম অবহেলা।

আজ সকালে চাবুক লইয়া লালিকে তাড়না করিয়াছিলাম। মার খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সে মুখের উপর মুখ তুলিয়া কহিল, 'মারো'।

স্ত্রীলোকত্বের সুবিধা লইয়া যে-নারী স্বেচ্ছাচার করে তাহাকে আমি ঘৃণাও করি এবং তাহাকে দৈহিক শাসন করিতেও আমার বাধে না। কিন্তু এখানে ছিল আমার অহঙ্কার। সে প্রতিবাদ করিবে না, প্রতিঘাত করিবে না, মুখ বুজিয়া আমার অপমান সহ্য করিবে—এই অবজাত, অবজ্ঞাত যুবতীটির এত বড় অহঙ্কার, এতখানি স্পর্ধা আমার সহিল না। বলিলাম, 'যদি সপাসপ্ চাবুক লাগাই কি করতে পারিস? কে আছে তোর এ পাহাড়ে যে—?'

সে কহিল, 'কেউ নেই বলেই ত তোমায় আমি ভয় করিনে। কেউ থাকলেও তোমায় কিছু বলত না!'

'বলত না, এত বড় তেজ?'—বলিয়া পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া তাহার দিকে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় কহিলাম, 'খবরদার, আর আসবিনে আমার এখানে, আমি নিজেই আমার বারান্দায় ঝাড়ু দেবো। যা চলে যা।'

টাকাটা তুলিয়া সে গম্ভীর হইয়া ছুঁড়িয়া আমার গায়ের উপর ফেলিয়া দিল, গায়ে লাগিয়া মেঝেতে পড়িয়া সেটা গড়াইয়া গেল। বলিল, 'পাঁচ মাস কাজ ক'রে এক টাকা বক্‌শিস্? তোমার নজর একটুও উঁচু নয়। দশ টাকা অন্তত যদি না দাও ত রাস্তায় একদিন ধ'রে তোমার পকেট থেকে কেড়ে নেবো—'বলিয়া ঝাঁটাটা লইয়া সম্রাজ্ঞীর মতো সে চলিয়া গেল।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিলাম।

আজ বোরখাঢাকা মহিলাটির দিকে চাহিয়া সেই কথাটাই মনে হইতেছিল। মনে হইল নারীর পরিচয় রূপ নয়, যৌবন নয়, নারীর পরিচয় তাহার চরিত্র-মাধুর্যে, অন্তর-লাবণ্যে।

একদিন বিদায় লইলাম। পাহাড় ছাড়িয়া লোকজন নীচে নামিয়া চলিল। লরী বোঝাই করিয়া মালপত্র পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। যতদূর দেখা যায় পাহাড়ের পর পাহাড় তুষারচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। উপরে শরতের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। পথে গোরা-সৈন্য, অফিসার, কেরাণী, চাপরাশি—সকলের মুখেই আনন্দ-ঔজ্জ্বল্য। পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া সারবন্দী অসংখ্য মোটর লরী আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিয়াছে। কোলাহলে কলরবে, বিদায় অভিবাদনে সারা পথ মুখর।

আমার গাড়ী ছিল অনেক পিছনে, সুমুখে অনেক দূরে একটা গোলমাল উঠিতেই আমার আগের গাড়ীগুলি থামিয়া গেল। পথের উপর নামিয়া সকলে সেইদিকে ছুটিতে লাগিল। কে একজন নাকি মোটর চাপা পড়িয়াছে। আমি ছিলাম মেকানিকাল্ ট্রান্স্পোর্টের লোক। পিছন দিক হইতে চীৎকার করিয়া বলিলাম। 'গো অন্. থামবার সময় নেই!'

সত্যই একজনের দুর্ঘটনায় সকলের গতিরুদ্ধ হইলে চলিবে না ইহাই আমাদের নিয়ম, নিয়মকে স্বীকার করিতে হইবে, আমরা সৈন্য। আমি আমার গাড়ীখানাকে অতি কষ্টে পাশ কাটাইয়া লইয়া চলিলাম। পার হইবার সময় গাড়ীর উপর হইতে দেখিলাম, সেই দুর্ভাগ্যকে সকলে মিলিয়া এম্বুলেন্সে তুলিবার আয়োজন করিতেছে। সে তখন অচেতন, হয়ত নাও বাঁচিতে পারে, হয়ত বা বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু নিকটে আসিয়া হঠাৎ যেন দিশাহারা হইয়া গেলাম। এ যে সেই সবুজ রংয়ের বোরখা, সেই লাল কালির দাগ, হাতের কাছে একটা সাদা সুতার সেলাই, পায়ের দিকে খানিকটা ছেঁড়া! এ যে সেই আমার নীরব নারী-শ্রোতা!

গাড়ী হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু আরো দেখিবার বাকি ছিল। আমি ব্রান্ডি খাইতাম। পকেটে সকল সময় বোতল থাকিত। খানিকটা ব্রান্ডি খাওয়াইবার জন্য তাহার মুখের ঢাকা খুলিতেই আমার তার সংশয় রহিল না—এ লালি, লালি—লালি ছাড়া আর কেহই নয়।

অদ্ভুত বিস্ময়ে ও আবেগে অভিভূত হইয়া পুনরায় মোটরে আসিয়া উঠিলাম, হৃদয় লইয়া কারবার করিবার সময় নাই, মোটরের স্পীড্ বাড়াইয়া দিলাম। ভাবিলাম এই দূর পথে, এই হিংস্র দানব-গতি মোটর-লরীর বিপজ্জনক পথে সে আসিয়া দাঁড়াইল কেন? বক্‌শিসের লোভ? প্রেম? শিল্পীর প্রতি অনুরাগ? কে জানে!

মোটরের স্পীড্ আরো বাড়াইয়া দিলাম। এসব কথা ভাবিবার সময় নাই, বাসায় পৌঁছিয়া একটা গল্প আরম্ভ করিতেই হইবে।

অবশিষ্ট তার আর কিছু নেই, একথা সহজেই বলা চলে। যৌবনকাল তার শেষ হয়ে গেছে। আমিও তাকে দেখেছি অনেক দিন। তিন বছর প্রায় হোলো। কপালে তার মাত্র দুটো রেখা ছিল প্রথম-প্রথম ; কিন্তু তৃতীয়টা কবে অলক্ষ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেও তা লক্ষ্য করেনি, আমিও না।

'আরসিতে মুখ দেখতে আমি ভালবাসিনে···ছেলেমানুষী এমন—'ভুসোকালী-মাখা হাতখানা তুলে সে মাথার ঘোমটা একটু টেনে ছিল,—'একই চেহারা দেখছি চল্লিশ বছর ধ'রে, নিজের কাছে নিজেই পুরনো !'

চটগুলো দাগি ক'রে গুণে গুণে সে দেয়, আমি সেই অংকটা খাতায় টুকে নিই। একই চটকলে আমার সঙ্গে চাকরি করে। নাম তার নেত্য। বাঁকুড়ার কোন্ গ্রামে অনেকদিন আগে ছিল ঘর, কিন্তু সে সব চুকে-বুকে গেছে। স্বামী তার একজন ছিল বৈ কি, কিন্তু তার কথা খুঁটিয়ে আমি এই তিন বছরের মধ্যে একদিনো শুনিনি। একদিন তাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'কবেকার কথ, সে কি মনে পড়ে ?

তারপরের ইতিহাসটা বলতে সে আমাকে কুণ্ঠাবোধ করেনি। একটি স্বভাব-সরলতা তার দেখেছি। বোকা নয়। জীবনের বহু ঘাট তাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আসতে হয়েছে।

'ত ক'—একটি লিখল সে চটের উপর অতি যত্নে, তারপর হাসিমুখে বললে, 'আচ্ছা, হেসো না তুমি, যদি রোজ আরসিতে দেখতাম নতুন নতুন নিজের চেহারা, ধরো রোজ বদলাচ্ছে···হ্যাঁ, সবাইত হাসবে তোমার মতন—'

রূপ তার নেই, আগেও ছিল না। দাঁতের মাড়িটা তার বিসদৃশভাবে চওড়া, হাসলে তার দাঁতের দিকে আর তাকানো যায় না। গলার নীচে বুকের কাছাকাছি তার একটা উল্কিকাটা 'মদনমোহনের' ছবি। মাথার চুল অনেকটা উঠে গিয়ে তাকে আরো কুরূপ করেছে। কিন্তু এই কুরূপের খরিদ্দারও ত জুটেছে। কেন জুটেছে তাই ভাবি।

এত কুশ্রী চেহারা কিন্তু সামান্য কারণে এক মুখ হাসি হাসলেই তার সেই কুশ্রীতায় একটি ছন্দ দেখা যেতো। হাসিতেই তার রূপ। স্বভাবসরল পরিচ্ছন্ন তার সেই হাসি। এই ঐশ্বর্যে সে জয় করে পুরুষের মন। পুরুষের আছে জন্মগত সৌন্দর্যপিপাসা।

'চাকরি করা কি মেয়েমানুষের ভালো ?'—এই প্রশ্নটা নেত্য নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে। আমার উত্তরটা শোনবার তার দরকার নেই।

'কিন্তু না করেই বা করব কি বলো। পরের হাততোলায় থাকলে পেটের ভাত স্থায়ী হয় না।'

'তবে আর কি, চাকরি করাই ত ভালো।'

'কেমন করেই বা ভালো! টাকা থাকে কি আমার হাতে? সব টাকাই ত দিই প্রভুর চরণে।'

'কেন দাও?'

নেত্য হাসলো। সেই বিশ্রী মাড়ি-বার-করা সুন্দর হাসি। বললে, 'দিতেই ভালো লাগে।'

চিনি আমি নেত্যর সেই লোকটাকে, যে-লোকটা অম্লান-বদনে নেত্যর টাকাগুলি হাত পেতে নেয়। দ্বিধা-সংকোচ কিছু নেই, এ যেন তার পাওনা, চিরকালের পাওনা। একটি নারীর আত্মসমর্পণের ষোলো আনা সুবিধা সে নেয়। মাঝে মাঝে তাড়ি খেয়ে হল্লা করতেও তাকে দেখেছি।

এ নেশাও তার একদিন কাটল। কাটল অতি সহজেই। কোনো নাটক নয়, সংঘাত নয়, বিদায়ের পালা গাওয়া নয়। এই প্রত্যাশা নিয়েই নেত্য বসেছিল। তার অবারিত খোলা দরজায় পুরুষের অবারিত প্রবেশ ও প্রস্থান। সতর্ক হওয়া তার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

'শুনেছ, আর সে আসবে না?'

'জানতাম আমি।' বললাম।

'হ্যাঁ, তা জানবেই ত। তোমারই জাত সে। তাই ব'লে আমি দুঃখ করব?' —নেত্য হেসে বললে 'যাবে বলেই ত সহজে আসে।'

গলা নামিয়ে সে পুনরায় বললে, 'তুমিও জানো যা বলছি। যত্ন করার মানুষ না হ'লে একলা বেঁচে থাকা বড় শক্ত।'

বললাম, 'কিন্তু ধরো তোমার এই বয়সে—'

'এই বয়সে? হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গেছি বটে। কিন্তু মরণ ত হবে, ফেলবার লোক কে থাকবে তখন। চাকরি ক'রে খাওয়াবো যাকে চিরকাল, মুখে সে একটু আগুনও দেবে না। আমার মদনমোহনের দয়ায়—'

'তবু ত সবাই তোমাকে ঠকালে।'

'হ্যাঁ, আমিও ঠকাবো একদিন যেদিন মরব। হঠাৎ মরব একদিন, কাছে যে থাকবে তার ওপরেই শোধ তুলে নেব সব।

'যদি কেউ না থাকে? তোমার মদনমোহন সেদিন ত আর এসে দাঁড়াবে না।'

'দাঁড়াবেন বৈ কি। অমন কথা বলতে নেই।' কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে নেত্য হাসলো। পুনরায় বললে, 'এত করলাম তোমাদের জন্যে, আর শেষের দিনে আমি থাকব একলা? বিচার নেই পৃথিবীতে?'

সন্ধ্যা-প্রদীপটি ঘরের দরজায় রেখে দেয়ালে মাথা ঠুকে একটি প্রণাম ক'রে নেত্য বললে, 'তুমি যাই বলো, এখনো আমার শেষ হয়নি, ফুরোয়নি সব।

মদনমোহনের নৈবিদ্য এখনো অনেকবার সাজাতে পারব। সকলের মধ্যেই তিনি।'

'এর পরে আবার তুমি ভালবাসবে ?'

'নৈলে বাঁচবো কেমন ক'রে ?'—আবার হেসে নেত্য তার ঘরে চ'লে গেল।

কলের বাঁশী বাজবার একটু আগে সেদিন নেত্য এসে ঘরে ঢুকল। বললে, 'সকাল থেকেই শুনছি, তোমাদের এদিকে এত চেঁচামেচি কেন ?'

বললাম, 'বিরিজলালের বৌটা—প্রসব বেদনা—'

'ও।' ব'লে নেত্য দাঁড়ালো।

দিন-মজুরদের এই ক্লিষ্ট ক্লিন্ন জীবন-যাত্রার ভিতরেও প্রকৃতি আপন পুনরুক্তি ক'রে চলেছে অবিশ্রান্ত। জীবন ও মৃত্যুর আলো-ছায়া। নেত্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

'আচ্ছা বলো ত, ছেলে হবে, না মেয়ে ?'

'কেমন ক'রে জানব ?'—বললাম।

নেত্য বললে, 'বিরিজলালের বৌ কি চায় জানো?'

তার কণ্ঠে ছিল কিছু উত্তেজনা, কিছু কম্পন। মুখ তুলতেই সে বললে, 'আমি জানি, আমি জানি ও চায় মেয়ে! মেয়ে হলেই বৌটা খুশী হবে।'

'কেন ?'

'দুর্ভাবনা থাকবে না, কাঁদবে না। ছেলে বড় হ'লেই হবে পুরুষ। নিষ্ঠুর, দুরন্ত পুরুষ। আমারো একটি ছেলে ছিল—'

'তোমার ছেলে ?'

'হ্যাঁ, আমারই—' নেত্যর মুখের উপর একটি বিস্মৃতপ্রায় অতীত জীবনের কমনীয় মাতৃমূর্ত্তি ভেসে উঠল। সে আমার চোখের ভুল নয়, মায়া-কল্পনা নয়।

'আমারই পেটের ছেলে, বিশ্বাস করো, বড় হলো সে দিনে দিনে। আমার বুকের ভেতর ভয়ে কাঁপতে লাগলো, সেও ত অত্যাচারী হবে পাপ করবে! বুঝতে পারো না, দেখতে পাও না যে, তারা দেয় না ভালোবাসার দাম ? বারে বারে তারা বুক ভেঙে দিয়ে যায় মেয়েমানুষের? আঃ, আমি মদনমোহনের পুজো দেবো, পুরুষ যেন আর পৃথিবীতে না জন্মায়।'

'তোমার সেই ছেলে কোথায় ?'

'পনেরো বছরের হয়ে মারা গেছে। বেঁচে গেছি ভাই।' ব'লে নেত্য হাসলো। তার চোখের জল চক্ চক্ ক'রে উঠল। কিন্তু সেটি করুণ বাৎসল্যময়ী মাতৃমূর্তি, সে-দুঃখের গোপনতম রহস্যটি আমি বুঝিনে।

'বাঁশী বাজল। এসো যাই।'—ব'লে নেত্য অগ্রসর হোলো। আমি তার অনুসরণ করলাম। হ্যাঁ, বিরিজলালের বৌটা খুব কষ্ট পাচ্ছে।

বন্যাসঙ্গিনী

স্টেশন থেকে কিছু দূরে ট্রেন দাঁড়াল। এদিকটায় এখনও বন্যার জল এসে পৌঁছয়নি। স্টেশনে জায়গা কম, নিরাশ্রয় বুভুক্ষু জনতা আজ চার দিন হ'ল ওখানকার এলাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। তা ছাড়া পানীয় জল নোংরা, মাষ্টার মহাশয় সাবধান ক'রে দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ আর মড়ক আরম্ভ হয়ে গেছে।

একদল স্বেচ্ছাসেবক গাড়ী থেকে লাইনের ধারে নেমে পড়লো। এর পরের গাড়ীতে চাল ডাল আলু কাঠ কাপড় আর কলেরা ও ম্যালেরিয়ার ঔষধ এসে পড়বে এমন ব্যবস্থা করা আছে। তার জন্য এখানেই কোথাও অপেক্ষায় থাকতে হবে। বহু জায়গায় সেবাসমিতির কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

কিন্তু চারিদিকে চেয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা গেল, কেবলমাত্র জলামাঠ, বিনষ্ট ধানের ক্ষেত, কোন কোন গ্রামের অস্পষ্ট চিহ্ন। আর কিছু না। রেলপথের বাঁধের উপর ঝড়ের মতো তীব্র বাতাস সন্ সন্ ক'রে বয়ে চলেছে। নবীনবাবু কিয়ৎক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন—নদীটা পশ্চিম দিকে, নয় ?

স্বেচ্ছাসেবকেরা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। কেউ জানে না নদী কোন্ দিকে। মাষ্টার-মশাই ছাড়া আর সবাই অনভিজ্ঞ।

নবীনবাবু পুনরায় বললেন—শুনতে পাচ্ছ দূরে জলের উচ্ছ্বাস ? বোধ হয় ঐদিকে, ঐ যেন দেখা যাচ্ছে, নয় ? ঐদিক থেকেই ত ঝড় আসছে। ওটা বোধ হয় মেঘ, কেমন ?

কেউ আর উত্তর দিল না। সকলের কৌতূহলী চক্ষু কেবল চিন্তাকুল হ'য়ে দিগন্ত-বিস্তার জলামাঠের দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কোনো দিকেই কূল-কিনারা দেখা যায় না। আকাশ অন্ধকার।

সুরেশ্বর পশ্চিম দেশের ছেলে, বন্যার অভিজ্ঞতা বিশেষ তার নেই। সে বললে—মাষ্টার-মশাই, আমাদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় হবে ? মানুষের চিহ্নও ত কোথাও নেই।

নবীনবাবু হাসলেন। বললেন—থাকবার জন্যে ত আস নি হে, এসেছ কাজ করতে। আমাদের অনেককেই ভেলার ওপরে ভেসে রাত কাটাতে হবে। কুড়ি সালের বন্যার চেহারা যদি তুমি দেখতে হে—

—আমরা যাব কোন্ দিকে এখন ?

—চলো, লাইনের পশ্চিম দিক দিয়েই যাবার চেষ্টা করি। কি বলো হে অবনী,—তুমি দেখছি ভয় পেয়ে গেছ।

সকলের সঙ্গেই নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু আসবাব ছিল। সেগুলি সবাই পিঠের দিকে তুলে নিলে। অবনী কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললে—ভয় নয় মাষ্টার-মশাই, ভাবছি সাঁতারটা শিখে নিয়ে ভলাণ্টিয়ারি করতে এলেই ভাল হ'ত।

অন্যান্য ছেলেরা হেসে উঠে বললে—এইটেই ত ভয়ের চেহারা অবনীবাবু।

পশ্চিম দিকে পথ নেই। স্টেশন ঘুরেই যেতে হবে, নইলে পথের দাগ পাওয়া যাবে না। সবেমাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, পথ পিছল। বেলা জানা যায় না, হয়ত বারোটা হবে। ঘন মেঘে আকাশ পরিব্যাপ্ত। মাঝে মাঝে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে শকুনির পাল। স্বেচ্ছাসেবকের দল কেমন যেন ভারাক্রান্ত মনে রেলপথ ধ'রে চলতে লাগল।

কুড়ি সালের বন্যায় এসেছিলুম স্বেচ্ছাসেবক হয়ে।—নবীনবাবু বলতে লাগলেন, তখন কলেজে পড়ি। তমলুকের এক গ্রামে যে দৃশ্য দেখেছি, ভুলব না কোনোদিন।

সবাই চলতে চলতে তাঁর কথায় উৎকর্ণ হয়ে রইল। তিনি বললেন—বছর কুড়ি-বাইশ বয়সের একটি মরা মেয়েকে একটা প্রকাণ্ড বাঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আশ্চর্য এই যে, বাঘটাও বানের জলে ভাসা, দুর্ভিক্ষপীড়িত। থানার জমাদারকে ডেকে এনে বন্দুক দিয়ে সেটাকে মারা হ'ল···একটি গুলিতেই ঠাণ্ডা! যেন বসেছিল সে মরবারই অপেক্ষায়। ওঃ, সে দৃশ্য কখনও ভুলব না।

কিছুদূর এসে স্টেশনে জনতা দেখা গেল। তারা সবাই দরিদ্র। নবীনবাবু বললেন—ওরা সর্বস্বহারার দল। কাছে যাব না, ঘিরে ধরবে। আমাদের কাছে কিছু নেই এখন একথা শুনলে ওরা অপমান করবে আমাদের, পেটের জ্বালায় ওরা মরিয়া। ঐ দেখ ডাকছে আমাদের, ওদিকে আর এগিয়ে কাজ নেই। ভূমিকম্প আর বন্যা, এ দুটো মানুষের সমাজে সকলের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে।

স্টেশনে এসে স্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানা গেল, রাত্রের দিকে এদিকে জলপ্রবাহ আসতে পারে, কারণ, আজসকালে আবার সাত জায়গায় নদীর বাঁধ ভেঙেছে। দশ মাইলের মধ্যে প্রায় তেরখানা গ্রাম ভেসে মিলিয়ে গেছে। মৃত্যুর সংখ্যা এখনও জানা যায় নি। নৌকা ছাড়া হেঁটে সাহায্য বিতরণ করার কোনো উপায় নেই। অল্প খানিকটা পথ মাত্র পায়ে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাবধান থাকবেন আপনারা, পুলিশ পাহারা আর পাওয়া যাবে না, কাল থেকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব বড্ড বেড়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে?

—আজ্ঞে না।

—তবে ত মুস্কিলে ফেললেন। এ ছাড়া জল বাড়লে এদিককার শেয়ালগুলো ক্ষেপে যায়, ক্ষ্যাপা শেয়াল হঠাৎ কামড়ালে কিন্তু শিবের অসাধ্য। জলের তাড়া খেয়ে, জঙ্গলের তাড়া খেয়ে জঙ্গলের জানোয়ারগুলো সব লোকালয়ে এসে ঢুকেছে। এদেশে আর বাস করা চলে না মশাই, প্রকৃতির কাছে মার খেয়ে খেয়ে জাতটার অধঃপতনের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

কথাটা এমন কিছু নয়, কিন্তু উপস্থিত সকলে এখানে দাঁড়িয়ে যেন মনে মনে এর একটা গভীর সত্যকে উপলব্ধি করতে লাগল।

কথাবার্তা চলছে এমন সময় কোথা থেকে দুটো লোক ব্যাকুল হ'য়ে এসে মাষ্টার-মশায়ের কাছে কেঁদে পড়ল,—ও বাবু, সব্বোনাশ হ'ল আমাদের, সাপে কামড়েছে বাবু, কর্তা আমাদের আর বাঁচে না,—বাবুগো তুমি বাঁচাও।

নবীনবাবুর দল চঞ্চল হয়ে উঠল। মাষ্টার-মশায় বললেন—থাম্ থাম্, চেঁচাস নে। যা এখান থেকে। কে হয় তোর?

—আজ্ঞে বাবু আমার বাবা।

—বয়স কত?

—তা ষাইট হবে বাবু। বাঁচাও বাবু, পায়ে পড়ি—

—যা দড়ি দিয়ে বাঁধগে। বাপের কথা পরে, মা-বোনকে সামলাগে যা। মাষ্টার-মশাই বললেন—হ্যাঁ মশাই গো, কে কার খবর রাখছে! যা বেটারা, দাঁড়াসনে এখানে। আপনারা খুব সতর্ক থাকবেন, বন্যার সাপ মানুষ দেখলেই কামড়ায়। ওদের গর্তগুলোও যে গেছে জলে জীর্ণ হয়ে। ব'লে স্টেশন্ মাষ্টার-মশাই অকারণে হাসতে লাগলেন।

লোকগুলো কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যাচ্ছিল, নবীনবাবুরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। যদি বা লোকটাকে বাঁচানো যায়।

কিন্তু অনেক চেষ্টাচরিত্র, অনেক তুক্‌তাকের পরেও বৃদ্ধকে কোন রকমেই বাঁচানো গেল না। নবীনবাবু তাঁর সঙ্গী ছেলেদের নিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে অন্যত্র চ'লে গেলেন। বন্যার মৃত্যু কেবল জলেই নয়।

পরের ট্রেনে যখন রসদ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এসে পৌঁছল তখন বেলা আর বাকি নেই। কল্‌কাতা থেকে উৎসাহী যুবকের দল এসে হাজির। গাড়ী থামতেই জনতার কোলাহল শুরু হ'ল। ক্ষুধার উন্মত্ত যারা তারা গাড়ী আক্রমণ করলে। তারা বাধা মানে না, তাদের অপমানবোধ নেই। কল্‌কাতা-কেন্দ্রের সবাই প্রায় নবীনবাবুর পরিচিত। তিনি সদল-বলে গিয়ে জনতাকে সংযত করতে লাগলেন।

এদিকে ঘন্টাখানেক এমনি ধস্তাধস্তি, ওদিকে কয়েকজন ছেলে ইতিমধ্যে গিয়ে নৌকার ব্যবস্থা ক'রে এল। আগামী কাল প্রভাতে দূরের গ্রামগুলির দিকে অভিযান করতে হবে। যত দূরে হেঁটে যাওয়া যায়, ঠেলাগাড়ীতে আর কুলির পিঠে রসদ যাবে।

দুর্যোগের আর শেষ নেই। হাঁটু পর্যন্ত কাদা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, তীব্র বাতাস, পিঠে-বাঁধা পুঁটুলি—এমন অবস্থায় নবীনবাবু এবং তাঁর সঙ্গী এগারজন যুবক পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে বর্ষাকালের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ক্ষ্যাপা শেয়াল এবং সাপের ভয়ে সবাই ছিল সতর্ক। গাছের ডাল কয়েকটা

ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা গেছে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় সেগুলি ব্যবহার করার শক্তি কুলোবে কি না এই ছিল আন্তরিক প্রশ্ন।

নবীনবাবুর মুখে-চোখে চিন্তার ছায়া। প্রতি মুহূর্তেই তাঁদের কর্তব্যের চেহারাটা কঠিনতর হয়ে উঠছে, নানাদিকে নানান্ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ছেলেদের মধ্যে উৎসাহটা কিছু স্তিমিত।

বহু কষ্ট এবং পরিশ্রমের পর মাইল তিনেক পথ পার হয়ে এক গ্রামের কয়েকটা চালাঘর পাওয়া গেল। স্টেশনমাষ্টার-মশাই এর সন্ধান নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন। ঘরগুলির দারিদ্র্যের চেহারা সুস্পষ্ট। ঝড়-জলের পক্ষেও নিরাপদ আশ্রয় নয়। তবু এ ছাড়া আজকের রাত্রে আর গতি নেই। যেন কিছু দুর্লভ বস্তু আবিষ্কার করা গেছে, এমনি ভাবে সুরেশ্বর প্রমুখ ছেলেরা দ্রুতপদে এসে চালার উপরে উঠল।

একটা প্রকাণ্ড কুকুর একধারে চুপ ক'রে বসেছিল, সে ডাকলও না, উঠলও না—তেমনি করেই ব'সে রইল। গোলমাল শুনে পাশের একখানা কুঠুরী থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। লোকটার মুখে প্রকাণ্ড পাকা দাড়ি, পাকা চুল, পরণে একখানা লুঙ্গি—লোকটি মুসলমান। নবীনবাবু এগিয়ে এসে বললেন—আজ আমরা রাত কাটাবো এখানে মিঞাসয়েব। জায়গা দেবে ত ?

বৃদ্ধ সবিনয়ে হাসলে। বললে—কষ্ট হবে, আপনারা ভদ্দলোক। কল্‌কাতা থিগে এসেছেন ?

—হাঁ, মিঞাসায়েব। বুঝতেই ত পাচ্ছ কি জন্যে আসা। কুকুরটা রাতের বেলা হঠাৎ কামড়ে দেবে না ত ?

—না বাবু, ওর আর কিছু নেই ! উপোস ক'রে ক'রে—ব'লে ব্যথিত দৃষ্টিতে প্রান্তরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে বৃদ্ধ একবার তাকালো।

অবনী বললে—তোমার এখানে কে কে আছে মিঞা ?

কেউ না, একাই থাকি বাবু। ইস্তিরি ম'রে গেছে, ছেলেটা চাকরি করে আসানসোলে রেলের কারখানায়। আমি আজও এই চালাটার মায়া কাটাতে পারি নি। তবে এইবার বোধ হয় পারব, নদীর বাঁধ ফেঙেছে।—ব'লে সে এক রকম অদ্ভুত হাসি হাসলে।

হারিকেন লণ্ঠন গোটা-চারেক সঙ্গেই ছিল, আলো জ্বালা হ'ল। সুরেশ্বর বললে—এখানে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যাবে মিঞা ?

—ভিজে কাঠ বাবু, চলবে ? রাঁধবেন বুঝি :

—হ্যাঁ, রাঁধব। জল পাব কেমন ক'রে ?

বৃদ্ধ হাসলে। বললে—জল ত আছে কিন্তু আমার জল···আপনারা হিঁদু—

নবীনবাবু বললেন—এখন আর হিঁদু নয়, এখন কেবল মানুষ। বেশ, দরকার হ'লে জল চাইব। তোমার খাবারও আমাদের সঙ্গে হবে, মিঞাসায়েব।

কুকুরটা মুখ তুলে একবার বক্তা ও শ্রোতার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

বৃদ্ধ তার পিঠ চাপড়ে সস্নেহে বললে—বাবুরা তোকেও ফাঁকি দেবে না, বাবুরা ভাল। বুঝলি রহমন ?

—ওর নাম রহমন বুঝি ?—অবনী সবিস্ময়ে বললে।

—আদর ক'রে ডাকি বাবু।—ব'লে বৃদ্ধ কাঠ আর জলের ব্যবস্থা করতে গেল। লোকটি বড় ভাল।

ঘর দ'খানার জানলা-কপাট বলতে কিছু নেই। ভিতরে প্রবেশ করবার সাহস কারও ছিল না। পোকামাকড়, সাপখোপ, এমন কি ক্ষ্যাপা শিয়ালের অবস্থিতিও অসম্ভব নয়। এই দাওয়ার ধারেই যেমন ক'রে হোক আজকের রাত কাটাতে হবে। এগারটি ছেলে আর নবীনবাবু সেই ব্যবস্থার দিকে মনঃসংযোগ করতে লাগলেন।

কাঠ এল, জলের ব্যবস্থা হ'ল। বৃদ্ধ নিঃশব্দে তাদের সুবিধা ক'রে দিতে লাগল; মুখে চোখে তার একটুও উদ্বেগ নেই। অতিথিগণের প্রতি আদর-আপ্যায়নের আতিশয্য দেখা গেল না। কুকুরটা এগিয়ে এসে বসলো। অর্থাৎ, তাকে যেন কেউ ভুলে না যায়, সেও সকলের একজন।

বিপিন বললে—যদি বন্যা আসে, তুমি এর পর কোথায় যাবে মিঞা ?

শাদা মাথার চুল আর দাড়ির ভিতর দিয়ে এই বিচিত্র বৃদ্ধ মুসলমানের মুখে হাসির রেখা আবার দেখা গেল। তার অর্থ আছে, কিন্তু সেটা রহস্যে ভরা। বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত হ'লেও তার এই সায়াহ্নকালের অটল ধৈর্য একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না—সে হাসির মধ্যে এ অর্থটুকুও বোধ হয় লুকিয়ে ছিল। তবু সে মৃদুকণ্ঠে বললে—আল্লার হুকুম যেদিকে হবে বাবু।

কথাটা সামান্য ও সুলভ। কিন্তু এত বড় সত্য সংসারে বোধ হয় আর কিছুই নেই। সবাই মুখচাওয়া-চায়ি করতে লাগল। এর পরে বিপিনের আর কিছু বলবার ছিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি ঘনিয়ে এল। জোরে বৃষ্টি নামল, তার সঙ্গে ঝড়ের বাতাস। সম্মুখের বিশাল প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে বিক্ষুব্ধ বর্ষার দুরন্তপনা চলেছে, কিন্তু তার কিছুই দেখা যায় না। দাওয়ার এক প্রান্তে কাঠের আগুন অতিকষ্টে জ্বালানো হ'ল। পথশ্রমে সবাই অবসন্ন, তবু আহারের আয়োজন না করলে কিছুতেই চলবে না। দাওয়ার এক ধারে চালার নীচে দিয়ে জল পড়তে লাগল। রাত্রি অতিবাহিত করা এখন প্রবল সমস্যা।

পরম উপাদেয় ভোজ্য—রুটি, আলুসিদ্ধ আর নুন—সবাই মিলে অপরিসীম আগ্রহে আহার করলে। বৃদ্ধ খেয়ে অশেষ আশীর্বাদ জানালে, এবং রহমন সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে এই পরোপকারী দলের দিকে একবার চেয়ে এক পাশে গিয়ে বসলো। আহারাদির পর শোবার পালা। কিন্তু সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়। ঠিক হ'ল প্রতি দফায় আটজন ঘুমোবে, চারজন ব'সে থাকবে এমনি ক'রে তিন দফায় রাত্রি কাটবে। কুকুরটা থাকাতে সকলের মনে একটু সাহসও হ'ল। একটা আলো সমস্ত রাত জ্বালানোই থাকবে।

প্রথম দফায় নবীনবাবু প্রমুখ আটজন জলের ছাট বাঁচিয়ে দেয়াল ঘেঁসে জায়গা সঙ্কুলান ক'রে নিলেন। পা ছড়ানো যাবে না—বড় সংকীর্ণ। তবু পা গুটিয়ে কাত হয়ে তাঁরা চোখ বুজলেন। হাতঘড়িটা দেখে সুরেশ্বর বললে—রাত এখন ন'টা।

তৃতীয় দফায় রাত শেষ হবে। যারা পাহারায় বসেছিল তাদের চোখেও তন্দ্রা নেমে এসেছে। আলোটা জ্বলছে। দাওয়ার নীচে থেকেই সুদূর প্রান্তরের সীমানা—সেখানে অন্ধকারের পর অন্ধকারের দল। প্রেতপুরীর মতো পৃথিবী নীরব, কেবল দূর-দূরান্তরের ঝিল্লী ও দাদুরীর আওয়াজ নিরন্তর নিশীথিনীকে বিদীর্ণ ক'রে চলেছে। বৃষ্টির শব্দ আর শোনা যায় না।

যারা পাহারায় বসেছিল, তাদের মধ্যে একটি ছেলে হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে আচমকা তাকালো। অস্পষ্ট আলোয় এক ছায়া-মূর্তির দিকে চেয়ে বললে—কে তুমি, কি চাও ?

গলার আওয়াজটা তার অস্বাভাবিক রূঢ় আর উচ্চ। নবীনবাবু এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে বসলেন।—কে হে কালু, কোথায় কে ? আরে, কে তোমরা ?

বলতে বলতেই দেখা গেল একটি লোক ছোট একটা তোরঙ্গ মাথায় নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে একটি বারো-তের বছরের কিশোরী মেয়ে।

লোকটি বললে—চলেই যাচ্ছিলাম, আলো দেখে এলাম এদিকে বাবু। একটু জায়গা দেবেন আপনারা, রাতটুকু কাটিয়ে যাব ?

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। বিপিন বললে—কোথা থেকে আসছ তোমরা ?

আসছি তারকপুর থেকে। জলে গ্রাম ঘিরে ফেললে, সন্ধ্যে থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি, এবারে বন্যা ভয়ানক বাবু। আমার নাম ঈশ্বর, এটি আমার মেয়ে ; এর মা নেই।

মেয়েটি এবার বললে—দাও না বাবুরা একটু জায়গা, কাল সকালেই চ'লে যাব।

নবীনবাবু এবার তাড়াতাড়ি বললেন—এস মা এস, এখানে আমরাও যা, তোমরাও তাই। এস ভাই ঈশ্বর, নামাও তোমার তোরঙ্গ। অনেকদূর হাঁটতে হয়েছে, কেমন ?

ঈশ্বর বললে—হ্যাঁ বাবু, প্রায় বিশ মাইল আসতে হ'ল।

—বিশ মাইল ! দূর পাগল, এইটুকু মেয়ে বিশ মাইল—মাইলের জ্ঞান তোমার খুব দেখছি !

ঈশ্বর বললে—বিশ্বাস যাবেন না বাবু, আটখানা মাঠ পার হয়ে এলাম···আমার মেয়ে আরও বেশী হাঁটে।

সবাই স্তম্ভিত হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। নবীনবাবু কেবল অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—রাত কত হে সুরেশ্বর ?

হাতঘড়ি দেখে সুরেশ্বর বললে—তিনটে বাজে মাস্টার-মশাই।

তোরঙ্গটা নামিয়ে সেই বলিষ্ঠ লোকটা একপাশে বসলো। মেয়েটা বসলো তার পাশে। গায়ে একটা পুরনো জামা, পরনে খাটো একখানা শাড়ী, মাথায় খোঁপা চুড়ো ক'রে বাঁধা, হাতে দু-গাছা রাঙা মাটীর রুলি। রূপ তার তেমন নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যটা ভাল।

নবীনবাবু বললেন—তোমার নাম কি মা ?

মেয়েটি বললে—আমার নাম ভুনি।—এই ব'লে সে বাপের কাছে ঘেঁষে ছোট তোরঙ্গটায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল, ঘুমে সে নেতিয়ে পড়েছে, নাক ডাকছে।

নবীনবাবু বললেন—বাড়ি কোন্ গ্রামে বললে ?

—বাড়ি নেই বাবু, এখন আসছি তারকপুর থেকে। সেখানে ক্ষেতে জল ছেঁচতাম। বাপ-বেটির ভাত-কাপড় জুটে যেত।

—দেশ কোন্ জেলায় ?

—বাঁকুড়ো। সে অনেক দিনের কথা।—ঈশ্বর বললে, দুবছর ধান হ'ল না, জমিদারকে জমি ছেড়ে দিয়ে গেলাম কালিমাটি। পেটের দায়ে নিলাম কারখানায় কাজ। সেখানে ওলাউঠোয় ছোট ছেলেটা ম'রে গেল। বউ বললে, আর এদেশে নয়।

—তার পরে ?

ঈশ্বর বললে—পায়ে-হাঁটা দিয়ে মেদিনীপুর। সেখানে রতনজুড়ির হাটে সোম-শুক্কুরে তরকারি বেচতে বসলাম,—মেয়েটা তখন দু-বছরের। চোৎ মাসের দিনে গাঁয়ে লাগল আগুন—মশাই গো, ঘর বাঁচাতে পারা গেল না, ঘরসুদ্ধু বউটা আগুনে মোলো। দূর হোক গে, মেদিনীপুর আর ভালো লাগল না, মেয়েটকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গরীবের জীবন, বাবু।

নবীনবাবু বললেন—মেয়েটাকে ত বড় ক'রে তুলেছ ভাই, এই তোমার লাভ !

ঈশ্বর হেসে বললে—মেয়েটাও মরবে একদিন, ও কি আর থাকবে! সেবার ডুবে গিয়েছিল কাঁশাই-নদীতে, একজন মাঝি তুললে টেনে; বলব কি বাবু একবার হারিয়ে গেল খড়্গপুরে। মেয়েটার জান্ বড় শক্ত। সেই যে চল্লিশ সালের বন্যে, মনে আছে ত বাবু, গিয়েছিলাম, খতম হয়ে···ও বেটিকে গাছে চড়িয়ে দিয়ে আমি ভেলায় চেপে রইলাম, সেবার তোমাদের দেশের এক বাবুর দয়ায় মেয়েটা বাঁচলো। এই বলে সে চুপ ক'রে গেল।

সুরেশ্বর ব্যগ্রকণ্ঠে বললে—এবার কোথায় যাবে ঈশ্বর ?

ঈশ্বর হাসতে লাগল। এ যেন তার কাছে বাহুল্য প্রশ্ন। এর জবাব দেওয়া সে দরকারই মনে করে না। শুধু বললে—আপনারা কি এদিকে কাজ করতে এসেছ ?

নবীনবাবু বললেন—কাজের কূলকিনারা পাইনে, তবু এলুম যদি কিছু উপকার করতে পারি।

চাল-ডাল বিলোবে, কেমন? একখানা ক'রে কাপড় আর কম্বল, এই ত?—ব'লে ঈশ্বর হাসতে লাগল। তার হাসি, তার কণ্ঠস্বর যেন জগতের সমস্ত বদান্যতাকে নিঃশব্দে বিদ্রূপ ক'রে দিল, এর পরে পরোপকারের আতিশয্য প্রকাশ করা চলে না। নবীনবাবু নীরব হয়ে গেলেন।

শেষ রাত্রির ঘোলাটে অন্ধকারে বাইরের দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর তখনও স্পষ্ট হয় নি। ছেলেরা সবাই জেগে বসেছিল। তারা বোধ হয় ভাবছে, বন্যার প্রবাহে আসে অনেক পাপ, অনেক অন্যায়। জল একদিন নানা খাতে পালিয়ে যায় বটে, কিন্তু রেখে যায় মানুষের লজ্জা, কলঙ্ক, দুষ্প্রবৃত্তি, রোগ আর দারিদ্র্য। যারা বাঁচে তাদের জীবনব্যাপী মৃত্যু আর ধ্বংস।—ঐ অশিক্ষিত নির্বোধ লোকটার হাসির ভিতরে হয়ত এ-কথাটাও ছিল!

চাপা কান্নার শব্দে সবাই সজাগ হয়ে উঠল।

নবীনবাবু বললেন—কে হে, কে কাঁদে?

এদিক-ওদিক সবাইকে তাকাতে দেখে ঈশ্বর হেসে বললে—আমার মেয়েটা গো মশাই, ঘুমোলেই ভুনি কাঁদে, ওর তিন বছর বয়স থেকে এই অভ্যেস। থাক, থাক বাবা—এই আমি আছি ব'সে। ব'লে সে তার মেয়েটার গায়ে বার-দুই হাত চাপড়ালে।

সুরেশ্বর বললে—কাঁদে কেন? অসুখ?

—না বাবু, স্বপন দ্যাখে। ওর বোধ হয় একটু মাথার দোষ আছে···দুঃখু পেয়ে পেয়ে—আমার হাতখানা ওর গায়ের ওপর থাকলে আর কাঁদে না। এই ভুনি, ওঠ বাবা—আলো ফুটল এবার।—ঈশ্বর তার মেয়েকে আবার একবার নাড়া দিলে।

ভোর হয়ে এল। মিঞাসায়েব আর তার কুকুর দুজনেই এল বেরিয়ে। দূরে চেয়ে দেখা গেল, মাথায় মোটঘাট নিয়ে এক দল স্ত্রী-পুরুষ আর ছেলেমেয়ে মাঠ পার হয়ে স্টেশনের দিকে চলেছে। বোঝা গেল, বন্যার তাড়না। সকলে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল। এ ঘর ছেড়ে দিয়ে সকলকেই এবার পালিয়ে যেতে হবে। ভুনি তার বাপের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তার চোখেমুখে কোনো নালিশ, কোনো উদ্বেগ নেই, মৃত্যুর ভয় এই কিশোরীকে একটুও চঞ্চল করে না, তার জীবনের সঙ্গে এ যেন সহজেই জড়িয়ে গেছে। শাড়ীর আঁচলটা কোমরে বেঁধে নিয়ে সে বললে—চলো বাবা। বেশ ঘুমিয়েছি, এবার খুব হাঁটব।

মিঞাসায়েব যা পারল সঙ্গে নিল। কুকুরটাও হাই তুলে প্রস্তুত হয়ে পথে নামল। ঈশ্বর তার তোরঙ্গটা মাথায় তুলে নিয়ে বললে—চলো মিঞা, তোমার সঙ্গেই এগোই। আয় লো ভুনি, আজ কিন্তু খুব হাঁটতে হবে, বুঝলি ত? উপোস করতে পারবি?

ভুনি বললে—পারব, চলো বাবা।

নবীনবাবুর দল নৌকা আর রসদের বিলি-ব্যবস্থার কাজে নামবেন। সুতরাং

তাঁরাও বেরোলেন ওদের সঙ্গে। ভোরের বর্ষার আর্দ্র ঠান্ডায় সকলের শীত ধরেছে। দূরে এবার বন্যার জলের শব্দটা স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল।

মিঞাসায়েব পিছন ফিরে তাকালো না, মায়ামোহে বশীভূত সে নয়। এক সময় বললে—এ বন্যে কিছু নয়, বুঝলে ঈশ্বর, দেখতে যদি ছিয়ানব্বই সালের জল—ব'লে সে কোন্ সুদূর অতীতের দিকে একবার তাকালো।

নবীনবাবু বললেন—জলের বিপদ ভয়ানক, এর চেয়ে মারাত্মক সংসারে আর কিছুই নেই, কি বলো মিঞা?

ঠিক বলেছ বাবুজী।—ব'লে মিঞা হাঁটতে লাগল।

ভুনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—হ্যাঁ বাবা—?

—কি মা?—তার বাপ জিজ্ঞাসা করলে।

—জলে বিপদ বেশী, না আগুনে?

তার অদ্ভুত প্রশ্নে সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সামান্য তার কৌতূহল, কিন্তু তার কথায়, তার চলনে, তার চোখের চাহনিতে আজকের এই সর্বপ্লাবিনী বন্যার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারাটা সকলে মুহূর্তের জন্য একবার অনুভব ক'রে নিলে। বন্যায় তার জন্ম, বন্যায় বন্যায় বিধ্বস্ত তার জীবন।

ঈশ্বরের বলিষ্ঠ বক্ষের ভিতরটা কিশোরী কন্যার এই প্রশ্নে অত্যুগ্র উত্তেজনায় পলকের জন্য একবার আন্দোলিত হয়ে উঠল। অতীত কালের কোনো সর্বনাশা ঘটনা স্মরণ ক'রে কম্পিত কণ্ঠে সে বললে—জলে বিপদ নেই বাবা…এই ত বেঁচেই আছি, কিন্তু আগুনের বিপদ…

কথা শেষ করতে সে পারলে না; বোধ হয় এই কথা বলতে চাইল, আগুনে তার বুক পুড়েছে, তার জীবন পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বরের মুখ ফুটল না, কেবল নিমীলিত চক্ষে চেয়ে ভুনির হাত ধ'রে সকলের সঙ্গে সে পথ হাঁটতে লাগল।

শেষ পৃষ্ঠা

আত্মীয়তা কাহারও সহিত কিছু নাই, গ্রাম-সম্পর্কে অনেকেই তাঁহাকে কাকাবাবু বলিয়া ডাকিত। কোথাও কোথাও তিনি মাষ্টার মশাই বলিয়া পরিচিত। ভদ্রলোকটির বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে, বেশ বলিষ্ঠ, সুপুরুষ এবং সদালাপী। বিবাহ তিনি করেন নাই, কোনোদিনই করিবেন না। আগে অবস্থা খুব ভালই ছিল, আজকাল এ বাজারেও তিনি যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। গ্রামে থাকিতে বহু পরিবারের সুখ-দুঃখের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন, জ্ঞানী ও শিক্ষিত বলিয়া তাঁহার গৌরব সকলের কাছেই সমান। গৃহস্থগণের বধূ ও কন্যা, ছেলে-ছোক্‌রা, প্রৌঢ় ও প্রবীণ সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিত, তাঁহার মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী চলিত, তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত এবং ভালবাসিত। বিপন্ন ও দুঃস্থকে সাহায্য করাটা ছিল তাঁর সকলের চেয়ে বড় গুণ। তাঁহার সৎ চরিত্রের দীপ্তি ও সৌরভ বাহিরকে প্লাবিত করিয়া অন্দরের একান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

তারপর কালক্রমে তাঁহাকে শহরে আসিতে হইল, শহরে আসিয়াও তিনি গ্রামের কথা ভুলিলেন না। গ্রামের ইস্কুলে, মন্দিরে, বারোয়ারিতে, লাইব্রেরীর নামে আজও তিনি নিয়মিত প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন ; তাঁহার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের ছায়ায় অনেকেই ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গ্রামের যে দুই চারি ঘর পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়া বাস করিতেছে তাহাদের সংবাদ তিনি যথেষ্টই রাখেন। বিশেষ করিয়া মিত্র পরিবারের বড় মেয়েটির যে-ঘরে বিবাহ হইয়াছে তাহার খবর তাঁহার কাছে নিত্যই আসে। মেয়েটির নাম বিজয়া ; সে এখন দু'তিনটি সন্তানের জননী।

একদিন শীতের সন্ধ্যায়, তখন খোলা জানালার ভিতরে ও বাহিরে অন্ধকার দল পাকাইতেছিল, ঘরের ভিতরটা নিস্তব্ধ, কেবল একটা টাইম্‌-পিস্‌ ঘড়িতে টিক্‌ টিক্‌ করিয়া শব্দ হইতেছে,—ভিতরের নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিয়া বিজয়া কথা কহিয়া উঠিল, 'মৃণালকে ত আজ তাঁরা দেখে গেলেন!'

একই বিছানায় বিজয়ার বাঁ-পাশে মাষ্টার মশাই অনেকক্ষণ হইতে স্থির হইয়া শুইয়াছিলেন।

'বুঝলেন কাকাবাবু, মৃণালকে আজ তাঁরা—

'বেশ বেশ—' বলিয়া মাষ্টার মশাই একটু নড়িয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'এবার একটা তারিখ ঠিক করে ফেল মা, এই শীতেই,—আর হ্যাঁ, মৃণাল যেন বুঝতে না পাবে তার বিয়েতে ঘটা হচ্ছে না। ঘটা করেই তার বিয়ে দিতে হবে।'

'সে ত আপনি দেবেনই কাকাবাবু, আপনি না থাকলে মৃণালদের অবস্থা যে কী হতো তা ভাবলেও—'

আবার অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। বিজয়া একবার উঠিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল, সুন্দর ও সুসজ্জিত ঘরখানি ঝলমল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বিজয়া আবার আসিয়া লেপের ভিতর প্রবেশ করিল।

'মৃণাল যে-রকম চমৎকার মেয়ে, বিয়ের পর স্বামীকে নিশ্চয় সুখী করবে, কি বল বিজয়া ?'

'যদি স্বামীর মত স্বামী হয় !'

'তা নিশ্চয়ই হবে। এ গ'ড়ে তুলবে ওকে, ও তুলবে একে। বিয়ের মানেই ত এই। তা ছাড়া মৃণাল লেখাপড়া জানে, গত বছর আই-এ পাশ করেছে !

বিজয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর গলা পরিষ্কার করিয়া কহিল, 'আচ্ছা কাকাবাবু ?'

'কি মা ?'

'ধরুন এর সঙ্গে যদি মৃণালের বিয়ে না হয় ?'

'কেন, এ পাত্র ত ভালই, এত বড় একজন ডাক্তার, এত পসার, সুপুরুষ—'

'যদিই ধরুন না হয় ?'

মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'অবশ্য মৃণালকে আমি অল্পদিনই চিনি, আমি জানিনে কেমন পাত্রের সঙ্গে তাকে মানাবে। যদি এর সঙ্গে না হয় আবার অন্য পাত্র খুঁজে আনব !'

বিজয়া এবার আর কথা কহিল না। মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'বুঝলে বিজয়া, মনের মত পাত্রের সঙ্গে মৃণালের বিয়ে দিতেই হবে,—হ্যাঁ, মৃণালকে আমি ত ঠিক বুঝতে পারিনি, তুমিই তাকে জানো,—ঠিক পাত্রটি না পাওয়া পর্য্যন্ত—'

'কাকাবাবু ?—আচ্ছা, একটা কথা আপনি মানেন ?'

'কি বল ত ?'

'আমরা ছেলের দিকটাই দেখি, মেয়ের দিকটা দেখিনে। মৃণালের মতামত শুনলে আপনি রাগ করবেন কাকাবাবু ?

মাষ্টার মশাই ঘাড় তুলিলেন, বলিলেন, 'রাগ করব ? তুমি এখনো আমাকে চিনলে না মা, মেয়েদের মতামতের স্বাতন্ত্র্য থাকলেই আমি খুসী হয়ে কান পেতে শুনি।'

বিজয়া স্মিতমুখে কহিল, 'ও পাত্রকে বিয়ে করা মৃণালের মত নয় !'

'ও। পাত্র কি তার অযোগ্য ?

একটুও অযোগ্য নয়, অমন স্বামী হলে যে-কোনো মেয়েই সুখী হয়। কিন্তু—কিন্তু মৃণালের মত নেই।'

মাষ্টার মশাই নিঃশব্দে বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'বেশ, আবার আমি চেষ্টা করি, আর একটি ভাল পাত্র আমার সন্ধানে আছে, যত টাকাই

লাগুক……আমার দ্বারায় যতটুকু সম্ভব হয়……বুঝলে বিজয়া, মৃণাল যেন সুখী হয় !' বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ একটু হাসিলেন, 'আমার বয়েসটা এতদূরে এসে পড়েচে যে পিছন দিকে দূরে আর কিছুই দেখতেই পাইনে, ঝাপসা দৃষ্টি, সহজ কথাটা সোজা করে বুঝতে পারাটা—'

তিনি হাসিলেন বটে কিন্তু বিজয়া হাসিতে পারিল না ; এই মানুষটিকে সে চিরদিন শ্রদ্ধা করিয়াছে, আপন-জনের মত ভালবাসিয়াছে, গ্রামে থাকিতে তাহার প্রতি কাকাবাবুর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব লইয়া কতজনে ঈর্ষা করিয়াছে ফুল আনিয়া কাকাবাবুর পূজোর ঘর সাজাইয়া দিত বলিয়া অনেকে ঠাট্টা করিয়া বলিত, অত খোসামোদ করিসনে বিজয়া, ভয় নেই, কাকাবাবু তোর ভাল বরই এনে দেবেন। সত্যই তাই, স্বামীর মত স্বামীর হাতেই বিজয়া পড়িয়াছে। বিপদে সম্পদে, দুর্ভোগে, পীড়নে—তাহার ছিল এই পরম শ্রদ্ধেয় পরমাত্মীয়টি, আজও তাহাদের সম্পর্ক অটুট আছে।

অথচ এই মানুষটিকেই সে কোনোদিন বুঝিতে পারিল না। এত ঘনিষ্ঠতা, এত বন্ধুতা,—বছরের পর বছর ধরিয়া তাহারা পাশাপাশি বাস করিয়া আসিয়াছে, অনর্গল অবিশ্রান্ত আলাপ করিয়াছে, কিন্তু তাহার এই কাকাবাবুটিকে কোথায় যেন সে ধরিতে ছুঁইতে পারে নাই। কাকাবাবু সংসারী নন, সন্ন্যাসীও নহেন—তবু মানুষের ঘন-জটলার মধ্যে চিরদিন বাস করিয়াও তিনি যেন সকলের নিকটেই দুর্লভ, একটি সুদূর ঔদাসিন্যের ওপারে তাঁহার আসন, বহু মানুষের একান্ত অন্তরঙ্গ বলিয়াই তাঁহাকে একান্ত করিয়া করতলগত করা যায় না, নিজেকে লইয়া নিজের মধ্যেই তিনি বাস করেন অভিযোগ-অনুযোগ করিলে স্নেহার্দ্র কোমল হাসিটি দিয়া তিনি সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দেন। এমনিই তাহার কাকাবাবুটি।

সেদিনকার মত বিজয়ার নিকট বিদায় লইয়া মাষ্টার মশাই ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তিনি আর কোথাও থাকেন না, তাঁহার একাকী ঘরখানি তাঁহাকে প্রতি মুহূর্তে আকর্ষণ করিতে থাকে। অন্দরের জীবনের সহিত তাঁহার বাহিরের জীবনের বিশেষ মিল নাই। অত বড় বাড়ীর যে দিকটায় তিনি বাস করেন সেদিকে কেহ পা মাড়াইতে সাহস করে না, সেখানে কোথাও কোলাহল ও সাড়াশব্দ নাই,—এমনিই তার একটা শ্বাসরোধক আবহাওয়া যে উঁকি মারিতেও গা ছমছম করে। মাষ্টার মশাইয়ের মা আছেন, বড় ভাই একজন আছেন, তাঁহারা থাকেন পাশের বাড়ীতে, নিতান্তই সংসারী মানুষ তাঁহারা—তাঁহাদের সহিত মাষ্টার মশাইয়ের কোনো ব্যবহারিক সম্পর্ক নাই, কোনোদিনই ছিল না। মৃত্যুপুরীর মত তাঁহার মহলটা নির্ব্বাক, ও নিঃসঙ্গ, সেখানে কেহ নিশ্বাস ফেলিলে তাহার শব্দ হয়।

রাত্রি অল্পই হইয়াছিল, সবেমাত্র গায়ে একখানি র‍্যাপার জড়াইয়া তিনি টেবল্-ল্যাম্পটি জ্বালাইয়া বিছানার উপর বসিয়া একখানি বই খুলিয়াছিলেন, এমন সময়

দরজার বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। আলো পার হইয়া ওদিকে অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত হইল না, বইয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়াই তিনি কহিলেন, 'চন্দন বুঝি? ঠাকুরকে বলে দিও রাত্রে আমি আর খাবো না।'

'চন্দন নয়, আমি এলাম।'

মাষ্টার মশাই মুখ তুলিয়া দেখিলেন, মৃণাল ততক্ষণে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি ব্যস্ত হইলেন না, শুধু হাসিয়া বলিলেন, 'এসো মৃণাল, এসো—এমন অসময়ে যে?'

'দিদিমার সঙ্গে এসেছিলাম আপনাদের ওবাড়ীতে, দিদিমা এখনো গল্প করচেন ওদিকে বসে।'

বিছানায় একটা দিকে দেখাইয়া মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'বসো এইখানে,—গল্প শুনতে ভাল লাগল না বুঝি? কিন্তু আমার এখানে খুসী হবার মত কিছু দেখতে পাবে না ত? তোমাদের মনের সঙ্গে আমার বাঁচার পদ্ধতিটা মিলবে না মৃণাল,—এ বইগুলো কি জানো ত?' বলিয়া তিনি আবার একটু হাসি হাসিলেন, বলিলেন, 'যে বইগুলো পড়তে পড়তে আমার চুল পাকল, সেগুলোর কতকগুলো হচ্চে সাহিত্য আর ফিলসফি, কিন্তু সেগুলো এ নয়, এগুলো অন্য জাতের।

মৃণাল একটু কৌতুক অনুভব করিয়া কহিল, 'কি বলুন ত এসব?'

মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'বিয়ের উপহার নয়। এখানা হচ্ছে বিবেকানন্দের জীবন চরিত, এখানা শ্রীঅরবিন্দের গীতার ব্যাখ্যা, আর এখানা—'

'রবিবাবুর বই পড়েন না?'

'পড়তাম, এখন আর পড়িনে। এখন আত্মার আনন্দ আর চাইনে, এখন চাই নির্ব্বাণ!'

'গীতায় কি নির্ব্বাণের কথা পাবেন?'

'সে জন্যে ত গীতা পড়িনে মৃণাল, আমি শুধু পথ খুঁজে বেড়াই।' বলিয়া মাষ্টার মশাই ডান হাত বাড়াইয়া সুইচটা টিপিয়া মাথার উপরের আলোটা জ্বালিয়া দিলেন।

মৃণাল একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, তারপর কহিল, 'বেশি আলো আমার খুব ভাল লাগে······বাবারে, কোথাও টুঁ শব্দটি নেই, আপনি এমনি একলা থাকেন? থাকেন কেমন করে?'

মাষ্টার মশাই হাসিলেন, এবং তাহার কথা চাপিয়া অন্য কথা পাড়িয়া বলিলেন 'তুমি এসে ভালই করেছ মৃণাল, ভাবছিলাম চন্দনকে দিয়ে তোমার কাছে একটা খবর পাঠাবো। একটু আগে আমি বিজয়ার কাছ থেকে আসচি' বলিয়া তিনি একটু থামিলেন, তারপর বলিলেন, 'তার কাছে আজ তোমার কথাই হচ্ছিল—'

মৃণাল মাথা হেঁট করিয়া রহিল। মাষ্টার মশাই বোধ করি গুছাইয়া বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মৃণাল বাধা দিল, কহিল, 'আমিও আপনাকে সেই কথাই বলতে এসেছিলাম।'

'কি বল ?'

গলা পরিষ্কার করিয়া মৃণাল কহিল, 'এদিকে এখন কেউ নেই·····আপনাকে আমি লজ্জা করব না,—বলচি, আপনি আর আমার জন্যে চেষ্টা করবেন না।'

মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'এ কথা তুমি কেন ভাবচ মৃণাল যে, আমার পরিশ্রম হবে ? তোমার বিয়ে দেওয়া, সেই আমার বড় কাজ, বড় আনন্দ !'

মৃণালের কণ্ঠে এবার একটু দৃঢ়তা ফুটিয়া উটিল, 'তা হোক, তবু আপনি আজ থেকে নিরস্ত হোন্। বিজয়াদিকেও আমি সেই কথা বলে এসেছি।'

মাষ্টার মশাই কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'তুমি কি এখন বিবাহ করতে চাও না ?'

মুখের উপর মৃণালের একটা লজ্জার আভাস খেলিয়া গেল। বলিল, 'বিজয়াদিকে আমি বলেচি।

মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'কত ছেলেমেয়ে দেখলাম, দেখতে দেখতে চুল পাক্‌ল। অল্পদিন হলেও তোমার সঙ্গে আমার যথেষ্টই ঘনিষ্ঠতা হয়েচে। এই দেখ না, একটু আগে পর্য্যন্তও আমার ধারণা ছিল—'

মৃণাল মুখ তুলিয়া তাকাইল।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, ভেবেছিলাম তোমার মত শান্ত আর নিরীহ মেয়ে বুঝি আর কখনো দেখিনি, এখন মনে হচ্ছে অন্য কথা !'

'কি বলুন ত ?' মৃণাল হাসিয়া কহিল।

'মনে হচ্ছে এক জায়গায় তুমি ইস্পাতের মত কঠিন,—দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অটল মতামত,—বাস্তবিক, তোমার মত মেয়ে আমি দেখিনি। মেয়েদের মনে আসল মানুষটা কোথায় থাকে, কখন সে দেখা দেয়, আজ অবধি বুঝলাম না।'

'বোঝবার ত আপনি চেষ্টা করেন নি কোনোদিন ?'

'সত্যি বটে, তা করিনি, ওপরটা দেখে ভিতরটাকে চিনতে চেয়েচি। আর কি জানো মৃণাল, মেয়েদের আমি চিরদিন স্নেহও করি, ভালও বাসি কিন্তু বিচার করে দেখিনি। স্নেহ-ভালবাসা বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয় !'

দুইজনে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে কোনো কথা সহসা আসিতেছিল না। কিন্তু মাষ্টার মশাই নিজেই সেই নীরবতা ভাঙিয়া দিলেন। বলিলেন, 'কিন্তু মৃণাল, বিয়ে কেন করতে চাও না—তা ত কই বললে না ?'

মৃণাল মাথা তুলিয়া কহিল, 'সে কি আপনি শুনতে চান ? বহুলোক নিয়ে আপনার কারবার, অনেক লোকের মধ্যে আপনার গতিবিধি, আমার কথা শোনবার সময় কই আপনার ?'

'এই কি তোমার ধারণা মৃণাল ?'

'নিশ্চয়, এই আমার বিশ্বাস। রাসভারি লোক বলে সবাই আপনাকে সমীহ করে, আপনার চারিদিকে ভয়ের গণ্ডী ; সবাই থাকে আপনার কাছে, আপনি থাকেন

দূরে,—তার মধ্যে আমি আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসিনে।' বলিতে বলিতে মৃণালের গলা ধরিয়া আসিল।

মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'ভিক্ষে কি মৃণাল ?'

'ভিক্ষে, একশোবার ভিক্ষে। আমি দরিদ্র হতে পারি কিন্তু কাঙাল নই। সবাইকে আপনি যা দান করেন আপনার সে-দান আমি ছুঁতেও চাইনে।'

মাষ্টার মশাই বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য !' বলিয়া স্নিগ্ধ হাসি হাসিলেন, পুনরায় কহিলেন, 'আমি শুনতে চাই এক কথা, তুমি বলতে চাইচ আর এক কথা! কী অপরাধ তোমার কাছে করেচি মৃণাল ?'

মৃণালের চোখে বোধ হয় জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে কথা বলিল না। মাষ্টার মশাই বিছানায় আড় হইয়া হইয়া পড়িয়া কহিলেন, 'যাদের চুল পাকে তারা জ্ঞান সঞ্চয় করে বটে. কিন্তু সেই পরিমাণে বুদ্ধি হারায়। বুদ্ধির খেলা যৌবনে। আচ্ছা বল মৃণাল, বল, তোমার কথাটা শুনতেই বোধ হয় আমার বাকি, তারপরেই বানপ্রস্থ নিয়ে বনে যাবো।' বলিয়া অতি স্নেহে ও মমতায় তিনি মৃণালের একটি হাত ধরিলেন।

হাতটা মৃণাল ছাড়াইয়া লইল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কি এক অস্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল. 'বলতে আমার একটুও দ্বিধা নেই আপনাকে, বলব বলেই আসি, কিন্তু বলবার সুযোগ না পেয়ে চলে যাই।' বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

চাকরের হাতে চিঠি দিয়া বিজয়া ডাকিতে পাঠাইয়াছিল, মাষ্টার মশাই যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন রৌদ্র ম্লান হইয়া আসিয়াছে। স্বামী এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই, ছেলেমেয়েরা বাহিরে খেলা করিতেছিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া প্রথমেই মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'আর শুনেচ বিজয়া, মৃণালের এখন বিয়েতে মত নেই ?'

'ও একটা পাগল কাকাবাবু, মত ও কোনোদিনই নেই !'

'থাকলেই কিন্তু ভাল হ'তো বিজয়া, আমি ছুটি পেতাম, আবার আসবে বলে গেছে।' বলিয়া সে ভিতরে ঢুকিয়া তাহার কাকাবাবুর কাছে আসিয়া বসিল।

'যে-চেহারা আমি তার দেখলাম তাতে তুমিও অবাক হয়ে যেতে বিজয়া। মেয়েদের মনের বাঁধন পুরুষের চেয়ে অনেক শক্ত। বিয়ের কথাটা সে হেসে প্রত্যাখ্যান করে দিল। আচ্ছা, মৃণালের আসল কথাটা কি বল ত ? এখানকার শিক্ষিত মেয়েরা কি বিয়েটাকে উড়িয়ে দিতে চায় ?'—মাষ্টার মশাই মুখ ফিরাইয়া তাহার মুখের উপর চোখ রাখিলেন।

'মোটেই না কাকাবাবু।' বলিয়া বিজয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

'শুনতে পাই বিয়ের আগেই অনেক মেয়ের সঙ্গে অনেক ছেলের ভাব হয়, ওই তোমরা যাকে বলো ভালবাসা, এ রকম একটা কিছু ঘটনা মৃণালের ঘটেনি ত ?'

বলিয়া মাষ্টার মশাই হাসিতে লাগিলেন, 'মৃণালের চেহারা দেখে আমি নিজের মতামত একটু বদ্‌লেছি বিজয়া, ও মেয়েটি শতকরা নিরেনব্বই জন মেয়ের মধ্যে পড়ে না !'

বিজয়া কহিল, 'মৃণাল আমাকে সব কথা বলেচে কাকাবাবু, কিন্তু আপনার কাছে সে সব প্রকাশ করা বড় কঠিন।'

'তা হলে বোলো না মা, সব কথাই শুন্‌তে নেই, মেয়েমানুষের মনের কথা অতি নিকট আত্মীয়ের কাছেও প্রকাশ করা চলে না।'

'আপনাকে যে বলতেই হবে কাকাবাবু !'

'আমাকে ? কেন মা ?'

বিজয়া কহিল, 'আপনাকে বলতেই হবে, যে-কথাটা অনেকদিন মৃণাল আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারেনি সে আপনাকে শুনতেই হবে, এই তার অনুরোধ, এই তার দাবি। কী অবস্থায় পড়লে যে মেয়েমানুষের বুক ফাটে, তা আপনি জানেন কাকাবাবু।'

'কী সে বল ত বিজয়া ?'

বিজয়া কহিল, 'মৃণালের বিয়ে হয়ে গেছে !'

মাষ্টার মশাই সবিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইলেন। বলিলেন 'ও, তাই নাকি ?' —একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'বেশ, বেশ।'

'কার সঙ্গে হয়েচে তাও আপনাকে শুনে যেতে হবে কাকাবাবু।'

মাষ্টার মশাই হাসিয়া কহিলেন, 'নিশ্চয়, স্বামী স্ত্রীকে নেমন্তন্ন করে আশীর্ব্বাদ করে যাবো যে, বল।'

এবারে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বিজয়া শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিল, 'আপনি হচ্ছেন তার স্বামী কাকাবাবু।'

নিজের দিকে আঙুল দেখাইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কাকাবাবু কহিলেন, 'আমি ? হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, মেয়েরা আজকাল রসচর্চ্চা করচে দেখচি ; মাথার যে দিকটায় চুল পেকেছে, তার ওপর একটু কলপ লাগিয়ে আসি, কি বল বিজয়া ?'

বিজয়ার বুকের ভিতরটায় ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতেছিল, সে কথা কহিল না। একটা হাত তাহার গলার উপর রাখিয়া অন্য হাতে তাহার মুখখানি সস্নেহে ধরিয়া কাকাবাবু কহিলেন, 'মা লক্ষ্মী, চুপ করে রইলে যে ? এ রকম ছেলেমানুষী কি তোমাকে মানায় ?'

'আমি ছেলেমানুষী করিনি কাকাবাবু, মৃণাল মনে মনে অনেকদিন থেকে আপনাকে—'

'মনে মনে, মৃণাল, আমাকে—'আবার উচ্চকণ্ঠে তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং হাসি থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, মৃণাল নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকিতেছে।

ভিতরের বাতাসটা যেন থম থম করিয়া উঠিল। মাষ্টার মশাই প্রথমেই কথা

বলিলেন, 'মৃণাল, তুমি ত একটি অদ্ভুত স্বামী নির্ব্বাচন করেছ দেখ্‌চি? একেবারে মৌলিক আবিষ্কার! ইতিহাসের সংযুক্তাও তোমার কাছে হার মানলেন! বেশ নতুন ঘটনা, কাগজে ছাপিয়ে দেবো নাকি?'—সকৌতুকে তিনি হাসিতে লাগিলেন।

কেহ কোনও কথা কহিল না, তিনি বলিতে লাগিলেন, 'ভাগ্যি ছোট ছেলেমেয়েরা এদিকে কেউ নেই, এমন একটা মজার গল্প শুনলে তারা—'

মৃণাল নতমস্তকে কহিল, 'আপনি হয়ত আমাকে ঘৃণা করবেন এর পর।'

'ঘৃণা? তোমাকে? কী আশ্চর্য্য!'

বিজয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মাষ্টার মশাই গুছাইয়া বসিয়া কহিলেন, 'গল্পটা শুনতে বেশ আমোদ লাগচে, এ রকম আজগুবী চিন্তা কবে তোমার মাথায় ঢুক্‌ল মৃণাল? প্রথম দর্শনেই নিশ্চয় নয়?'

'আপনার বিদ্রূপ আমার একটুও লাগবে না। আমি জানি আমি কী করেচি।'

মাষ্টার মশাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'জীবনে চমকপ্রদ কল্পনাকে ঠাঁই দিওনা মৃণাল, তোমার পথ এখনো অনেক দূর। আজ আমার সমস্তটা মনে হচ্চে, ঠিক কথাটা আগে বুঝতে পারলে তোমাকে অনেক আগেই সাবধান করে দিতাম, আমি সব কথাই দেরিতে বুঝি—এ রকম ছেলেমানুষী ক'রো না মৃণাল। আমি চিরদিন বিধাতার অনেক আঘাত সহ্য করেচি, তোমার ঠাট্টাও আমার সয়ে যাবে আমি জানি,—কিন্তু তুমি নিজের মাথায় এমন করে অভিশাপ নামিয়ে এনো না। ছি ছি, তোমরা আমার স্নেহের বস্তু, এমন আমাকে লজ্জা দিও না!'

মৃণাল কহিল, 'আমি জানি আপনি এমনি করেই আমাকে বলবেন।'

'এর চেয়েও বেশি করে বলব যদি দরকার হয়। আশা করি দরকার হবে না, তার আগেই তুমি নিজের ভুল শোধরাতে পারবে। তুমি দু'টো তিনটে পাশ করেছ, বিদ্যা ও জ্ঞান নিতান্ত সামান্য নয়, নিজের কথাও তুমি ভাবতে শিখেছ—এসব বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কি ভাল? কবে থেকে তুমি আমাকে ভালবেসেচ, কি করেচ সে আর আমি শুনতে চাই নে, এটা জেনে রেখো পরস্পরের সমান অনুভূতিতেই ভালবাসার বিকাশ, কিন্তু আমার সেদিকটা আজ আর বেঁচে নেই মৃণাল, তোমাকে সত্যিই বলচি। হ্যাঁ, ভাল কথা, আর কোথাও যেন এ কথা প্রচার না হয়, ইতিমধ্যে ওই পাত্রটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলি, তুমি যেন বাধা দিও না।'

মৃণাল মৃদু কঠিন কণ্ঠে বলিল, 'আমাকে এমন করে অপমান করবেন না!'

'অপমান? অপমান ত তোমাকে করিনি?'

'বিয়ের চেষ্টা করার মানেই তাই, হিন্দুর মেয়েকে কি আপনি দ্বিচারিণী হতে বলেন? আমি কি এতই হেয় আপনার চোখে?'—বড় অশ্রুর ফোঁটা এইবার তাহার গাল বাহিয়া নামিয়া আসিল।

মাষ্টার মশাইয়ের যেন দম্ আট্‌কাইয়া আসিতে লাগিল। যে মেয়েটি ছিল

তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের নিতান্তে, আজ সেই যেন দুরন্ত ঝড়ের মত প্রবল হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'বিদেশ যাওয়ার সময় তুমি এরকম ব্যবহার আমার সঙ্গে না করলেই ভাল করতে মৃণাল।'

সাশ্রুনেত্রে মৃণাল কহিল, 'কবে যাবেন বিদেশে ?'

'কাল কিম্বা পরশু, যাবো হরিদ্বারে, অনেক দিনের জন্যে।'

'আমিও যেতে চাই আপনার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে ? তুমি ? তার চেয়ে আত্মহত্যা করো মৃণাল।' বলিয়া মাষ্টার মশাই বাহির হইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন।

বাহিরের ঘরের কাছে বিজয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, কাকাবাবুকে বাহির হইতে দেখিয়া সে কহিল, 'আমি পড়েচি বিপদে কাকাবাবু, কি করি আমাকে বলে দিন।'

'কেন মা ?'—মাষ্টার মশাই দাঁড়াইলেন।

'একথা এতটুকু মিথ্যে নয়, আপনি ছাড়া মৃণালের আর কেউ নেই। এমন মেয়ে আজকাল হয় ? আমি ছাড়া আর কেউ জানে না, আপনি কী ওর কাছে! আপনার জীবনের সঙ্গে ও নিজেকে একেবারে মিলিয়ে বসে রয়েচে, আপনার উপযুক্ত হয়ে ওঠাই ওর সব চেয়ে বড় সাধনা। কী ভালই ও বাসে আপনাকে! আমরা ওর নখের যুগ্যি নই!'

'এ আমার শাস্তি বিজয়া।' বলিয়া মাষ্টার মশাই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

কেমন করিয়া তিনি পথ দিয়া চলিলেন, কত লোকের পাশ কাটাইয়া, কত মোড় ঘুরিয়া, কখন আসিয়া বাড়ী পৌঁছিলেন, ঘরে ঢুকিয়া কেমন করিয়া তিনি আলো জ্বালিলেন, তাহা কিছুই তাঁহার মনে নাই। ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া তিনি একটি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঘরটা যেন তাঁহার চোখের উপর দুলিতেছে।

কতক্ষণ বসিয়াছিলেন কে জানে, পায়ের শব্দে তাঁহার চমক ভাঙিল। বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, মৃণাল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভয়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। হঠাৎ তিনি ঠিক কী করিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। পাছে ধৈর্য্য হারান সেই আশঙ্কায় সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, 'আবার এসেচ ?'

মৃণাল কহিল, 'হ্যাঁ। এসে আমি অন্যায় করিনি।'

'কেন এলে বল ত ?'

'বলতে এলাম আপনার কোথাও যাওয়া হবে না!' বলিয়া মৃণাল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভীতকণ্ঠে মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'সে কি, তুমি কি আমাকে বেঁধে রাখতে চাও ?' ১৩

'যেতে আমি দেবো না আপনাকে।'

তাহার কণ্ঠে যেমন একটি সুস্পষ্ট দৃঢ়তা তেমনি গভীর আত্মপ্রত্যয়! মাষ্টার

মশাই হাসিলেন, বলিলেন, 'আমার মনেও বন্ধন নেই, মনের বাইরেও বন্ধন নেই, তা জানো ত ?'

মৃণাল কহিল, 'আমার মনের কথা শুনে নিয়ে আমাকে আপনি অশ্রদ্ধা করে চলে যাবেন, এ আমার সইবে না। আপনার কোথাও যাওয়া অসম্ভব।'

মাষ্টার মশাই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'তুমি যাও, যাও মৃণাল, তুমি আজ চলে যাও, আমাকে বাঁচাও।'—থর থর করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল।

মৃণাল এক পাও পিছনে হটিল না, মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'আপনাকে বাঁচাবো কিন্তু আমি যাবো কোথায় ? আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।'

'এ কী বিপদ মৃণাল ? কি ভাগ্যি সাধারণ মেয়েরা তোমার মতন নয়, তাহলে পুরুষের জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠত। তুমি যাও, ছি, এসব ভাল নয়, নানা জনে নানা কথা বলতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে অপবাদ লোকের ভারি রুচিকর। তুমি যাও।'

মৃণালের চোখে জল পড়িতে লাগিল কিন্তু সে উঠিল না। মাষ্টার মশাই কহিলেন, 'এমন করে কবে থেকে তুমি আমাকে চুপি চুপি ভালবেসে আসচ শুনি ? এতখানি দৃঢ়তাই বা তুমি পেলে কোথায় ? যাও তুমি, মৃণাল। তোমাকে দেখে ভাবচি, সত্যিকারের ভালবাসার জন্য আত্মসম্মান সহজেই খোয়ানো যায়। কিন্তু তুমি যাও মৃণাল. চলে যাও।' বলিতে বলিতে তিনি ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তোমার দেখা পাবো। তুমি এলে মৃত্যুর মত, নিয়তির মত। তুমি যখন এসে পৌঁছলে তখন আমার জীবনে বেজে উঠেচে ধ্বংশের বাজনা। তুমি যাও, তুমি যাও মৃণাল।'

মৃণাল তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'এখন আমি যাচ্ছি, কিন্তু জানবেন কোথাও আপনাকে আমি যেতে দেবো না। আমাকে ছেড়ে যাবার শক্তি আপনার একবিন্দুও নেই !' বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল।

* * *

একে তুমি কী বলবে বিজয়া ?'—তৃতীয় দিন দুপুর বেলায় বন্ধ ঘরের ভিতর বসিয়া ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠায় মাষ্টার মশাই দ্রুতবেগে কলম চালাইতেছিলেন, 'বোধ হয় যাবার সময় সব চেয়ে বড় ভালবাসার সন্ধান পেয়ে গেলাম ! কিন্তু আমার নিজের কথা ? চল্লিশ পার হয়ে পঞ্চাশের দিকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চলেছি, পথ আর বাকি নেই। আমার সমস্ত আয়ুটা কেটে গেল উপবাসে। কী দিতে পারি মৃণালকে ? কি আমার আছে ?'

আবার তিনি লিখিতে লাগিলেন, 'কোথায় গেল আমার বাইশ বছরের যৌবন ? কোথায় গেল পঁচিশ বছর ? বুকে ছিল অনন্ত আশা, অপরিমিত ভালবাসার

আবেগ, সে-জীবন আমার কোথায় গেল ? এই মৃণালের পায়ের শব্দের দিকে কান পেতে ছিলাম, কেন সেদিন মৃণাল আসেনি ?

কিছু মনে ক'রো না, এ আমার আত্মহত্যা নয়, দেহান্তর। আবার ফিরে এসে পথের ধারে দাঁড়িয়ে মৃণালকে চিনে নেবো। সেদিন হাতে থাকবে নতুন জীবন, নতুন দেহ, নতুন হৃদয়। আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ এবারের মত হারিয়ে ফেলেচি, সে আমার যৌবন। শ্মশানের পরে কি কেউ বাসা বাঁধে ?

'জানি এখুনি তোমাদের আসবার কথা, আমারো তাই তাড়াতাড়ি, শেষের দিকটা অত্যন্ত সংক্ষেপে সেরে দিলাম। এত সমারোহে যার আরম্ভ, এত সহজে তার শেষ, এমনিই জীবন। আমাকে তোমরা ক্ষমা ক'রো। এই ডায়েরীর পাতাতেই তোমাদের জন্য শেষ আশীর্ব্বাদ রেখে যাই।'

* * *

দরজা ঠেলিয়া যখন বিজয়া ও মৃণাল ভিতরে ঢুকিল, দেখিল, সম্মুখে টেবিলের উপর একখানি ডায়েরীর খাতা, একটি ফাউণ্টেন্ পেন্, একটি ছোট্ট ঔষধের শিশি,—ও তাহাদেরই ওপাশে বিছানার উপর উপুড় হইয়া মাষ্টার মশাইয়ের মৃতদেহ !

পুরানো কথা

কতদিন হইতে যে সে-বাড়ী খালি পড়িয়া আছে তাহা কেহ জানে না, কখনও কেহ যে এই জীর্ণ আচ্ছাদনটির তলায় সুখ দুঃখের পসরা মাথায় করিয়া বাস করিয়াছিল তাহাও কেহ বলিতে পারে না। গ্রীষ্মের প্রখর দীপ্তি, বর্ষার প্লাবন, হেমন্তের হিম আবার বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার শিহরণে সেটা এখনও একেবারে ধসিয়া যায় নাই বটে তবে সম্মুখের ক্ষুদ্র পুরাতন জানালাহীন নীচু ঘরগুলায়, ছাদের ভিত্তিতে প্রায় আধ হাত পরিমাণ ফাটল ধরিয়াছে এবং তাহারই ফাঁকে রাজ্যের বাদুড় চামচিকা প্যাঁচা সকলেই বহুদিন হইতে আপন আপন কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। বাড়ীখানার সুমুখে বিঘা-দুই পোড়ো জমি ; তাহারই স্থানে স্থানে গোটা-কয়েক পত্রহীন শুষ্ক নারিকেল গাছ প্রাণহীন দেহ লইয়া কতদিন হইতে আকাশ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর পিছন দিকে একটা ডোবা, পানায় ভরা ; তাহার অব্যবহার্য্য জলটুকুও কোন্ তলায় পড়িয়া আছে, বৃষ্টিতেও তাহার পরিমাণ বাড়াইতে পারে না, মাটিতে শুষিয়া লইলেই যেন বাঁচে।

জনহীন স্তব্ধ পুরী দিবায় নিশায় খাঁ খাঁ করে, ঝিঁ ঝিঁ কাঁদে ; শেয়ালরাও চার প্রহরে চারবার কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়।

সেদিন সকাল-বেলায় কিন্তু পাড়ার দুই একজন লোক সবিস্ময়ে দেখিল, দুই তিনখানা জীর্ণ কাঁথা কার্ণিশটার উপর ঝুলিতেছে। একটি মেয়েকেও নাকি ঘুরিতে ফিরিতে দেখা গিয়াছে।

কথাটা সত্যই। গত কাল সন্ধ্যাবেলা মনোরমা এখানে আসিয়াছে। সঙ্গে স্বামী মন্মথ ও রুগ্ন আট বছরের মেয়েটা। এতদিন কোথায় একটা গ্রামে মন্মথর দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ীতে তাঁরা ছিলেন, কিন্তু ম্যালেরিয়ার মহামারীতে সেখানে আর থাকা কিছুতেই চলিল না। আজ কয়দিন হইল মনোরমার কোলের একটি ছেলেকে সেই রাক্ষস খাইয়া ফেলিয়াছে।

বিবাহের পর এই প্রথম মনোরমা স্বামীর ভিটায় পা দিল। সেই তের বছর বয়সের বউ—ঘোমটার ভিতর হইতে তাকাইতে যখন ভয় করিত, তখন হইতে এই বাড়ীর কথা সে শুনিয়া আসিতেছে। শ্বশুর শাশুড়ী, পিসতুত মাসতুত ননদ ইত্যাদিতে এ বাড়ীখানা সরগরম ছিল কিন্তু আজ আর কেউ নাই। কেহ মরিয়াছে, কেহ শহরে রোজগারের উদ্দেশ্যে চলিয়া গিয়াছে, কেহ ম্যালেরিয়ায় এবং অজন্মায় গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীটির যৌবনবেলায় একটি প্রকান্ড পরিবার যে ইহাকে দলিত মথিত করিয়া জরাজীর্ণ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহার অনেক চিহ্নই বর্ত্তমান। উপরে উঠিবার সিঁড়িগুলা ক্ষয় হইয়া সমান হইয়া গিয়াছে, কুয়ার

সম্মুখে চাতালটার শুধু চিহ্নই আছে আর কিছুই নাই। বড় দালানটার যেখানে বছর বছর দুর্গা পূজো হইত, তাহাতে এমনি তিনচারিটা ফাটল ধরিয়াছে যে তাহার ভিতর দিয়া ঘোষপাড়া বারোয়ারীতলাটার সমস্তই দেখা যায়। এমনি আরও কত কি।

সকালবেলায় মনোরমা উঠিয়া ভাঙ্গা মাটির কলসীটা করিয়া ডোবা হইতে জল বহিয়া আনিয়া প্রায় আধখানা বাড়ী ধুইয়া ফেলিল। ঘরের ভিতর খাঁজে খাঁজে অশ্বত্থ গাছের চারা ও নানারূপ গাছ-গাছড়া গজাইয়া ছিল, যতটা পারিল, সেগুলোকে তুলিয়া ফেলিয়া পরিষ্কার করিল। বাছিয়া বাছিয়া যে ঘরটা শুইবার জন্য তাহারা লইয়াছিল, তাহার উত্তর দিকের দেয়ালের উপরের কার্ণিশটা ধসিয়া গিয়া ছাদের একখানা বরগা ঝুলিতেছিল, তাহা কখন্, পড়ে; তারই তলায় একরাশি সুরকি ও বালির চাপড়া জমা ছিল—সেগুলোকে সে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিল। এইরূপে ধীরে ধীরে কোনও রূপে কায়ক্লেশে ঘরখানিকে সে বাসের উপযুক্ত করিয়া লইল।

তারপর স্নান সারিয়া যখন সে মাথা মুছিতেছিল, একটা লোক অন্যমনস্ক ভাবে একখানা দা লইয়া সটান ভিতরে চলিয়া আসিতেছিল। মনোরমা মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া বিনয়কাতর কণ্ঠে বলিল, 'দয়া ক'রে আপনারা আর বাকী জানালা ক'টা কেটে নেবেন না, সবই ত পুড়িয়ে ফেলেছেন—'

লোকটা থতমত খাইয়া গেল। জরাজীর্ণ গৃহখানির স্তব্ধ নির্জ্জনতা অল্পমাত্র ভেদ করিতে পারিয়া নারী-কণ্ঠস্বর ভিজা অবলার মত ঢ্যাব ঢ্যাব করিয়া উঠিল। একটুমাত্র নীরব থাকিয়া লোকটা বলিল, 'আমরা ত এখান থেকে রোজই কাঠ কেটে নিয়ে যাই কেউ বারণ করে না, তুমি কে গা বাছা ?'

মনোরমা সহসা উত্তর দিতে পারিল না, লোকটি পুনরায় বলিল,—তোমরা কি এখানে থাক্‌তে এলে ?

—হ্যাঁ, কতদিন আর খালি পড়ে থাকবে, তাই এবার থাকতেই এলুম কিন্তু আপনারা দয়া করে আর গরীবের কুঁড়েটুকুর বাঁধনগুলি কেটে নিয়ে যাবেন না, যদি কোনও দরকার থাকে ত শুধু হাতেই বাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন,—শেষের কথাগুলি সে জোর দিয়াই বলিয়া গেল।

লোকটি অবাক, তবুও একটু বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল,—একি তোমাদেরই বাড়ী ?

—হ্যাঁ।

—তবে এতদিন ছিলে কোথায় বাড়ী খালি রেখে ?

—যাক্‌গে—সে আলোচনা পরেও হ'তে পারবে, আপনি এখন আসুন গে যান্ ; বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে রুগ্ন মেয়েটা ওয়াক্ ওয়াক্ করিতে করিতে সুমুখে আসিয়া পড়িয়া অনর্গল বমি করিতে লাগিল।

লোকটি আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

জল আনিয়া তাড়াতাড়ি মনোরমা মেয়েটার মুখে চোখে দিতে লাগল। কতকটা সুস্থ হইলে দেয়ালে হেলান দিয়া মেয়েটা বসিয়া রহিল। ম্যালেরিয়ায় তাহার চেহারা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে, মাথায় স্বল্প চুলের নুড়িটা বহুদিন তেলজল না পড়িয়া একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চোখের কোণের হাড় দুইটা খোঁচার মত ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটা তত পরিমাণেই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে,—ঠাহর না করিলে আর দেখা যায় না। ময়লা দাঁত দুপাটি অধরোষ্ঠক ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কঙ্কালসার দেহটার রং হইয়া গিয়াছে হলুদে মত, তাহার উপর মাঝে মাঝে এক পরদা পুরু ময়লা পড়িয়াছে। কে বলিবে এ মায়ের এ মেয়ে। ঘরের ভিতর হইতে বিকৃত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিলেন, শুনচ ?

—দাঁড়াও যাচ্ছি,—বলিয়া মনোরমা দালানের এক কোণ হইতে এক বাটি সাগু সিদ্ধ আনিয়া বলিল, অনেকক্ষণ খাস্‌নি একটু খেয়ে ফেল বিমলি—

বিমলা নাকে কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, না খাব না, ফেলে দাওনা—বলিয়া সে পিছন ফিরিয়া বসিল।

ম্যালেরিয়া রোগী বিষ খাইতে চায়, কিন্তু সাগু খাইতে চায় না। সুতরাং কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া মনোরমা বলিল,—খেয়ে ফেল' লক্ষ্মী মা আমার, আর কিছু ত নেই।

মেয়ে তেমনি ভাবেই বলিল, রোজ সাবু, রোজ সাবু, যখন তখন সাবু দুটি ভাত দিতে পার না কেন ? বলিয়া অশ্রুসজল চক্ষে মায়ের পানে একবার চাহিয়া কম্পিত ক্ষীণ হস্তে বাটিটা লইয়া একটু একটু করিয়া খাইতে লাগিল।

মেয়ের তিরস্কারে মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। তাহারই পেটের এমন একটা কুহকী সন্তান শেষ নিঃশ্বাসটি ফেলিবার পূর্ব্বে মরণার্ত্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া একদিন বলিয়াছিল—দুটি ভাত দিতে পার না কেন ?—কিন্তু সে দুটি ভাত দিতে পারে নাই এবং তাহার দারিদ্র-নিপীড়িত মাতৃহৃদয়ে যে অব্যক্ত মর্ম্মান্তিক জ্বালা সেদিন মরণোন্মুখ সন্তানের তিরস্কারে চুপ করিয়া গিয়াছিল, আজ তাহার চক্ষের সুমুখে যেন সেই ভয়ঙ্করী নিশীথিনীটি মূর্ত্ত হইয়া জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

মন্মথ ভিতর হইতে পুনরায় ডাকিলেন, শুনতে পাচ্ছ না, কানের মাথা খেলে ?

—যাই, বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চক্ষের জলের ফোঁটা দুইটা তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া সে ভিতরে গিয়া দেখিল, মন্মথ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, ঠোঁটের কস্‌ বাহিয়া রক্তের ধারাটি পড়িয়া জীর্ণ কাঁথাখানি ভিজিয়া গিয়াছে। এ আজ নূতন নয়, প্রায় ছয় সাত বছর হইল মন্মথ হাঁপানিতে ভুগিতেছেন। আগে কাশির সঙ্গে সর্দ্দি উঠিত, আজকাল রক্ত উঠে। আগে তিনি নিজেই নিজের সেবা করিতেন, আজকাল আর পারেন না, হাত পা অসাড় হইয়া গিয়াছে।

তাড়াতাড়ি মুখখানি মুছাইয়া দিয়া মনোরমা আস্তে আস্তে আঁচল দিয়া মাছি তাড়াইতে লাগিল। মন্মথ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, সেই বড়ি আছে একটা দাও, নইলে কম পড়বে না। মনোরমা ধীরে ধীরে উঠিয়া কুলুঙ্গীর উপর হইতে একটি কাপড়ের

পুঁটলি খুলিয়া কাগজের কোটা করা কতকগুলা বড়ি হইতে একটি বাহির করিয়া আনিল। কোলের ছেলেটা যখন মরে, তারই গলার শেষ সোনার মাদুলিটি বেচিয়া এই হাঁপানির ঔষধটি সে স্বামীর জন্য কিনিয়া দিয়াছিল। এমন হইলেও পূর্বে তাহাদের অবস্থা ভালই ছিল। মন্মথ কোথায় রেলে বহুদিন চাকরী করিতেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের বধূটি একটি ছেলে রাখিয়া মারা যায়। ছেলেটি মামার বাড়ীতে থাকিয়া বড় হয়, ওদিকে ছন্নছাড়া পিতা মদ খাইয়া যথেচ্ছাচার করিতে শুরু করেন। ছেলে অনেকদিন এইরূপ সহ্য করিয়া বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে, ফলে বাপ তাহাকে 'ত্যজ্য পুত্র' করিয়া তাড়াইয়া দেন। কিছুদিন পরে দূরসম্পর্কীয় বোনের অনুরোধে মন্মথ দ্বিতীয় পক্ষে মনোরমাকে বিবাহ করেন। পরে মনোরমা শুনিয়াছিল, তাহার সতীনপোটি শহরে কোন একটি ঠিকানায় থাকিয়া আফিসে চাকরী করিতেছে।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বাধা না মানিয়া মন্মথ দিন দিন মদের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। শেষে পরিমাণ—'পরিণামে' দাঁড়াইল। হাঁপানি হইল। কবিরাজ বলিয়াছে, বেশী বয়সের অসুখ, এ আর সারবে না—

বড়ি খাওয়াইয়া মনোরমা বলিল, এবেলা খাবে কি ?

কষ্টে ঘাড় তুলিয়া মন্মথ বলিলেন, খাবার কিছু জোগাড় আছে বুঝি ?

—না নেই কিছু, কিন্তু খাওয়া ত দরকার ?

—খাওয়া দরকার ? হ্যাঁ যে ক'টি চিঁড়ে ছিল তা আমি খেয়েছি, সাবুটুকুও বাপ বেটিতে খেয়েছি,—কিন্তু তুমি দুদিন কিছু খাওনি—খাওয়া দরকার এখন তোমারই—

মনোরমা বলিল, আমি দুদিন খাইনি, আমি মেয়েমানুষ, আমার এতখানি শরীর, অসুখের চিহ্নটি নেই—

—অসুখ থাকলেই ত ক্ষিধে থাকে না, কিন্তু সুস্থ শরীরেই যে খাওয়ার দরকারটি বেশী—বলিয়া মৃদু হাসিতে গিয়াই ভিতর হইতে একটা ভীষণ কাশির বেগে তিনি হাঁ করিয়া উঠিলেন। মনোরমা চলিয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া স্বামীর বুকের দুইটা পাশ শক্ত করিয়া জাপটাইয়া ধরিল, পাছে কাশির চাড়ে কঙ্কালসার দেহের হাড় পাঁজরাগুলি পাতলা মাংস ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। একটানে দশবার কি পনেরবার কাশিয়া তবে একটু সুস্থ হইলে মনোরমা আস্তে আস্তে বাহিরে আসিল।

সাগুর বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বিমলা কখন যে বমি করিয়া ভাসাইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই। আসিয়া দেখে সে দেয়ালে হেলান দিয়া ঝিমাইতেছে, সুমুখের কাপড়টা বমিতে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাকে সুস্থ করিয়া ঘরে শোয়াইয়া দিয়া সে বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে! মেয়েটার এই মরণাপন্ন অবস্থা, মন্মথরও তাই—যেদিন যায় সেই দিনই ভাল। রেলের পুরাতন কর্ম্মচারী বলিয়া মন্মথ কিছু মাসহারা পাইতেন, কিন্তু এমাসের প্রথমেই নানারূপে তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। ঠিকানা সন্ধান করিয়া মনোরমা সতীনপোকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিল কিন্তু উত্তর আসে নাই।

বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস তপ্ত ঘূর্ণীবায়ুর মত তাহার বুক চিরিয়া বাহির হইয়া গেল। সুমুখের খিড়কী দরজার নিকটে একটা তালগাছের পাতায় বাতাস লাগিয়া সিরসির করিতেছিল। তাহারই তলায় যে ঘরটায় তাহার শাশুড়ী থাকিতেন সেটার ছাদ ধ্বসিয়া গিয়াছে, ভিতরের সেই স্তূপীকৃত আবর্জনারাশির পাশে একটা কালো বিড়াল কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। তৃষ্ণায় মনোরমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গিয়া সে ডোবায় নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া খানিক জল খাইল, এবং আস্তে আস্তে মুখে ও মাথায় জলের হাত বুলাইতে লাগিল।

২

পোড়ো বাড়ীটায় লোক আসিয়াছে এটা যখন সে অঞ্চলে রাষ্ট্র হইয়া গেল, তখন এ খবরটি সান্ধ্যসমিতিতে পেঁছাইতে একটুও বিলম্ব হইল না। পাড়ার কতকগুলি যুবক লইয়া বছরখানেক পূর্ব্বে এই সান্ধ্যসমিতি ভূমিষ্ঠ হয়। খগেনবাবু এর হর্ত্তাকর্ত্তা। চাল, পয়সা যাহা কিছু লোকের নিকট হইতে আদায় হয় সবই তাঁর বাড়ীতে গিয়া জমে। তাঁহার দুইটি ছেলে বেকার বসিয়াছিল, সমিতির চাঁদা আদায় করিয়া দেয় বলিয়া তিনি তাঁহাদের কিছু কিছু হাতখরচ দেন। চালগুলি গরীব দুঃখীদের ভিতর বিলি হয় কিনা এ খবর কেহ রাখেন না। কিছুদিন হইতে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে এখানে চার পাঁচটি চরকাও বসিয়াছে। চাঁদার পয়সা হইতে চরকা ও তূলা কেনা হয়; শুধু তাই নয় গোটা কয়েক বেকার ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার হুজুক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যা সুতা কাটে তাহাই তাঁতীর সাড়ী বুনাইয়া লইয়া খগেনবাবুর পরিবারের কাপড়ের খরচ বাঁচিয়া যায়।

আজ সন্ধ্যাবেলা এখানে প্রবল তাসের আড্ডা বসিয়াছিল, রোজই বসে। মাঝে মাঝে ইহাদের সহর্ষ এবং সক্রোধ চীৎকার অনেক দূর অবধি শুনা যাইতেছিল। আশু ছেলেটা একটু ভালমানুষ, সরকারী হিসাবের আফিসে সে চাকরী করে। তাহাদের ডাকিয়া সে বলিল, ওহে রাত্তির হ'ল, তাসগুলো না ছিঁড়ে কি উঠবে না? তাহার কথা কেহ শুনিল না, শেষে সে আস্তে আস্তে হরিদাসের পকেট হইতে দুইটি বিড়ি তুলিয়া লইয়া একটি ধরাইল, আর একটি রাখিয়া দিল, রাত্রে দরকার লাগিবে। পরে বিড়ি টানিতে টানিতে বলিল, ওহে জমিদার, মাইনে পেতে এখনও দেরি আছে, একটা টাকা ধার দাও-না—

জমিদার ওরফে মহিম মুখ ফিরাইয়া বলিল, টাকা কি হবে, ডেলি প্যাসেঞ্জারের টিকিট ত কেনাই আছে—

—তা হইলে কি হয়, টিফিনের সময় পেটের ভেতরটা যে জ্বলেপুড়ে যায়, না খাই এক পয়সার সরবৎ না খাই এক খিলি পান। আজ চারদিন ধরে পানউলি মাগির সুমুখ দিয়ে নাকে রুমাল বেঁধে আনাগোনা করছি, ধরতে পারলে চুণখয়ের মাখিয়ে ছেড়ে দেবে—দাও, দাও একটা টাকা, জমিদার মানুষ তোমরা, রাজা লোক,—টাকা একটা ছাড়—

মহিম মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন, বাড়ী থেকে তুই হাতখরচ পাস্‌নে ?

—হাঁ, হাতখরচ! আটত্রিশটি টাকা মাইনে পাই, তার মধ্যে তিন টাকা যায় মান্‌থলি টিকিটে, তারপর মাসকাবারি দেনা শোধ করে যখন বাড়ী যাই, তখন হাতে থাকে আড়াই টাকা—তারপর বাড়ীতে সারা মাসের খরচ, বল ত চাঁদ,—কোত্থেকে হাতখরচ পাব ?

ওধারে এতক্ষণ মুহুর্মুহু গর্জন উঠিতেছিল, এক ছক্কা খাইতে দুইটি খেলোয়াড়ের মধ্যে বচসা শুরু হইয়াছিল। খানিক পরে গোল একটু থামিলে হরিদাস ধীরে সুস্থে একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, ওহে জমিদার, তোমার চাঁদা কই ? সাতমাস হ'ল যে,—

মহিম হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, হাতে এখন পয়সা নেই ভাই, সত্যি বলছি।

তুমি জমিদার, তোমার হাতে পয়সা নেই ? এ হ'তে পারে না!

বলাই ছেলেটা ঠোঁটকাটা, সে মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, বড়লোকের পয়সা না থাকা আজকাল ফ্যাশন—

খগেনবাবু প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ কিসে কি হইয়া গেল। সকলের হাতের জ্বলন্ত বিড়িগুলা চট্‌ করিয়া হাতের চেটোর আড়ালে চলিয়া গেল। খগেনবাবুর বড়ছেলে ঘোঁতা এতক্ষণ অত্যন্ত আরামে বিড়িতে টান দিতেছিল, একমুখ ধোঁয়া লইয়া সে আর ছাড়িতে পারিল না ; চোখমুখ রক্তবর্ণ করিয়া হঠাৎ জানলার ধারে উঠিয়া গেল। ছোট ছেলে প্যাতাই মাদুরের উপর তবলার বোল ফুটাইতে ছিল, হঠাৎ একখানা হিসাবের খাতা টানিয়া উল্টা দিকেই পড়িতে লাগিয়া গেল। কৈলাস অনেকক্ষণ হইতে উবুড় হইয়া শুইয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ বুজিয়া 'মোটি মোটি লিটিয়া' গান ধরিয়াছিল, খগেনবাবুর সাড়া পাইয়া ঝপ করিয়া তাহার গান থামিয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে উঠিয়া, বলিল, বাইরে থেকে আসি—বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

খগেনবাবু তাহার পথের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, ওর চাঁদা বাকি আছে বুঝি ?

হরিদাস বলিল, কৈলাসের ? হঁ্যা, তিন মাসের বাকি—

খগেনবাবু মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, ছিঃ তোমরা ভদ্রলোকের ছেলে, কথার ঠিক রাখতে পার না। আর খাতা খুলে দেখ আমাদের দীনুমুচির বস্তির মেম্বারদের রেগুলারিটি—তারা এক মাসের আগাম দিয়ে রাখে,—মহিম, তুমিও দাওনি ত ?

—দু' এক দিনের মধ্যে দিয়ে দেবো—

বলাই বলিল, আপনারও দু মাসের বাকি খুড়োমশাই—

—ওঃ হঁ্যা হঁ্যা, গেল কাল দেবার কথা ছিল বটে, আর পাঁচ ঝঞ্ঝাটে কি মনে থাকে বাপু ? আচ্ছা চাঁদার কথা থাক, ওরে ও রহিম, ছোঁড়া গেল কোথায় ? এক ছিলিম তামাক দে হতভাগা—

ব্যাতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, হঠাৎ কালই বা দেবে কোত্থেকে বাবা ? পয়সার জন্যে ত কাল—

—আঃ আমি দেখি, ছোঁড়া কোথায় গেল, বলিয়া বাহিরে আসিয়া খগেনবাবু

বলিতে লাগিলেন, এই যে এখানে শ্বয়ে ঘ্বম্বচ্ছে, বেটা কেবল দিন রাত পড়ে পড়ে ঘ্বম্ববে, তামাক সাজ হতভাগা। বলিয়া প্বনরায় ভিতরে আসিয়া বলিলেন, এই প্যাতাই, ওরে ওই ঘোঁতা, ঢুলচিস্—যা বাড়ী যা—দিন রাত ইয়ারকি মারবে—কাল থেকে প্যাতাই আর ক্লাবে আসবিনে, না পড়া নাঃশ্বনো—যা বেরো। তাহারা বাহির হইয়া গেল।

হিন্দ্ব ম্বসলমান ঐক্যের জন্য খগেনবাব্ব রহিমকে এখানকার চাকর রাখিয়াছেন। বছর ষোল তার বয়স, সে 'ক্লাব র্বম' প্রত্যহ পরিষ্কার করে, আলো জ্বালে, তামাক সাজে। দিনের বেলা খগেনবাব্বর বাড়ীতে খায়, রাত্রিতে এখানে পড়িয়া থাকে। মাহিনা মাসে এক টাকা। তাহার সমস্ত খরচ, কাপড়-চোপড় বাদ—সমিতি বহন করে, কিন্তু তাহার মাহিনার টাকাটি খগেনবাব্বর নিকট জমিয়া বোধ করি, এতদিন বিশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মাহিনা চাহিলেই খগেনবাব্ব বলেন, কি চাই বল না, কিনে এনে দেবো—। সে কিছ্ব বলে না, হাসিয়া সরিয়া যায়।

রহিম আসিয়া তামাক সাজিতে বসিয়া গেল। খগেনবাব্ব একবার কাশিয়া লইয়া বলিলেন, পোড়ো বাড়ীটার লোক এসেছে শ্বনেছ ত?

সকলে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—মহিম দেখে এসেছে—

—শ্বধ্ব তাই নয়, শোন বলি, আমি কাল সকালে ও বাড়ীতে কেউ নেই বলেই ঢুকছিল্বম, একটা সোন্দরপানা মেয়ে আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলে—

'সোন্দরপনা' মেয়েটিকে মহিম চকিতের ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিল, তাই সবিস্ময়ে বলিল, আপনি গিছলেন কেন, খ্বড়োমশাই?

—কেন, লোক বেড়াতে যায় না?

হরিদাস কহিল, ওদের সমিতির 'মেম্বর' করে নিলে হয় না?

খগেনবাব্ব উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, সেই জন্যই ত গিছল্বম, আমার পোড়া কপাল। ওরে ও রহিম, তুই কাল যাবি—

রহিম ম্বখ ফিরাইল।

—গিয়ে বলবি, এ গ্রামে থাকতে হ'লে সমিতির মেম্বর হতে হবে—গরীব বলে ছেড়ে দেওয়া হবে না—ব্বঝলি?

রহিম তামাকের হ্বঁকাটা হাতে দিয়া বলিল, সেকি কথা কত্তা, তারা যে বড্ড গরীব—

হ্বঁকায় একটা টান দিয়া খগেনবাব্ব চক্ষ্ব পাকাইয়া বলিলেন, তুই থাম হতভাগা, ছোট ম্বখে বড় কথা, ফোপল দালালি করলে তাড়িয়ে দেবো—

মহিম আস্তে আস্তে বলিল, তারা গরীব, তুই কি করে জানলি?

রহিম উৎসাহ পাইয়া বলিল, তারা খ্বব গরীব জমিদারবাব্ব, খেতেও পায় না, আমি যে তেনাদের বাড়ী আজ গিছল্বম—

—কেন গিছলি?

—হোই সেথায় প্বকুর ধারে বসে 'সেই দিদি' কাঁদছিল, আমি যেতেই বলে, মেয়ের

ম্যালেরিয়া হইছে ; আমার চাচা দাবাই জানে কিনা, তাই দিয়ে এনু।—সকলে নীরব। খগেনবাবু মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিলেন, বেটা দাতাকর্ণ এসেছে। রহিম আর কিছু বলিল না, বাহিরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উপরে আকাশটা তারায় ছাইয়া গিয়াছে, তাহাদেরই গায়ে কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদের একটু ঘোলাটে আভা পড়িয়াছে। সম্মুখে ঐ মাঠটার ওপাশে কয়েকটা দেবদারু গাছ বাতাসের দোলনায় অন্ধকারের অস্পষ্টতায় ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল। রহিম মেটে দেয়ালটায় হেলান দিয়া তন্দ্রালু দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। মানব-লোকের চিরন্তন অভাবের ব্যথাতুর হাসিটুকু তাহার মুখে লাগিয়াই রহিল।

কতক্ষণ বাদে গায়ে একটা আঙ্গুলের টিপ পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল, মুখ তুলিয়া বলিল, কে জমিদারবাবু—কি বলচ ?

মহিম বলিল, তুই এখানে বসে আছিস, কেউ দেখতে পায়নি, রাত হয়েছে, সকলে দোরে চাবি দিয়ে গেছে—

—তুমি যাওনি ?

—না, বলিয়া রহিম একটু থামিল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, নিকটে দূরে কেহ নাই, অন্ধকার রাত্রিতে ঝিল্লীর আর্ত্তনাদ ভেদ করিয়া চুব্‌ড়ি-পাতার চটকল হইতে ঘড়ির অস্পষ্ট ঢং ঢং শব্দ কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেছিল। মহিম সেই দিকে একবার চাহিয়া চট্ করিয়া বলিল,—তুই আর যাবিনে সেখানে, রহিম ?

—কোথায় বাবু ?

—সেই তোর দিদির বাড়ী ?

—ওঃ হ্যাঁ—কাল আবার যাব দাদাবাবু—

—আজই চল্‌না, হয়ত তারা উপোস করে আছে, চল রহিম, পুণ্যি হবে—

রহিম আবার তেমনি করিয়া হাসিল, বলিল, তা উপোস করেই আছে বাবু—তারা কিছু খেতে পায়নি—কিন্তু এই রাতে গিয়ে কি করতি পারব বাবু তাই ভাবচি—

—তা হক চল্ না দেখি—তুই বললি তাদের আবার অসুখ, গরীব লোকের অসুখ হলে, খেতে না পেলে কি দেখা উচিত নয়, রহিম ?

রহিম মৃদু হাসিয়া বলিল, চল যাই—উঃ কি মশা এখানে বাবু, এই পচা খানা, নর্দ্দমা পাঁকে ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে—বলিয়া নিজের হাত পা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—আমার গায়ের চাদরটা নিবি ?—একটু একটু শীত পড়েছে—

—নাঃ, মশায় যে কামড় দিয়েছে, গায়ে জ্বালা ধরে গেছে—বলিয়া শুধু গায়েই সে চলিতে লাগিল।

ভিতরে ঢুকিতে বাধা নাই। বড় দেউড়ীর পাল্লা দুইটা কবে কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। সুমুখ দিকে মহিমের কিছুই নজর পড়িল না, কেবল একটা শেয়াল অন্ধকারে আসিয়া যে দরজাটার ফাঁক দিয়া আলোর রেখা দেখা যাইতেছিল, সেইখানে এদিকে ওদিকে উঁকি মারিতেছিল, ইহাদের দেখিয়া পলাইয়া গেল।

রহিম সেইদিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, ওই ঘরে দিদি আছে, ডাকব বাবু ?

মহিম থতমত খাইয়া গেল। তাহার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করিতেছিল। ভয়ে নয়, মানুষের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতায়। সে যে ঠিক এই অন্ধকার রাত্রে অসময়ে পরের সাহায্য করিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে তাহাই ভাবিয়া একটা আত্ম-অবিশ্বাসের অজ্ঞাত শিহরণে থমকাইয়া দাঁড়াইল।

রহিম তাহার মুখের অবস্থা অন্ধকারে লক্ষ্য করিতে পারিল না, পুনরায় বলিল, বাবু ডাকব ? কিন্তু ডাকিতে হইল না। বন্ধ দরজাটি খুট করিয়া খুলিয়া গেল। একটি মিটমিটে কেরোসিনের ডিবে ও একহাতে একখানা ময়লা কাঁথা লইয়া মনোরমা বাহির হইতেছিল। রহিম সেইখান হইতে ডাকিল, দিদি ?

—কে রে—বলিয়া মনোরমা কাঁথাখানা ফেলিয়া আলোটা তুলিয়া ধরিল। মহিম স্পষ্ট দেখিল দুইটি চোখে জলের ধারা চকচক করিতেছে। কাল একবার সে ইহাকে দেখিয়াছিল, আজ ভাল করিয়া দেখিল, মুখখানি মাধুর্য্যময়, বয়স আন্দাজ তেইশ কি চব্বিশ হইবে।

—আমি, বলিয়া রহিম অগ্রসর হইয়া গেল।

গাঢ়স্বরে মনোরমা বলিল, এত রাতে আবার কেন এসেছ ভাই, বলিয়া হাত দিয়া চোখের জলটা মুছিয়া বলিল, তোমার জামাইবাবুকে বোধ হয় আর বাঁচাতে পারলুম না রহিম—বলিতে বলিতে সে আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রহিম তাড়াতাড়ি বলিল, আমার সঙ্গে ইনি এসেছেন দিদি—ডাক্তার আনবেন কি ? এঁরা খুব বড় লোক, পয়সা নেবেন না—

—কে এসেছেন ? বলিয়া বিস্মিতভাবে মনোরমা মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিল।

মহিম এইবার সরিয়া আসিয়া বলিল, আপনি রুগী নিয়ে দুদিন রয়েছেন, আমাদের খবর দেননি কেন, আমরা ডাক্তার পাঠিয়ে দিতুম—

মাথা নীচু করিয়া মনোরমা বলিল, আমরা ত আপনাদের চিনিনি, আপনারাও চেনেন না, সুতরাং—

মহিম বলিল, কিন্তু বিপদের সময় চিনিনি বলে অভিমান করা ত সাজে না, মানুষের ওপর মানুষের চিরকালের দাবীটুকু ত আছে। শোন্ রহিম—তুই চট্ করে আমাদের বাড়ী গিয়ে সতীশ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়, বারটা বাজেনি—এখনও আমাদের বৈঠকখানায় তিনি বসে আছেন—যা। রহিম ঘাড় নাড়িয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

মহিম একটু থামিয়া বলিল, আপনারা কোথায় ছিলেন ?

—বহরমপুরের একটা গ্রামে—

—ওঃ পাগলার দেশ—ম্যালেরিয়ার আড্ডা, আপনার স্বামীর ম্যালেরিয়া ত—

—না, হাঁপানি, ম্যালেরিয়ায় আমার মেয়েটি ভুগছে—

—আপনার মেয়ে! ওঃ তা ডাক্তার সারিয়ে দেবে—চলুন আপনার রুগীদের

দেখি—বলিয়া অলক্ষ্যে একবার তাহার দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া মহিম ঘরের ভিতর ঢুকিল।

চক্ষের অশ্রু আর বাধা মানিল না, ভিতর হইতে সে যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। রোগী মরিতে বসিয়াছে সে ত বটেই, কিন্তু আজ বিশ্বের সমস্ত করুণাটুকু হাতে করিয়া এক অনাথিনীকে যে এই যুবকটি ঘোর নিশারাতে কেবল শুধু সাহায্য করিতেই ছুটিয়া আসিয়াছে, ইহারই জন্যে মনে মনে মনোরমা বারংবার ঈশ্বরকে প্রণাম করিল এবং অপলক দৃষ্টিতে একবার যুবকটীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বুঝিল, ইহারা তাহাদেরই একজন, যারা চিরদিন গরীব দুঃখীদের আলেয়ার আলো দেখাইতে পারে।

একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর, ততোধিক জীর্ণ একখানি কাঁথাতে মন্মথ শুইয়া টানিয়া নিশ্বাস লইতেছিল। মহিম তাহারই এক পাশে গিয়া বসিল। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটা টিনের বাক্স, দুই তিনটা বোতল, একটি লাঠি, একটা পোড়া কলাইয়ের বাটি, আর কিছু নাই। ওধারে একখানা লেপের উপর বিমলা চোখ বুজিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিল। কেরোসিনের ডিবের শিস্ উঠিয়া এবং ভিজা মাটির দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

চুপ করিয়া থাকা যায় না। মহিম বলিল, আপনাদের রান্নাবাড়ার হচ্ছে না বোধ হয়?

—হয়েছে, ওই রহিম কোত্থেকে পয়সা দিয়ে ডাল এনে দিয়েছিল—ছেলেটি বড় ভাল, মুসলমান বলেই সেই জন্যে—। আমার অভাবের ব্যথা রহিমই প্রথম বুঝেছিল। কাল একটি লোক এসেছিলেন, কিন্তু তিনি—

রহিম বলিল, হ্যাঁ—তিনি আমাদের সমিতির খগেনবাবু, তাঁকে নাকি আপনি অপমান করেচেন?

আমি? বলিয়া কাতর ম্লান চক্ষু দুটি মনোরমা মহিমের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, আমার এই অবস্থায় লোককে অপমান করেছি?

মহিম সেই দৃষ্টিতে ব্যথা পাইল। সলজ্জ ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, স্বার্থপর লোকের স্বার্থে আঘাত লাগলে হয়ত অপমানই বোধ করে, তা করুক; কিন্তু আপনি ত জানেন চোখ ফুটিয়ে দেওয়াটাই অপমান করা নয়!

বাহিরে রহিম ডাকিল, দিদি ডাক্তারবাবু এসেছেন—

এইটুকু আমার সান্ত্বনা—বলিয়া মনোরমা আলোটা লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহিম বলিল. কি রকম দেখচেন, সতীশবাবু?

খুব বেড়ে গেছে,—

মনোরমা বলিল, আজ বিকেল থেকে আর সহ্য করতে পাচ্চেন না, দয়া করে একটু ভাল ওষুধ দেবেন—

মহিম বলিল, ভাল ওষুধই দেবেন, কেননা আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল হলে উনি নিশ্চয় রোগী হাতে রেখে চিকিৎসা করতেন—

বিমলাকে একবার নাড়াচাড়া করিয়া ডাক্তার বলিলেন, এ ত ম্যালেরিয়া দেখতে পাচ্ছি—বলিয়া মহিমকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলে মহিম বলিল, রোগটা হাঁপানি ত ?

হ্যাঁ, কিন্তু অবস্থা বড় সুবিধা নয়,—

মনোরমা আলো হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহিম বলিল, আজকে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই, আপনি রোগীর কাছে বসুনগে—

ওষুধ দেবেন না ?

না, আজ ওষুধের দরকার নেই, কাল ওষুধ নিয়ে আমি নিজেই আসব—বলিয়া মহিম এক পা গিয়ে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর যা যা দরকার, আমি কাল পাঠিয়ে দেবো—আর রহিম, তুই এখানে থাক্—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অর্দ্ধচেতন দেহে মনোরমা বলিল, ঘরের ভেতরে এস ভাই রহিম—ডাক্তার কি বললেন ?

সেরে যাবে বললে দিদি—বলিয়া রহিম আস্তে আস্তে ঘরে উঠিয়া আসিল।

৩

ওষধ খাইয়া রোগী একভাবেই রহিল, কিন্তু সেদিন বৈকালে আরও বাড়িয়া গেল। জেলা শহর হইতে সকাল বেলা মহিম বড় ডাক্তার আনিয়াছিল। তিনিও ওই কথা বলিয়া গেলেন, অবস্থা ভাল নয়। বিমলাও ভাল নাই, আগে উঠিতে পারিত, এখন শুইয়াই থাকে। পেটের পিলেটা বড় হইয়া পেটটা ধামার মতন হইয়া উঠিয়াছে, কখন ফাটে। মনোরমা নিরুপায় হইয়া বলিল, কি হবে মহিমবাবু ?

মহিম বলিল, আপনার কি ইচ্ছে বলুন, আমি এখুনি করতে প্রস্তুত আছি। আড়ালে গিয়া মনোরমা শুধু কাঁদিতে লাগিল।

রহিম সজলকণ্ঠে বলিল, এমন ডাক্তার কি নেই দাদাবাবু, যে ভাল করতে পারে ?

মহিম এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, সে হচ্চে ভগবান, আর কেউ নয়।

রহিম চুপ করিয়া সরিয়া গেল।

মহিম দুই দিন বাড়ী যায় নাই, চাকর ডাকিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় একটু বাহির হইলেই সান্ধ্যসমিতির ছেলেরা তামাসা করে। মহিম প্রতিবাদ করিয়া কিছু বলিতেও পারে না, কাহারও সহিত দেখা হইলে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠে।

আজ মহিমের বাড়ী থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু একবারটি গিয়া চারটি ভাত খাইয়া আসিয়াছে, আর যায় নাই। তারপর এখানে আসিয়া রোগীর পাশের অপ্রশস্ত অতি জীর্ণ ঘরখানায় বাড়ীর চাকর দিয়া একটা বিছানা আনিয়া পাতিয়াছে। সন্ধ্যার পর মনোরমা বলিল, কই আপনি গেলেন না, যাবেন বলেছিলেন ?

মহিম বলিল, চলে যাওয়াটাই কি এত জরুরী, আর আপনার বিপদের অবস্থাটা কি এতই তুচ্ছ ? অবশ্য আমায় যেতে বললেই—

—ছিঃ ওকথা বলবেন না, আপনার এ উপকারের দাম আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না। কিন্তু এ ঘরে আপনি কি থাকতে পারবেন? বলিয়া ঘরখানার ভিতর একবার উঁকি দিয়া বলিল, বড় লোকের চিহ্নটুকু কিন্তু আছেই।

সবিস্ময়ে মহিম বলিল, কি রকম?

ঐ বিছানাটি, পরিষ্কার ধপধপে—ওই যা বিমলি বুঝি বমি করছে—বলিয়া মনোরমা আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আবার বাহিরে আসিয়া মনোরমা বলিল, এবেলা কি খাবেন?

মহিম বলিল, বেলা আর নেই, রাত পুইয়ে এল—

রান্নারান্না ত করিনি—

সে কথা আমিও জানি, আর তার উপায়ও করে রেখেছি, এখন যদি অনুগ্রহ করে—

অনুগ্রহ! কি করেছেন?

আমি বাড়ী থেকে খাবার আনিয়েছি, কিন্তু আপনি কি খাবেন? আমরা দু'জনেই স্বজাতি এবং পর ভাবিনে বলেই একথা বললুম।

একটা প্যাচা হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল, তার পর সব নীরব। সম্মুখে দূরে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। মনোরমার শিথিল দৃষ্টি যেন চিরকালের জন্য অবসর চাহিল, সম্মুখের অনন্ত পৃথিবী যেন মরণের মহাক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িতেছিল, এবং তাহারও অন্তর জলপ্লাবনে তরঙ্গরাশির ন্যায় ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া উম্মত্ত আকর্ষণে তাহাকে টানিতেছিল। সে মাথা হেঁট করিল।

মহিম একটু হাসিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার ইচ্ছে নেই বুঝি?

আপনি খানু, বলিয়া মনোরমা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে সে উঠিল না, আহারে রুচি চলিয়া গিয়াছে। আশপাশের আবর্জ্জনা এবং মাটির অসহ্য দুর্গন্ধে তাহার মাথার যন্ত্রণা হইতেছিল। পরণের কাপড়খানায় বিমলা বমি করিয়া দিয়াছে, তাহাতেও দুর্গন্ধ। কিন্তু আপাতঃ প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই দেখিয়া সে ডিবেটা চৌকাঠে রাখিয়া আসিয়া একটা ঢিপির উপর বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ জানি না, বোধহয় অনেকক্ষণ হইবে, সেইখানেই বসিয়া রহিল, সহসা পিছন হইতে সম্মুখে আসিয়া মাথা হেলাইয়া মহিম বলিল, আপনি এখানে বসে যে?

মনোরমা চমকিয়া উঠিল, বলিল আপনি এখনও ঘুমোননি বুঝি?

না, একি, আপনি কাঁদচেন কেন? আলোতে সে মনোরমার মুখখানি লক্ষ্য করিতেছিল।

মনোরমাকে বলিল, আমার আর কেউ নাই মহিমবাবু।

মহিম বলিল, একজনের কেউ নেই, এ হ'তে পারে না!

মুখ তুলিয়া মনোরমা চাহিল। জলে তাহার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে স্বল্প আলোকে দেখিতে পাইল শুধু দুইটা চক্ষু, আর কিছু না। ওই উজ্জ্বল চক্ষু দুইটার দৃষ্টি যেন তাহার দেহের আবরণটা ছিন্ন বিছিন্ন

করিয়া অন্তরলোকের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। মনোরমা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল—শুষ্ক কঠিন কণ্ঠে বলিল, আপনি কাল ত নিশ্চয় যাবেন ?

হ্যাঁ কালই যাব, আপনার কিছু—?

বেশ, আপনার উপকার আমি ভুলবনা। তবে আজ শুয়ে পড়ুনগে—ইত্যাদি দু' একটি অসংলগ্ন কথা বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি আলোটা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুয়ারের খিলটা আঁটিয়া দিল।

বিপদ কিন্তু আরও ঘনাইয়া আসিল। মন্মথর হাঁপানির টান আরও বাড়িয়া গিয়া 'শ্বাসে' পরিণত হইল ; মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না, চোখ দুইটা ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে, পা ফুলিয়াছে। কখনও ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদিয়া বলে, দুটি ভাত দিতে পার না মা ?

মা বলে, অসুখ সেরে গেলে ভাত দেবো, মা—ডাক্তার বারণ করেছে—। বিমলা চুপ করে, পাণ্ডুর চোখ দুইটা দিয়া জলের ফোঁটা কাঁথায় পড়ে।

বৈকালে মহিম আসিল। মনোরমা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, কাল আমি যদি কোনও দোষ করে থাকি তবে মাপ করবেন ;

মহিম বিস্মিত হইয়া বলিল, কই আমার ত মনে পড়ে না যে আপনি দোষ করছেন—?

মনোরমা সেখান হইতে সরিয়া গিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, রহিম কাল থেকে আসেনি কেন ?

সে এখানে আসে বলে খগেনবাবু তাকে মেরেছেন, হাতটা বোধ হয় তার ভেঙ্গেই গিয়েছে।

শুনিয়া মনোরমা শিহরিয়া উঠিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, হাত ভেঙ্গে দিয়েছে ? কেন, আমি কি এতই ঘৃণার পাত্রী ? আপনিও তবে আর আসবেন না, মহিমবাবু।

ছিঃ ওকথা বলবেন না, আর যার কাছেই হ'ক, আমার কাছে আপনি ঘৃণার পাত্রী নন্ মোটেই।

মনোরমা সজল চক্ষে সরিয়া গেল। রহিমের ব্যথাটা তাহার বড় বাজিয়াছিল।

সে-রাত্রি আর কাটে না। নিঃশব্দে অন্ধকারের ভয়ার্ত্ত বিভীষিকা লইয়া মৃত্যু সেদিন এই ভগ্ন জীর্ণ গৃহখানিকে অধিকার করিয়া রহিল। মিটমিটে আলোকে তাহার সে মূর্তি আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতে ছিল। মহিম চলিয়া গিয়াছে, সকাল না হইলে আর আসিবে না। মনোরমা কাত হইয়া বিছানার এক ধারে একখানা হাত মন্মথর গায়ের উপর রাখিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সে দৃষ্টিতে আর কিছু ছিল না, সারা সংসারটা যেন চেতনাহীন শিথিলতায় আপনার বাঁধনটি আলগা করিয়া সম্মুখে ধীরে ধীরে লুটাইয়া পড়িতেছিল এবং তাহার এই তন্দ্রালু দৃষ্টির অন্তরালে সঙ্গোপনে মৃত্যু তাহার ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া কখন যে মন্মথর প্রাণটুকু চুরি করিয়া লইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সকাল বেলায় মহিম আসিয়া চার পাঁচটি লোক দ্বারা শবের সৎকার করিতে পাঠাইল। সে নিজে গেল না। মনোরমা বলিল, আমাকেও যেতে হবে কি?

মহিম বলিল, সেখানে যাওয়া দুরূহ, আপনার চিন্তা নেই, ওরা নির্বিঘ্নে কাজ শেষ করে ফিরে আসবে।

মনোরমা চুপ করিয়া চলিয়া গেল। চোখে তাহার অশ্রু নাই, থাকিলে প্লাবন বহিয়া যাইত।

বিমলা মায়ের দুঃখে কাঁদিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। বিকৃত মুখে পাশ ফিরিয়া পড়িয়া রহিল।

অনেক বেলায় ডোবার ধারে বসিয়া মনোরমা মাথার সিঁদুর মুছিল, হাতের কাচের চুড়ি ভাঙিল, লোহা খুলিল, তারপর স্নান করিয়া শুচি হইল।

দিন চারেক পরে রহিম আসিল। দিদির অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মনোরমা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, কেদে কি হবে ভাই, আমি জানি এ দুঃখ আমার সইতে হবে, এর জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলুম, বলিয়া সে রহিমের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, কিন্তু আমার জন্যে তোমাকেও যে এই ভাঙা হাতের ব্যথা সইতে হচ্ছে রহিম, এর সান্ত্বনা ত আর আমি খুঁজে পাচ্ছিনে ভাই?

রহিম এত কথা সব বুঝিতে পারিল না বটে, তবে এ স্নেহের স্পর্শে ভুলিয়া গেল, বলিল, তুমি আমায় ভালবাস দিদি?

তা কি তোমার বিশ্বাস হয় না রহিম, মুসলমান বলে কি তুমি আমার ভাই নও?

রহিম মাথা নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তার জন্যে নয় দিদি; আমরাও যে গরীব।

ভিতর হইতে বিমলা ক্ষীণ কণ্ঠে মা মা বলিয়া ডাকিল। মনোরমা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া বলিল, এই যে মা দুধ গরম করে দিই, বলিয়া বাটিটা আগুনের উপর বসাইয়া দিল।

মেয়েকে দুধ খাওয়াইয়া যখন বাহিরে আসিল, দেখিল হাতের উপর মাথার ভর দিয়া মহিম চুপ করিয়া বসিয়া আছে। পিছন হইতে মনোরমা বলিল, রহিম কই?

তাকে যেতে বললুম, নয় ত বেটা আবার হয়ত মার খেয়ে মরবে, বলিয়া মহিম একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

তা বেশ করেছেন, আপনিও এবার যাচ্ছেন বোধ হয়। তা যান, আর থেকেই বা আপনার লাভ কি!

মহিম চাহিল, আবার সেই দৃষ্টি, কিন্তু এবার মনোরমা তাহা দেখিতে পাইল না, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল। মহিম বলিল, লাভ? কি লাভের জন্যেই ছিলুম?

না তা নয়, রুগী বাঁচলে আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার হত। যারা সেবা করে তাদের সেইটুকুই লাভ। কিন্তু আপনার এ উপকার আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

কথার মধ্যে জড়তা বা দ্বিধার লেশমাত্র নাই। মহিম বিস্মিত হইল, পূর্বে তাহার

সকল কথাবার্তার আড়ালে একটু কৃতজ্ঞতা থাকিত, কিন্তু ইহাতে তাহাও নাই। সে মুহূর্ত মাত্র ভাবিল তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, কিন্তু পরিশ্রমের পুরস্কার ত আছে, সেটা চাইলে ত পাপ নেই।

হঠাৎ মনোরমা মুখ ফিরাইল, তারপর বলিল, আপনি কি স্পষ্ট কথা বলতে জানেন না মহিমবাবু? আপনার অভাব কিসের যে আপনি পুরস্কার চাইছেন? তা ছাড়া আমার আছেই বা কি যে দেবো?

মহিম একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল, দেবার মত কিছু কি নেই? এবং আরও কিছু বলিতে গিয়া সহসা মনোরমার মুখের অদ্ভুত পরিবর্তনের দিকে চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিল।

কি বললেন? ওঃ বুঝতে পেরেছি আপনার কথা।

মহিম বিবর্ণ মুখে চাহিল।

শোন মহিম, তুমি যেদিন রাত্রের অন্ধকারে আমার সুমুখে এসেছিলে আমি তখন তোমার মুখের দীপ্তিটুকু দেখে ভাবলুম তুমি দেবতা, কিন্তু আজ বুঝেছি তুমিও মানুষ, রক্ত মাংসের তৈরী তুমি। আজ বুঝতে পাচ্ছি তোমার মুখে সেটুকু আগুনের ফুল্কি ছিল। উপকারের কথা বলছিলে? জগতের ওপর আমারও যে ক্ষুদ্র অধিকারটুকু আছে তারই জোরে আমি তোমার কাছে সাহায্য নিয়েছি, কিন্তু সে বাঁধনটুকু তুমি আজ নিজেই কাটলে ভাই, বলিতে বলিতে অধীর আবেগে মনোরমার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

মহিম বজ্রাহত হইয়া মাথা নীচু করিল। এত বড় আঘাত সে জীবনে পায় নাই। সহসা একটা বিদ্যুৎ শিহরণ তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিল। সে টলিতে টলিতে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন আবার সে আসিল। মনোরমা হবিষ্যাধ চড়াইতেছিল, তাহার সুমুখে আসিয়া বলিল, আমায় মাফ করুন, আমি ভুল বুঝতে পেরেছি।

ম্লান হাসিয়া মনোরমা বলিল, তোমার সকল দোষ যে আমায় মাপ করতে হবে ভাই, তোমার উপকার যে আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

মহিম দাঁড়াইতে পারিল না, চলিয়া যাইতেছিল, মুখ বাড়াইয়া মনোরমা বলিল, তোমার টাকা কটা আর বিছানা চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, পেয়েছ বোধ হয়?

হ্যাঁ।

* * *

সেদিন সান্ধ্য সমিতির আখড়ায় খগেনবাবু বলিলেন, সব শুনলে ত?

সকলে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ?

এমন মিটমিটে ডান তা জানতুম না, সাত মাসের চাঁদা বাকি আর ওদিকে দান ছত্তর খুলে বিধবা ছুঁড়িটাকে নিয়ে কি বেলেল্লা গিরিই করছে, জমিদারের বেটা কি না—তার জন্যেই ত রহিম ছোঁড়া মার খেয়ে ম'ল, সেই পথ দেখালে।

বলাই রাগিয়া গিয়াছিল, বলিল, তার হাড়টা কি ভেঙ্গে গেছে, খুড়োমশাই!

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া খগেন বাবু বলিলেন, তুমি বোঝ না বন্ধু, ও মুসলমানের হাড় আবার ঠিক জোড়া লাগবে, কই হতভাগা গেল কোথায় ?

রহিম বাহিরে অন্ধকারেই চেটাইয়ের উপর 'বার বাঁধা' বাঁ হাতটা ধরিয়া বসিয়াছিল, আস্তে আস্তে উঠিয়া ভিতরে আসিল। চোখের জল সে যে এইমাত্র মুছিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

আর তাদের বাড়ী যাবি হতভাগা ? এত চেষ্টা করি হিন্দু মুসলমানের মেলবার জন্যে, কিন্তু তা কি তোদের মতন পাষণ্ডদের আবার হবার যো আছে ? হুঃ, বলিয়া তিনি হুঁকায় একটা জোরে টান দিয়া উপর দিকে ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় বলিলেন, কেন তুই অমন নষ্টামি করতে গেলি ? মেরে বসলুম, হাতের যন্ত্রণা হচ্ছে খুব ?

চোখের জল আর রহিমের বাধা মানিল না। কিন্তু তাহা অতি কষ্টে রোধ করিয়া না বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া এক হাতে মুখখানা ঢাকিয়া সে অন্ধকারে বসিয়া পড়িল। তাহার এ অশ্রু শুধু যে হাতের বেদনার জন্যই তাহা নয়, কিন্তু প্রহারের ঘায়ে হাত ভাঙ্গা সত্ত্বেও যে তাহার 'দিদির' বৈধব্যটুকু রদ হইল না, এ অশ্রু সে কারণেও।

৪

মেয়েটাও বাঁচিল না। লিভার পিলেতে হলদে হইয়া, দম্ আটকাইয়া একদিন দুপুর বেলায় তাহার শেষ হইয়া গেল। সাহায্য করিবার আর কেহ ছিল না, শুধু রহিম অদূরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। মনোরমা তাহার দিকে একবার চাহিয়া ছেঁড়া কাঁথাবালিশ মাদুরসুদ্ধ মৃত দেহটাকে তুলিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিল। একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ স্বর যেন মৃত দেহটাকে ভেদ করিয়া কেবলই তাহার কানে কঠিন হইয়া বাজিতে লাগিল, 'দুটি ভাত দিতে পার মা ?'

নির্জন দুপুরের রৌদ্রটা জনশূন্য ভগ্ন পুরীর মধ্যে খাঁ খাঁ করিতেছিল। সুমুখের ভিজা পাঁচিলের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া তাহা হইতে এক প্রকার ধোঁয়া বাহির হইতেছিল।

কি হবে রহিম ?

রহিম চোখ মুছিয়া বলিল, আমি এখনি উপায় করে দিচ্ছি।

একদৃষ্টে মৃত কঙ্কালখানার পানে চাহিয়া মনোরমা পুনরায় বলিল, এর হাড়খানা গঙ্গায় দিস্ ভাই, বড্ড জ্বরে ভুগেছে।

* * *

দিন দুই বাদে মনোরমা যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, রহিম কোথা হইতে আসিয়া বলিল, কোথায় যাচ্ছ দিদি ?

এস ভাই রহিম, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি, দেখা হ'ল ভালই হ'ল।

তুমি চলে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ ভাই ; আমার সতীনপো, সে ত আমারই ছেলে, আমি তারই কাছে কলকেতায়

গিয়ে থাকব, সে আমায় কখনই ফেলতে পারবে না। তুমি খুব ভাল হয়ে থেকো ভাই, আর যেন গরীবের উপকার করতে যেও না, তা হলে ও হাতটিও যাবে, চল বেরোই, বলিয়া চক্ষের জল মুছিয়া একটা ছোট পুঁটুলি লইয়া রহিমের কাঁধে হাত দিয়া সে বাহির হইল।

*   *   *

সেদিন সকাল বেলা খগেন বাবুর সম্মুখে গিয়া রহিম বলিল, আমার বাকি মাইনে চুকিয়ে দিবেন কর্তা।

বিস্মিত হইয়া খগেন বাবু বলিলেন, মাইনে! কিসের?

যা পাওনা আছে।

ওঃ, বলিয়া অলক্ষ্যে তিনি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। এ মুখের সহিত তাহার কোনও দিনই পরিচয় ছিল না। আজ দেখিলেন মুসলমান জাতির সমস্ত কাঠিন্যের চিহ্নটুকু সে মুখে বর্ত্তমান বয়স অল্প হইলেও জাত সাপ বটে।

হ্যাঁ বাকি আছে বটে,—মাইনে নিয়ে কি করবি রহিম?

দেশে যাব, আর তোমার তরফে কাজ করব না।

আচ্ছা, ও বেলা দিয়ে দেবো।

বিকাল বেলায় মাহিনা লইয়া রহিম দেশে মা বাপের কাছে চলিয়া গেল।

*   *   *

সান্ধ্য সমিতির আড্ডা তেমনি ভাবে বসে। তাস খেলাও হয়। চাঁদা আদায়ও সেইভাবে হয়। খগেনবাবু বলেন, সাত মাসের চাঁদা বাকি রেখে ছোঁড়া ডুব মারলে, জমিদারের বেটা কিনা।

বলাই বলে, আপনারও তিন মাসের বাকি।

খগেন বাবু তেমনি ভাবেই বলেন, ওই যা, পাঁচ কাজে ভুলে গেছি।

*   *   *

ভাঙ্গা বাড়ী তেমনি পড়িয়া আছে। রাত্রির ভয়ার্ত্ত অন্ধকার তেমনি ভাবেই শূন্য পুরীতে জমাট বাঁধে- ঝিঁ ঝিঁ কাঁদে, শেয়াল ঘুরিয়া যায়।

তারপর, তোমায় কি বলা হল ?—

সুধীর বৌ-দিদির প্রশ্নে থতমত খাইয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। সুনীতি ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, থামলে যে ? আর কোন আঘাতই আমায় টলাতে পারবে না—

সুধীর নতমুখে বলিল, দরজায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর টলতে টলতে এসে—

টলতে টলতে ? কেন ? সেই ছাইপাঁশ খাওয়া হয়েছিল বুঝি ?

হঁ্যা।

তারপর ?

বললে যে, আমি এখন আর যেতে পারব না, আমার অনেক কাজ ; আমি অনেক অনুরোধ করলুম, শেষে তিনি চলে যেতে যেতে বললেন, আমায় বিরক্ত করো না, আমি এখন যেতে পারব না।

সুধীরের গলা ধরিয়া আসিতেছিল ; কেন যে এমন স্নেহের, করুণার প্রতিমূর্ত্তি বৌ-দিদির উপর তাহার দাদা এমন নিষ্ঠুর অবিচার করিতে পারে, তাহা সুধীর কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। সে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল ; ক্রোধে ও অভিমানে সে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল।

বক্ষের জমাট-অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া স্থির কণ্ঠে সুনীতি বলিল, যে বাড়ীতে তিনি থাকেন, সেটায় কি আর কেউ থাকে, কোনও কোনও ?—

তা আমি জানি না। বলিয়া সুধীর বেগে বাহির হইয়া গেল।

দূরে নারিকেল বৃক্ষ হইতে কয়েকটা চিল চীৎকার করিতেছিল ; রেলের বাঁশীর একটা ক্ষীণ আর্ত্তস্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল ; আসন্ন সন্ধ্যার রক্তরাগচ্ছটায় ওই দূরে আমগাছের শীর্ষটা বাধা হইয়া উঠিতেছিল। সুনীতির কম্পিত ওষ্ঠাধর কেবলই বলিতে চাহিতেছিল, আর তিনি আসিবেন না। সুনীতি ভাবিতে লাগিল, ইহার কি কোনও উপায় নাই ? যদি অত্যাচারের বিপক্ষে তাহারা বাড়াইত ; যদি তাহারা অবিচারের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। যদি পুরুষের দৃষ্টি হইতে আপনাকে সরাইয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিত, তাহা হইলেই বুঝি পুরুষকে কতকটা বুঝিতে পারা যাইত।

সুনীতির কান্না পাইল ; ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, কেন কেন এত অবিচার করছ তুমি ? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করিনি। কিন্তু কে শুনিবে ?

রাত্রিতে নিকটে আসিয়া সুধীর ডাকিল, বৌ-দি—

সুনীতির সবে তন্দ্রা আসিতেছিল, বলিল,—কি বলছ ঠাকুর-পো ?

শুয়ে রইলে খাওয়া-দাওয়া করলে না ?

আজ শরীরটা ভাল নেই, কিছু খাব না ভাই।

সুধীর চলিয়া যাইতেছিল। অভিমানী দেবরটিকে সুনীতি বেশ ভাল করিয়াই চিনিত, সুতরাং তাহার এই কথা যে তাহার দেবরকেও উপবাসী রাখিবে, এবং ক্ষুধার মুখে দেবরের এ উপবাস হয় ত তাহার স্বাস্থ্যে বিঘ্ন ঘটাইবে,—এটা সুনীতি আগে ভাল করিয়াই জানিত, তাই পুনরায় বলিল, আচ্ছা চল, যাচ্চি।

সুধীর দাঁড়াইয়া রহিল। সেও কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারিয়া ছিল যে বৌ-দিদির শরীর ভাল না থাকিবার কারণ তাহারই আজিকার আনীত সংবাদের সহিত অনেকটা সংশ্লিষ্ট ছিল।

ও রকম ক'রে ভেবে নিজের মন খারাপ করো না ঠাকুর-পো, চল রাত হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সুধীর সুনীতির অনুসরণ করিল।

এইরকম ভাবেই দুই মাস কাটিয়া গেল। এপর্যন্তও সুধীর আর তাহার দাদা ললিতের খবর পায় নাই; সুনীতিও লইতে বলে নাই। সন্তান-সন্ততি কিছুই হয় নাই, যাহাকে লইয়া সুনীতির সারাদিনের দীর্ঘ অবসরটা কাটিতে পারে, আর তাহার দিন কাটিতে চাহিতে ছিল না। সুধীরের সঙ্গে গল্প করিতে বসিলে, অর্থাৎ অন্য কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নিজেকে অন্যমনস্ক করিতে চাহিলে, সেই এক চিন্তাই মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলে; চক্ষের জল রোধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা পাইয়া দেবরের নিকট হইতে উঠিয়া যাইতে হয়। সুধীরের দৃষ্টি তাহা এড়ায় না, তাহার সান্ত্বনা-বাক্যগুলি শেষে সুনীতির লজ্জার কারণ হয়। নির্জনে থাকিলে চিন্তা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।

কতদিন সে কাতর হইয়া ললিতকে চিঠি দিয়াছিল, কিন্তু উত্তর পায় নাই। সে মাত্র জানিতে চাহিত, তিনি কুশলে আছেন কি না। সংসারের অভাব অনটন, প্রয়োজন, অপ্রয়োজনের জন্য তাহারা দুই জনে কতটা দায়ী হইয়া পড়িতেছে, তাহা সুনীতি তাঁহাকে জানাইয়া বিরক্ত করে নাই। বিদেশে চাকরী কি কেহ করিতে যায় না ? চাকরী করিতে যাইয়া কি সকলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব স্ত্রী-পুত্র ভুলিয়া যায় ? বার বার কাতর হৃদয়ে সে পত্র লিখিয়াছে, 'ওগো তুমি কেমন আছ ? একবার উত্তর আসিল, 'আমায় জালাতন করিও না, এখন যাইতে পারিব না।—'

সুধীর কতকটা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বৌ-দি, কাঁদছ তুমি ?

না ভাই। বলিয়া সুনীতি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সুধীর ডাকিল, বৌ-দি, শোন—

কি ?

তুমি নিজের শরীরের দিকে চাইছ না, এ রকম ভেবে আর কতদিন বাঁচবে বল ত ? আমাদের সংসারে আর কেউ নেই, তার ওপর তুমি যদি অমন

ক'রে দিন-রাত শরীরটাকে কালি ক'রে ফেল, তাহলে আমরা আর কার আশ্রয়ে দাঁড়াই ?

ভাবনা ভিন্ন কি ভাই মানুষ থাকতে পারে ? এই দেখ না, ঘরে আজ চালডাল কিছু নেই, পয়সা-কড়ি সব ফুরিয়ে গেছে, এ রকম ক'রে আর কি ক'রে চলে বল দিকি ?

কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া সুনীতি বড়ই অপ্রস্তুত হইল। সুধীর বিস্মিত হইয়া বলিল, কই, এ কথা তুমি আমায় বল নি ত ?—

দিন-রাত তোমায় এসব অভাবের কথা বলে আর কি বিরক্ত করতে ভাল লাগে ?

তাহলে আমি জিনিস-পত্রগুলো এনে দিই—

"না, আজ আর কিছু আন্‌বার দরকার নেই, তোমার খাবার তৈরী আছে।

আর তুমি ?

সুনীতি একটু ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, না, আজ আর কিছু খাব না ভাই, আমার মাথাটা একটু ধরেছে।

একটু বিজ্ঞের ভাণ করিয়া সুধীর বলিল, খাবার ইচ্ছে না থাক্‌লে বোধ হয় অনেকরই মাথা ধরে।

সত্যি ভাই, মিথ্যে কথা বল্‌ছি না।

কেন, জ্বরের মতন হয়েছে নাকি ?

কি জানি।

দেখি বলিয়া সুধীর সুনীতির কপালে কতকক্ষণ হাত টিপিয়া দেখিল, সত্যই জ্বরে সুনীতির মাথা ভাঙিয়া যাইতেছে।

সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এ-ত খুব জ্বর হয়েছে দেখছি—আমায় এতক্ষণ বল নি কেন বৌ-দি'—যদি এ জ্বর বাড়ে ?

তোমায় বল্‌লে তুমি কি করতে, আর এখনই বা কি করবে ?

সুধীর ভাবিল, তাইত। সে কি করিবে ? টাকাকড়ি কিছু নাই কোথা হইতে আসিবে তাহারও ঠিক নাই ; ধারে ধারে মাথা বিকাইয়া যাইতেছে, পাওনাদাররা তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সুনীতি বাড়ীতে একলা থাকে, বাড়ীখানা খাঁ-খাঁ করিয়া যেন তাহাকে খাইতে আসে, সুতরাং এ পর্য্যন্ত সেও কোন কর্ম্ম করিয়া সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ঘটি-বাটী যাহা কিছু খুচরা জিনিসপত্র ছিল, তাহাও বিক্রয় করিয়া এত দিন চলিয়াছে, কিন্তু আর তো চলে না।

ধীরে ধীরে সুধীর বলিল, যাই যেমন ক'রে হোক একটা জ্বরের ওষুধ এনে দি।

যাহোক ক'রে, মানে ফের ধার ক'রে ?—না ঠাকুর-পো, আর ধার কর্‌বার চেষ্টা করো-না, মহাজনের কড়া কথা, অপমান আর সওয়া যায় না, তার চেয়ে যা বরাতে আছে তাই হবে।

সুধীর শ্রান্তভাবে বসিয়া হাতে মুখ ঢাকিল। সুনীতি ঘরে ঢুকিয়া সুধীরের বিছানা প্রস্তুত করিয়া দিল, তারপর ঘর ঝাঁট দিয়া যখন বাহিরে আসিল, দেখিল সুধীর তখনও একভাবে বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া সুনীতি ডাকিল, ঠাকুর-পো ?

প্রবল জ্বরের উত্তাপে সুনীতির গা থম্ থম্ করিতেছিল।

এমন ভাবে আর কি ক'রে চলে, বৌ-দি ?

সুনীতি বলিল, ভয় কি ভাই ঠাকুর-পো ? আমি ত আছি।

বুকের ভিতর হইতে একটা প্রবল উপহাসের অট্টহাসি বাহির হইতে চাহিল,—কিসের অভয় সে দিতে পারে। আর কি আছে তাহার। শূন্য সংসারের অভাব, পাওনাদারের রক্তচক্ষু অন্তরীক্ষ হইতে তাহাকে শাসাইয়া উঠিল। তাহার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। বাহিরে অভাবের জ্বালা, ভিতরে জ্বরের অগ্নিসম উত্তাপ। দেওয়ালের গায়ে সুনীতির অবসন্ন দেহ হেলিয়া পড়িল। চক্ষু জ্বালা করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুধীর বলিল, বৌ-দি, তোমার জ্বরটা যে বড় বেড়ে উঠল।—ও কি। আবার কাঁদ্‌ছ ?

থাক্ থাক্—জ্বর হলে অমন চোখ দিয়ে জল পড়ে ভাই।

তা পড়ে বটে, কিন্তু গলাটা অমন ধরে' ওঠে না, বৌ-দি—

সুনীতি হাসিয়া বলিল, ওঃ তুমি বড় চালাক।

সুধীর দাঁড়াইয়া বলিল, চল শোবে চল—এরপর ঠাণ্ডা লেগে জ্বর বেশী বেড়ে যাবে।

সুনীতি উঠিতে পারিতেছিল না, বলিল, আর একটু থাকি, যাব' খন।

সুধীর বুঝিতে পারিয়া বলিল, আচ্ছা আমি ধরছি, আস্তে আস্তে চল।

সুনীতি শয্যা লইল।

জ্বরটা যে এত ভোগাইবে তাহা সুধীর ভাবিতে পারে নাই, দুই-তিন দিন সুনীতির অনুরোধে সে কোনরূপ ঔষধ পত্রের চেষ্টা করিল না। একেবারে যখন সুনীতি অচৈতন্য বাক্‌শক্তিহীন হইয়া পড়িল, সুধীর কম্পিতবক্ষে ডাক্তারের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু দুঃখের পালা শেষই হউক অথবা অন্য কোনও কারণেই হউক, বিজ্ঞ চিকিৎসক যখন আসিয়া ললাট কুঞ্চিত এবং মুখ ম্রীয়মান করিল, সুধীর অন্ধকার দেখিল। তার যে আর জগতে কেহ নাই। ডাক্তার বলিল, জ্বরটা একটু শক্ত রকমের বাপু, প্রথম থেকেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। এ জ্বরে, দু' তিনটে রোগী,—যাক্ ভাল ক'রে সেবা করতে হয়—

সুধীর উদ্বিগ্ন-কাতর স্বরে বলিল, সারতে কতদিন লাগবে ডাক্তার বাবু ?

এ জ্বরটা সাতদিনই থাকে। ছাড়বার সময়ে খুব সাবধানে রাখ্‌তে হয়। তারপর একটা দিন কাটাতে পার্‌লেই সেরে যাবে, আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

ডাক্তার চলিয়া গেল; মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সুধীর ডাকিল, বৌ-দি। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিমীলিত চক্ষে সুনীতি বলিল, কি ভাই ঠাকুর-পো ? উঃ জ্বরটা বড় বেড়েছে, কথা বল্‌তে পার্‌ছি না।

ভাল হয়ে যাবে, ভয় কি বৌ-দি ?

ক্ষীণ হাসিয়া সুনীতি বলিল, ভয়—ভয় নয় ভাই দুঃখ।

৩

পরিশ্রমী এবং সৎস্বভাব বলিয়া আপিসে ললিতের খুব খ্যাতি ছিল এবং সেই হেতুই সামান্য বেতনের কেরাণী হইতে ক্রমে ক্রমে সে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের পদে উন্নীত হইয়াছিল। সামান্য চল্লিশ টাকা মাহিনা হইতেই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিন শত টাকা মাহিনা পাইতে লাগিল।

কিন্তু এই সৎস্বভাব এবং লাজুক যুবকটি তাহার বাসার অনেকের ঈর্ষার পাত্র হইয়া দাঁড়াইল ; কেন না এই চালাক-চতুর এবং ধড়িবাজ লোকগুলি প্রত্যহ নয় ঘণ্টা ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং 'শহুরে বাবুয়ানা' করিতে পায় না, আর এই গেঁয়ো হাবা লোকটা,—না-জানে চাল চলন, না-জানে আজব শহরের কাপ্তেনী, এ কিনা আনায়াসে তিন চার ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এতগুলি টাকা আনে ? এই হেতু ললিতের অনেক কৃত্রিম বন্ধু আসিয়া জুটিল। আজ এটা, কাল ওটা, একদিন থিয়েটারে যাওয়া, পরদিন দুটো গান শুনিয়া আসা, এইরূপ করাইতে করাইতে ললিতের স্বভাবটা বিগড়াইয়া ছিল। ললিত মানবজনমের পরম ও চরম সার্থকতা লাভ করিতে শিখিল।

ইদানীং আপিস হইতে বাসায় ফেরা ললিত প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল ; তা ছাড়া তাহার শরীরটাও খারাপ হওয়াতে সে একমাসের অবসর লইয়াছিল।

সেদিন বৈকালে অত্যধিক মদ্যপানে বিভোর হইয়া ললিত বিছানায় ঢলিয়া পড়িতেছি ও মাঝে মাঝে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া এক একবার অদূরে উপবিষ্ট মুরলার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। মুরলা তখন প্রসাধনের সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু কি একটা আকস্মিক বিরক্তিতে তাহার কিছু ভাল লাগিতেছিল না। ঘাড় ফিরাইয়া একটু প্রখর করিয়া মুরলা বলিল, দিন-রাত্তির ওই ছাই-ভস্মগুলো খেতে হবে, একটা কথা বলবারও কি সময় নেই ?

সুরার ঘোরে ললিত বলিল, কে বাবা তুমি, উল্কার মত ধপ্ করে আকাশ থেকে পড়লে ?

দৃষ্টিটা আরও প্রখর করিয়া মুরলা বলিল, এখানে বসে আর তুমি মদ খেতে পাবে না।

কেন বাওয়া, তাড়িয়ে দেবে নাকি ? তুমিই ত আমায় বাঁচিয়ে রেখেছ, পিয়ারী ! গাও, গাও, একটা গান লাগাও।

ক্রুদ্ধ হইয়া মুরলা বলিল, আবার ? এ সব চাল-চলন আর আমার কাছে চল্‌বে না, বলে দিচ্ছি।

একেই ত প্রথম হইতে মুরলার আকার ইঙ্গিতে কেমন একটা গম্ভীরতা প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার উপর আবার এই তীক্ষ্ম কথাগুলি শুনিয়া ললিতের সুরাপানের মোহময় উম্মাদনার ঝোঁকটা যেন অনেকটা কাটিয়া আসিতেছিল একটু আত্ম-সংযতভাবে বলিল, কি, কি বলছ, মুরলা ?

বলছি এ রকম বেয়াদপি আর চলবে না।

মাতালের হাসি হাসিয়া ললিত বলিল, অন্য শিকার মিলেছে নাকি, বন্ধু !

এত আমি সইতে পারব না, ললিত !

ললিতের মোহ টুটিল, বলিল,—আমায় কি বলছ তুমি, মুরলা ?

একটু নরম হইয়া মুরলা বলিল, অত ক'রে মদ খেয়ে দিন দিন যে একেবারে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ, মুরলা,—আমি ত তোমায় অনেক পয়সা দিয়েছি।

মুরলা উত্তেজিত হইয়া বলিল, পয়সা?—পয়সাই কি সব? শুধু পয়সার জন্যই কি আমরা এ ব্যবসা ক'রে থাকি ?

তবে ? আজ এ সব কি বলছ, মুরলা ?

বলছি ঠিক ! যাক সে কথা, আমি একটা পরামর্শ করতে এসেছিলুম, যদি—

কিসের পরামর্শ ?

দান-পত্রের। চুপ করলে যে, রাগ করেছ ?

না, রাগ নয় মুরলা, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভাবছি কত কুহকই তোমরা জানো।

অবাক হবার কিছু নেই, ললিত।

বিভ্রান্ত হইয়া ললিত বলিয়া উঠিল, এ সবের কারণ ?

কারণ কিছু নেই। এ মানুষের একটা ইচ্ছে—রুচির পরিবর্তন।

তোমার উপায় ?

উপায় কিছু একটা হবেই।

ললিত সহসা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, তা হলে কি আমায় এখন বুঝতে হবে যে, আর আমি এখানে আসি তো তোমার ইচ্ছে নয় ?

হাঁ তাই, আমি সব জান্‌তে পেরেছি, সেদিন তোমার ছোট ভাই এসেছিল, মদের ঘোরে তুমি তাকে তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দিলে, কিন্তু আমার দয়া হল। আমি তার কাছ থেকে, তোমার সংসারের সব খবর নিলুম, কোথায় একটা অজানা পল্লীর নির্জন ঘরে বসে তোমার স্ত্রী দিনের পর দিন চোখের জল ফেল্‌ছে,—কিন্তু তুমি তার কোন খোঁজই নাও না।

এ একটা হাসির কথা মুরলা, যে সে খবর তুমি নিয়েছ।

হাসি নয়, ললিত ! এ অতি সত্য ! মেয়ে মানুষ হয়ে তা'র মন বুঝতে পারি।

ললিতের মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু এতে তোমারই অনিষ্ট।

অনিষ্ট ? না ললিত এ অনিষ্ট নয়, এ অতি সৌভাগ্য ! অন্তত জানবো, জীবনে একবারও পরের উপকার করতে পেরেছি।

আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, আসন্ন ঝটিকাভীত এক-একটা বায়স এদিক-ওদিক উড়িয়া যাইতেছিল, ট্রাম গাড়ীর ঘর্ঘরধ্বনি ঘরখানাকে কম্পিত করিয়া যাইতেছিল ; মুরলা গবাক্ষের নিকট আসিয়া বাহির আকাশের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, বিশ্বাস করতে পারবে না তুমি।—

শোন, মুরলা !

মুরলা মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, না আর আমার কিছু বলবার নেই, তুমি যাও—

বিদ্যুদ্বেগে ললিত উঠিয়া আপনার জামা কাপড় ঠিক করিয়া লইল, পরে গায়ের চাদরটা লইয়া সত্যই যখন বাহিরে যাইবে, মুরলা সহসা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আর কি আসবে না তুমি ললিত ?

আর ? না মুরলা, আর আমি আসব না।

মুরলা এক মুহূর্ত ভাবিয়া লইল। একটা কথা বলে যাও, ললিত।

ললিত বলিল, না, আমি চললুম তবে মুরলা !

মুরলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিল না, সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল।

মুরলা একবার চাহিল, শেষবার একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর নিবিড় অন্ধকার। মোটর গাড়ীর একটা শব্দ হুঙ্কার করিয়া তাহাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল। কক্ষান্তর হইতে তাহারই এক সঙ্গিনীর কলকণ্ঠ তীক্ষ্ণ বাণের মত আসিয়া তাহার কর্ণে লাগিল।

৪

বাদল-রাতের আকাশটা নিঝুম হইয়া ছিল ; টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া এক একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছিল। এ সবের দিকে ললিতের ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে দেখিতেছিল, ওই দূরে তাহার চিরপরিচিত গ্রামখানা একটা অন্ধকারের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে তাহার অতীত সুখের কত স্মৃতিই না জড়িত। দীন দরিদ্রের মত কতই না ব্যগ্র আশায় তার পথপানে চাহিয়া আছে। তাহার মধ্যে একটি গৃহের কোণে তাহারই অনাদৃত পত্নী কতদিনের অশ্রু সঞ্চিত রাখিয়া আশায় আকুল নয়নে শূন্য পানে চাহিয়া আছে।

পিচ্ছিল পথটা দক্ষিণে বাঁকিয়া গিয়া শ্মশানে মিশিয়াছে। ললিত বাঁ দিকে ফিরিল, একটা কুকুর দুই একবার চীৎকার করিয়া নিস্তব্ধ হইল ; তৃণ শষ্পের মধ্য দিয়া একটা সাপ হিল-হিল করিয়া চলিয়া গেল। দক্ষিণে বহুদূর হইতে একটা শৃগাল প্রহর-বার্তা ঘোষণা করিতেছিল। হন হন করিয়া ললিত চলিল।

বাটীর দরজায় আসিতেই ললিত চমকিয়া উঠিল, ওটা কি !

কে দাঁড়িয়ে ?

অধিকতর চমকিয়া ললিত বলিল, কে সুধীর নাকি ?

হ্যাঁ।

ওটা ওখানে কি ?

শুষ্ককণ্ঠে সুধীর বলিল, বৌ-দিদি—

সে কি ! এত ঠাণ্ডায় ? ললিতের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বাইরের ঠাণ্ডা আর তাকে স্পর্শ করবে না দাদা।

মূঢ়ের মত ললিত বলিয়া উঠিল, কেন কোথায় যাচ্ছে ?

অস্ফুট গাঢ় কণ্ঠে সুধীর বলিল, শ্মশানে—

ছবি

কমলাদীঘির নায়েব অবনী মুখুজ্যের বার-মহলে খাজনা আদায় করতে যাওয়াই কাল হল ; ফিরে এসে যখন শুনলে তার সুরূপা এবং পতিব্রতা স্ত্রী ইন্দুকে দুবছরের খোকার ব্যগ্র বাহুপাশ থেকে দস্যুরা ছিনিয়ে গেছে তখন সে কাঁপতে কাঁপতে আপনার নতুন পাকা দালানটার ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। দুনিয়াটা তার চোখের সুমুখে অন্ধকার হয়ে হাঁ করে গ্রাস করতে এল।

আগের দিন রাত্তিরে এই ঘটনা ঘটেছে। পাড়ার একজন স্ত্রীলোক ঘোরতর কান্নাকে শান্ত করবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাড়ীতে, অবনী এসেছে শুনে খোকাকে নিয়ে এল। অবনী তখন অঝোর ঝরে কাঁদছিল, খোকাকে দেখে তার কান্না আরও উদ্বেল হয়ে উঠল।

সত্য সরকার, গিরীশ গরাই, বলরাম বাউরী প্রভৃতি পড়শীরা অনেক সান্ত্বনা এবং সহানুভূতি জানিয়ে শেষে বললে, কি আর করবে হে অবনী আমরা কাল সমস্ত রাত্তিরই ভেবে দেখলুম, আপাতত তোমার করবার আর কিছুই নেই—আহা বউ ত নয় লক্ষ্মী, যেমনি রূপ তেমনি স্বাস্থ্যের গড়ন, তারই সুনজরে তুমি দু'বছরের নায়েবীতে কোঠা তুললে, কিন্তু ভগবান তোমার এ সুখটুকুও সইতে পারলেন না—

ব'সে বার দুই চোখ রগড়ালে—

একপাশ থেকে ঘনশ্যাম বললে, এই ঠাকুর ঘরটি বুঝি মা লক্ষ্মীর জন্যে তৈরী করিয়েছিলে অবনী ? আহা বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে। মায়ের পায়ের দাগগুলোও মুছে যায়নি দালান থেকে—

তরঙ্গিনীর বোনঝি বললে, বউটার রাশভারী ছিল খুব, সরকার বাবু—চুপ কর বাপু ঘ্যানঘেনে ছেলে, বাপের দুঃখটা বুঝলিনে—

খোকা এ ঝঙ্কারে আরও কেঁদে উঠল, অবনী তাকে কোলে নিয়ে আদর করার ছলে এঘর সেঘর বেড়িয়ে তার শেষ সন্দেহটুকু মিটিয়ে নিল।

চার দিন পরে অপরাহ্ণ বেলায় গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল,—'চোরা বউ ফিরে এসেছে। অবনী তখন চালে ডালে সিদ্ধ করছিল—কাঠের ধোঁয়ায় তার চোখ রক্তবর্ণ। খবর শুনে কি করবে কিছু ঠিক করতে পারছে না। কিন্তু পরক্ষণেই দশহস্তীর বলে ঘুমন্ত ছেলেটাকে তুলে নিয়ে উন্মাদের মত দৌড়ে গেল রাস্তায়।

গাছ তলায় ধূলিমলিন দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে ইন্দু বসে কাঁদছিল। মাথার রুক্ষ চুলগুলো তার পরিষ্কার মুখখানিকে ঢেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল অসংখ্য সাপের ফণার মত। আশে পাশে পঁচিশ ত্রিশ জন স্ত্রীপুরুষ দাঁড়িয়ে জটলা করছিল এবং দস্যুর ওপর তাদের ক্রোধ কতখানি যে হয়েছিল তা তারা জানিয়ে দিচ্ছিল এই

নির্যাতিতা অভাগীর হেঁট মুণ্ডের ওপর অজস্র বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রে—পোড়ার মুখি টুঁ শব্দটি করলি নে? হাজার খানা দা কুড়ুল নিয়ে আমরা এক লহমায় হাজির হতুম।

তুই এ গ্রামের নাম ডোবালি, আমাদেরও নাম ডুবিয়ে দিলি—

তোর মুখ দেখলে চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়—

দূর হ অভাগী এখান থেকে, ও কালামুখ আর দেখাসনে—

তরঙ্গিণীর বোনঝি নাক সিঁটকে বললে, শতেক খোয়ারির রূপের আবার কত দেমাক ছিল—

বলরাম বাউরি বললে, কিন্তু তোমার বাছা সাহস করে আর এখানে আসা উচিত হয়নি, যাও রাত হল আবার পথ চিনে কোথাও যেতে হবে ত?

বিস্রস্ত চুলের রাশি সরিয়ে চোখ মুখ তুলে ইন্দু বললে, আমার স্বামী?

উপস্থিত সকলে হো হো করে হেসে উঠল। বাউরী বললে, পাগলি কোথাকার,—তার সঙ্গে দেখা করার বিধি কি আর শাস্ত্রে আছে?

ইন্দুর শেষ আশা নির্মূল হতে চললো—সকলের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বুকের রুদ্ধ অশ্রুর দ্বার খুলে দিয়ে বললে, আমায় রক্ষে করুন, দয়া করুন, আমার কোনো দোষ নেই, কোনও উপায় নেই আমার, আমায় পায়ে ঠেলবেন না—

—তা হয় না বাছা—

একজন বললে, যাওনা বাপু কত মেয়েমানুষ ত আপনার হিল্লে করে নেয়—যাও চোখের জল ফেলে গ্রামের অমঙ্গল কর না—

অস্ফুটে কেঁদে ইন্দু বললে, দয়া করুন, আমায় বাড়ীতে যেতে দিন, নৈলে আমার কোথাও ঠাঁই নেই—

—না, তা পারব না, শাস্ত্রের বিধি আছে, উপরে ভগবান্ আছেন, ধর্ম্ম আছে—

বিবর্ণমুখে ইন্দু বললে, আপনারা মহৎ ব্যক্তি, দয়া করুন আমাকে।

অকস্মাৎ উন্মাদের মত অবনী ছেলেকে কোলে নিয়ে ভিড় ঠেলে ঢুকল--ইন্দু—ইন্দু—

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ইন্দু—কেন এলে তুমি। খোকাকে কেন নিয়ে এলে—খুকু, আমার খুকু,--বলে সে ব্যগ্র বাহুলতা বাড়িয়ে দিলে অবনীর দিকে, তার চার দিনের অদেখা খোকাকে কোলে নেবে বলে—

সর্ব্বনাশ হয় দেখে গিরীশ গরাই ছুটে এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললে, দাঁড়াও হে অবনী, অত উতলা হয়োনা, আমাদের দিকটা দেখা চাই ত, আমরা এখানে উপস্থিত থাকতে এ কাণ্ড হলে আমাদেরও যে একঘরে হতে হবে, কি বল কেদার খুড়ো?

—বটেই ত—

—তাই, বলি কি, অস্পৃশ্যাকে নিয়ে ঘর করাটা ত—

ইন্দুর চোখ দুখো জ্বলে উঠেই আবার ছাই হয়ে গেল। অবনী বললে, অস্পৃশ্যা কি ও যে ইন্দু, আমার স্ত্রী, কি বলছ গিরীশ?

—হেঁ হেঁ, চল মাথা ঠাণ্ডা করবে চল, ওহে ঘনশ্যাম, এসো-না এদিকে। সকলে ধরে বেঁধে অবনীকে ফিরিয়ে নিয়ে চললো।

ইন্দু দৌড়ে গিয়ে তাদের পায়ের কাছে পড়ে বললে, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, খুকুকে একবার কোলে দাও—একবার, দাও—

বাতাসে তার কান্না ভেসে গেল। অবনীর আর্ত্তস্বরটাও তারা নিজেদের গণ্ডগোলে চাপা দিলে।

সন্ধ্যার ধূসর আবরণটা তখন বনের পথে, লুটিয়ে পড়ছিল…

২

তিন বছর পরে।

দুপুর বেলা। ইন্দু এখন এ জেলার বড় ইস্কুল মাস্টারনী। সেদিন রবিবার, কোথাও বার হয়নি সে। ঘরে বসে কিছুক্ষণ আগে একটা রেশমী কাপড়ের ওপর ফুল তুলতে তুলতে তন্দ্রা এসেছিল। গালের ওপর বেয়ে পড়া চোখের ধারাটি শুকিয়ে উঠেছিল, জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে-পড়া মৃদু বাতাসের দোলনায়—

বাইরের গোলমালে আতঙ্কে তন্দ্রা ভেঙ্গে যেতে সে উঠে বসল। চোখ মুছে বাইরে আসতেই গিরিশ গরাই চোখ পাকিয়ে বললে, এ সব তোমার কেমন ব্যাপার বাছা—বেহ্ম মাগীদের মত মাষ্টারী করে ত ছেলে-মেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছে, তারপর দর্জিবৃত্তি করে পাশাপাশি চার পাঁচ খানা গ্রাম ছেয়ে ফেললে; তুমি নিজের আখের ত পায়ে থেঁৎলে এসেছ, মনের দুঃখে ছোঁড়া বিবাগী হতে বসল, কিন্তু লেসসেমিজ বুনে এমন করে ঘরে ঘরে বৌ-ঝিদের মাথা খাচ্ছ কোন হিসাবে? এতে তোমার ভাল হবে, না ধর্ম্মে ছাড়বে?

মাথা হেঁট করে রইল ইন্দু; স্বামীর ছন্নছাড়া জীবনটা তপ্ত শেলের মত তাকে যাতনা দিতে লাগল।

ঘনশ্যাম বললে, তুমি হতভাগিনী জানতুম, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি তুমি অসচ্চরিত্র—

কেদার বললে, তোমার দিক দেখলেই ত চলবে না আমাদের, গ্রামের উন্নতিও দেখতে হবে, কি বল হে—বলরাম?

—বটে—বটে—

গিরীশ বললে, কোন রকমেই আর তোমার এখানে থাকা চলতে পারে না, এ জেলা থেকে তোমায় যেতে হবে—

টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়ল ইন্দুর গাল বেয়ে, ধরা গলায় সে বললে, এতে যদি অনিষ্ট হয়ে থাকে তবে মাপ করুন আমাকে, কোনো উপায়ই আমি দেখিনি তাই জন্যেই—

—তা ত জানি, তা ত জানি বাছা তোমার মত লক্ষ্মী বউ আমাদের গ্রামে আর কেউ ছিল না, তবে কি জান লোকে আমাদেরই দোষী ঠাওরায়, হিন্দুসমাজের আবার এই কেমন একটু কড়াকড়ি আছে কি না, জান ত বাছা—?

একজন বললে খিষ্টানী ধরণটা আমাদের সমাজে খাটে না জান ত? ধর্ম্মের ঘরে পাপ সয়না, তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি এই চারখানা গ্রাম মায় জেলাসুদ্ধ লোক দুমুখে তোমার সুখ্যাতি করছে—কুলটা পতিতার এত সুখ্যাত হওয়া কি সমাজের পক্ষে হিতকর? ঘরের ঝি বউয়ের মন বিগড়ে যেতে পারে ত?

ঘাড়টা তুলে ইন্দু একবার সোজা হয়ে দাঁড়াল কিন্তু পরমুহূর্তেই বিবর্ণ মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, কি করব আমারই দোষ হয়েছে, আপনারা দয়া করে ব্যবস্থা দিন—

—তোমাকে এখান থেকে ত চলে যেতে হয় কোথাও—

—তা হলে আপনারা কি আমায় মাপ করবেন?

—তা দেখা যাবে, তুমি তৈরী হয়ে নাও—

একবার চীৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হল ইন্দুর—কিন্তু সবলে দুহাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে সে ভেতরে চলে গেল।

দুটো লোক দিয়ে জিনিসপত্তর বার করবার চেষ্টা করতেই গিরিশ বললে, অমন কাজ কর না লক্ষ্মী, তুমি ত যাচ্ছই ও দুটো লোককে কেন মজিয়ে যাও, তোমার জিনিস বয়ে নিয়ে গেলে ওদের কি সমাজে ঠাঁই দেবে আর?—যা পালা, মামদো বেটারা—

তারা চলে গেল।

এত সহজে কাজ উদ্ধার হবে তা মাতব্বরেরা ভাবেনি তবুও সন্দেহ মেটাবার জন্যে পরস্পর বললে, চল ইস্টিশানে ছুঁড়িকে তুলে দিয়ে আসি, নইলে বুঝতে পেরেছ ত? বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য স্ত্রীষু—

তারাও চলতে লাগল।

অবনীর কানে এ খবরটা পেঁছিতে বিলম্ব হল না, সে ছেলেটার হাত ধরে রাস্তা দিয়ে হন হন করে চলতে লাগল, ইন্দুকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্যে। অপরাহ্ন বেলা। এ রাস্তা সে রাস্তা কোথাও অবনী কা'কেও দেখতে পেলে না। হতাশ হয়ে চলতে চলতে স্টেশনের কাছে এসে পড়ল। পাঁচ বছরের ছেলেটা নেতিয়ে পড়েছিল পথ হেঁটে। অবনী বললে, চল খোকা বাড়ী যাই, তারা নেই—

—কে বাবা?

—কেউ না, চল—

—না বাবা না, আমি রেল দেখব—

—তাই চল—চোখদুটো অবনীর থম থম করছিল। সে অনেক আশা করে এতখানি পথ এসেছিল। স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। আকুল দৃষ্টিতেই সে চিনতে পারলে। দৃপ্তা অভিমানিনী অথচ একান্ত সহায়হীন সে কি করুণ দৃষ্টি। সুখ-দুঃখ কিছু নেই সে মূর্তিতে—স্পন্দনহীন নির্ব্বিকার।

অবনী ছুটে গিয়ে বললে, ইন্দু ও ইন্দু—?

চমকে মুখ ফেরালে ইন্দু, তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, এসেছ? তুমি আগেই জানতুম—

কোন স্রোতে তুমি ভেসে চললে ইন্দু ? তোমার দয়া মায়া কি নেই ?

সে চুপ করে রইল। অবনী হাত ধরে আবার বললে, তোমার বলবার আর কিছু নেই ইন্দু ?

—এই বল যেন তোমায় আবার পাই—

—চল ইন্দু চল, যেদিকে দুচোখ যায় আমরা চলে যাই—বলতে বলতে অবনী কেঁদে উঠল।

ইন্দু তেমনি ভাবেই বললে, না তা পার না, সমাজ, স্বদেশ আর খোকার ভবিষ্যতকে তুমি নষ্ট করতে পার না—

খোকা মুখ তুলে বললে, এ কে বাবা ?

—আমি ? বলে ইন্দু খোকাকে কোলে তুলে তার মুখখানা তার বুকের ভেতর নিয়ে অজস্র চুম্বন করে বললে, আমি কে বলত রে খোকা—বলত, বলত তোর আধো আধো কথাটি যাবার সময় এক বার শুনে যাই—বলত ? ঝর ঝর করে তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল।

দুহাতে মুখ ঢেকে অবনী বললে, তোমার বুড়ো মা সেখানে আছে—

তাই ত যাচ্ছি আমি তোমার মনের কথা যে জানতে পেরেছিলুম—কিন্তু আমার অনুরোধ আর একটি বিয়ে করে সংসারী হও, নৈলে খুকুর কষ্ট হবে—তবে যাই খুকু ?

ওপারের মাতব্বরেরা হঠাৎ এ ব্যাপার দেখে হাঁ হাঁ করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললে, এসব কি বেহায়াপনা তোমার অবনী ? আমাদের নামটাও ডোবাতে চাও ? দশের মাঝখানে এ ছেলেকে নিয়ে সোহাগ করছ ?—ওঠোনা বাছা গাড়ীতে, ছোঁড়াকে যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে ?

ভয়ে ভয়ে ইন্দু গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসল। গাড়ীখানা তারপর প্লাটফরম ছেড়ে ছুটে চললো। অবনীর চেতনাহীন মর্মস্থলটাকে পিষে দিয়ে।

রাস্তায় যেতে যেতে চোখ মুছে খোকা বললে, ও কে বাবা ?

অবনী ধরাগলায় বললে, তোর মা—

—মা ?

হুঁ—চল দাঁড়াসনে—সন্ধ্যে হয়ে এল।

উৎসব

গরুই নদীর শাখার নাম কাজুড়ি। শীত ও গ্রীষ্মে তার শুষ্ক বুক ধু ধু করে। বর্ষায় বান ডাকে। আশেপাশের ক্ষেত খামার ভাসাইয়া দিয়া যায়।

তার দক্ষিণ তীরে একখানি ছোট গ্রাম কৈলাস।

শ্রীপতি সেই গ্রামেই বাস করে। তার সম্বলের মধ্যে একখানা খড়ের ছাউনি ঘর ও একটা পঙ্কিল ডোবা—আর সামান্য কিছু জমি এবং সংসারে রুগ্ন পত্নী ও ছ বছরের মুমূর্ষু ছেলেটা।

ছেলের দিকে চাহিয়া নারাণী বলে, কি হবে গো?

শ্রীপতি মুখ ফিরায়, বলে কোনও উপায় নেই—

এমনি ক'রে মরতে বসল, কার মুখ চেয়ে থাকব? ওই একটিই ত—

তাই রক্ষে, বলিয়া শ্রীপতি সরিয়া যায়।

নারাণী কাঁদে না। রুগ্ন দেহে কাঁদিলে দম আটকায়। বলে, বস্তির বাড়ী একবার যাবে?

নারাণী এদিক ওদিক চাহিয়া বলে, চারটি চাল দিলে ওষুধ দেয় না?

শ্রীপতি হাসে—সে হাসি দেখিলে কান্না পায়, ভয়ও হয়। হাসিয়া বলে, চালই বা কোথায় যে দেবে নারাণী? উপোসটা কি অসুখের জন্যেই?

নারাণী লজ্জায় সরিয়া যায়।

জমিদারের গোমস্তা আগড় ঠেলিয়া ভিতরে আসে। দেখিয়া শ্রীপতির রক্ত শুকায়, বলে এমন সময় ছোট বাবু?

কাজ আছে হে, অকাজে কি এসেছি? তুমি ত একবার চোখের দেখাও দিয়ে আসতে পার না। বলি বাঘ না ভাল্লুক?

শ্রীপতি বলে, তার জন্যে নয় ছোট বাবু, পয়সা কড়ি না হলে—

কান্তিবাবু বলে, পয়সা কড়ি নেই তা যেন বুঝলুম কিন্তু গাঁয়ে লাখপতিও কেউ নেই ছিপতি, যে তোমার টাকা কটা না হলে তাদের চলে যাবে—

আজ্ঞে, আপনারা দয়া না করলে কে করবে?

কান্তিবাবু হো হো করিয়া হাসে, বলে, দয়া! পেটে খেয়ে ত জমিদার তোমায় দয়া করবে। নৈলে দয়া আসবে কোথা থেকে—যাক তোমার হিসেবটা এখন করে দাও—আবার দুএক ঘরে যেতে হবে ত—

শ্রীপতি দাঁড়াইয়া থাকে।—কান্তিবাবু রাগিয়া বলে, কি, হাঁ করে রইলে যে? হিসেবটা কর?

মাথা হেঁট করিয়া শ্রীপতি বলে, ওর আর কি হিসেব করব—দু'সনের দশটাকা ক'আনাই হয়—কিন্তু—

কিন্তু কি ?

হাতে ত নেই—এখন সুবিধে হচ্ছে না—

সুবিধে হচ্ছে না! কি কথাই বললে? এতক্ষণ ভ্যান ভ্যান করে বকিয়ে শেষে এই কথা!—এই সব পেজোমিতেই ত ভগবান তোমাদের এমনি করে রেখেছেন—

শ্রীপতি কিছু বলে না, চুপ করিয়া থাকে। কান্তিবাবু পুনরায় বলে, কিন্তু এটা তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি শ্রীপতি, আজই তোমার দেবার শেষ তারিখ ছিল, তুমি দিলে না। জমিদার বাবু লোক সুবিধে নন তাঁর কানে এ কথা উঠলে কি করবেন তা জানিনি—বলিয়া সে চলিয়া যায়।

নারাণী বলে, ছোট বাবুর কথার মানে বুঝলে ত ?

বুঝে কি করব ?

আদায় ওরা করবেই—

শ্রীপতি হাসে, বলে—কি আর আছে? এই রক্ত মাংসের দেহটা, এ ছাড়া ত কিছু নেই—এটা নিলেও বাঁচতুম নারাণী—তাও না—

খাইতে বসিয়া শ্রীপতি বলে, আমায় ভাত দিলে—তোমার কই নারাণী ?

নারাণী বলে, আমার সকাল থেকে জ্বর—

খাবার সময়ই জ্বর, এর আগে হয় নি ত। আর কিছু নেই বুঝি ?

রুগ্ন ছেলেটা কাঁদে। লোলুপ দৃষ্টিতে ভাতের দিকে চাহিয়া বলে, ওই ভাত দে মা—তোর পায়ে পড়ি—দে—

স্বল্প অন্ধকারে শ্রীপতি ছেলেটার দিকে চায়। অসহ্য ক্ষুধার কাতরতার সে কদাকার বিকৃত মুখখানা দেখিয়া শিহরিয়া উঠে।

ছেলেটা আবার কাঁদে, দাও বাবা—ওই গরাসটা ওইটুকু, আর চাইব না—ওই ফ্যানটুকু, তোমার পায়ে পড়ি—

চোখ বুজিয়া শ্রীপতি ছেলের মুখে ভাত তুলিয়া দেয়। ছেলেটা ইতর জন্তুর মত গো-গ্রাসে গেলে। তারপর নিঝুম হইয়া পড়ে।

সেদিন রাতে নারাণী বলিল, খোকার ভাতের সময়কার ছোট হারটি—মনে আছে ?

হুঁ—

তাই বেঁচে বদ্যির ওষুধ এনে দাও—

সেটা যে ভাঙ্গতে নেই নারাণী!—

নারাণী ব্যস্ত হইয়া বলিল, ও বাঁচলে আবার কত হবে, এখন ভাল হ'য়ে উঠুক ত—

বেশ—

আজই যাবে ?

আজ গেলে ত পাবনা, সন্ধ্যের পর কেউ টাকা দেবে না!

সুমুখের প্রকাণ্ড মাঠটা প্লাবনে বিধ্বস্ত। হাঁটু অবধি কাদা। তাহাই ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। শ্রীপতি তাড়াতাড়ি যাইতেছিল।

পিছন হইতে শব্দ আসিল, নজরে পড়ে না নাকি ?

শ্রীপতি ফিরিয়া দেখিল, বলিল, ছোটবাবু প্রণাম হই। ছেলেটার বাড়াবাড়ি তাই ওষুধ আনতে—

অসুখ ত আছেই গো কিন্তু খড়ের ছাউনির খাজনা খতম করে কেন? জমিদার কি ভাল মানুষ?

শ্রীপতি চুপ করিয়া রহিল। কান্তিবাবু পুনরায় বলিল, আজ একবার তোমার জমিদার বাবুর কাছে যেতে হবে, এক্ষুণি—

শ্রীপতি বিনয় করিয়া বলিল, ছেলেটাকে একটু ওষুধ না দিয়ে কি করে যাই ছোটবাবু? তা ছাড়া গিয়েই বা কি গর্ব, এখন ত হাতে কিছু নেই—

আমি তার কি বলব। কিন্তু ডেকেছেন যখন তখন যাওয়াই বুদ্ধির কাজ। লোক ত সুবিধের নন, তা ত জানই। কি করবে?

চলুন তবে, বলিয়া শ্রীপতি অগ্রসর হইয়া চলিল।

সদর বৈঠকখানায় কর্তাদের মজলিস বসিয়াছিল। কান্তিবাবু তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, এদের জ্বালায় আমি ত আর পারিনে বাবু, হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। পাওনা গণ্ডা দেবার নাম নেই—

বৈঠকখানায় রসচর্চা হইতেছিল। রসভঙ্গ হওয়াতে বাবু চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, কান ধরে বেটাকে আমার কাছে নিয়ে এলেনা কেন।

এ অধীন তাই করেছে বাবু—

বাবু বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, তোমার ব্যাপার কি ছিপতি, জমিদার বলেও কি সরম নেই?

শ্রীপতি হেঁট হইয়া বলিল, আপনি মা বাপ অমন কথা বলবেন না।

ও কথার কথা। ওসব ছেড়ে দাও। বলি আমার দশটা টাকা কি তোমার হাতের তলা দিয়ে গলতে দেবে না। দুবারের ফসলের টাকাও বেমালুম গাপ করলে—

শ্রীপতি মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, একথা কে বললে বাবু?

আগুন কি চাপা থাকে ছিপতি, তা থাকে না, ও'ই কান্তিই ত দাঁড়িয়ে রয়েছে, ও ত আর আমায় মিথ্যে বলবে না?

উত্তরে শ্রীপতি কান্তিবাবুর মুখের দিকে নিমেষমাত্র চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, এ খবর সত্যি নয় বাবু, ভগবান জানেন—

কান্তিবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ভগবান! এদেশে ভগবানের হাত নেই শ্রীপতি, এ তাঁর রাজত্বের বাইরে, বলিতে বলিতে আবার উষ্ণ হইয়া হইয়া বলিলেন, তুমি কি কিছুই করনি? আগের ফসল বেচে তুমি যে ঘরের চাল তুললে, ওলাইচণ্ডীর চাঁদা দিলে, ডোবা কাটালে এ সব কি মিথ্যে খবর ছিপতি? আমায় বাবুর সামনে মিথ্যেবাদী বল তুমি—বাবু দেবতা—তিনি কারো কান-ভাঙ্গানী শোনেন না—

বাবু বলিলেন, ঘরের চাল তুলতে কত খরচ পড়েছিল ছিপতি? না তা নয়, এখন বেচলে কত উঠতে পারে?

শ্রীপতির বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, তা কি করে জানব বাবু ? ওটুকু বেচবার কথা ত ভাবিনি, আমায় ছেলেটি বড় হয়ে—

কান্তিবাবু ধমক দিয়া বলিল, বাবুত তোমায় সে কথা জিজ্ঞেস করেন নি। বেচলে কত হতে পারে তাই বলচেন।

শ্রীপতি বলিল, খরচ পড়েছিল দুকুড়ি টাকা—

বাবু বললেন, তা হবে বৈ কি, মাগ্গির বাজার। আমার ছোট মহল্লায় নতুন ধাওড়া দেখছ ছি

আজ্ঞে হাঁ—

ওইটে শেষ হলে তোমাদের থাকবার জায়গা করে দেবো। ফসলের জন্যেই ওটা হয়েছিল কিন্তু এখন বে মতলব আর নেই। তবে একটা কথা—

শ্রীপতি মুখ তুলিল।

কান্তিবাবু বলিল, আমিই বলচি, বাবুর আমার শরীরটা একটু অসুস্থ আছে। আপাততঃ তোমার ঘরখানা ছেড়ে দিতে হবে, কেন না সরকারে টাকা আমাদের এ মাসে জমা দিতেই হবে, যে উপায়েই হ'ক।

শ্রীপতি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, সে কি কথা বাবু, ছেলে বউ নিয়ে তবে দাঁড়াব কোথা ?

বাবু বলিলেন, তোমার মনটাই ভাল নয়, ছিপতি। কার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়, তা শেখোনি। ওই কথা পাছে শুনতে হবে বলেই আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে আগে থাকতে ধাওড়া করে দিচ্ছি।

কান্তিবাবু বলিল, দুর্ভাগ্য, আপনার দুর্ভাগ্য। নৈলে এমন প্রজাই বা আপনাকে চরাতে হবে কেন। তা বেশ ওই কথাই রইল ছিপতি। ঘরখানা তোমার খালি করে দিও। তারপর বাবুর চালা তৈরী হলেই সেখানে রাজার হালে থাকতে পারবে, বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিল, এ কষ্টটুকুও তোমার করতে হত না, যদি তুমি দশটা টাকার মায়া ছাড়তে—যাক তা যখন হবার নয়, আর আমাদের টাকার এত আবশ্যক তখন ওই কথাই রইল—আসুন বাবু আপনার আবার ঠিক সময় স্নানাহার না হলে অম্বলের ব্যামো বাড়বে, বলিয়া সে সরিয়া গেল।

বাবু আর একবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আর একটা কথা বলছিলুম ছিপতি—আমার নাতির অন্নপ্রাশন, তা শুনেছ বোধ হয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কালকেই ত হবে—

—সেই কথাই বলছিলুম। এ গাঁয়ের সকলেই সাধ্যমত যা হোক কিছু যৌতুক দিয়েছে। কেবল তুমিই দেখছি আমার মানহানি করবে—

শ্রীপতি বলিল, আপনাকে দেবার মতন আমার কি আছে বাবু ?

তাহার চোখে জল আসিতেছিল।

—দেবার ইচ্ছে থাকলেই দেওয়া যায় ছিপতি। সাত দেবতার দোর ধ'রে নাতিটি হল, তুমিই বা কোন মুখে ছেলের বাপ হয়ে চুপ করে আছ ?

অন্তরাল হইতে সরিয়া আসিয়া কান্তিবাবু বলিল, পয়সার অহঙ্কার বেশী দিন থাকে না, ছিপতি। আজ যে রাজা কাল সে ভিখিরী। জমিদার বংশের ছেলেটি হল আর তুমি সিন্দুক বন্ধ করে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলে। আমাদের নেই, তাই বাবু মাপ করলেন—থাকলে আমরাও চুপ করে রইতুম না।

শ্রীপতি মুখ তুলিল না।

বাবু বলিলেন, সকলের সঙ্গে তোমার যখন ডাক পড়বে, তখন লজ্জায় আমি মুখ তুলতেই পারব না, বাইরের শত্রুরা মুখ টিপে হাসবে—

কান্তিবাবু বলিল, তাই ত,—সকলেই বলবে একটা চাষার ছেলে হয়ে ছিপতি বাবুকে অপমান করলে, তা হলে আপনিই কি আর বাইরে মুখ দেখাতে পারবেন বাবু?

শ্রীপতি মুখ তুলিল। তারপর গলা ঝাড়িয়া বলিল, ছোটবাবু মন্দ বলেন নি—বেশ, আপনার অপমান যাতে হয় এমন কাজ কর্তে পারব না বাবু। এই ক্ষুদ্র কুড়োটুকু যা আমার ছিল দিয়ে গেলুম। আমার দাদাভায়ের গলায় পরিয়ে দেবেন—বলিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে তাহারই ছেলের অন্নপ্রাশনের ছোট্ট হারটি বাহির করিয়া বাবুর পায়ের কাছে রাখিল। পরে বলিল, আশ্চর্য হবেন না ছোটবাবু, আমরা ছোটলোক হলেও বাবুর মান অপমান বুঝি—আচ্ছা আজ তবে আসি বাবু, বলিয়া উভয়ের পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া সে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

কান্তিবাবু হারটি তুলিয়া হাসিমুখে বলিল, দেখলেন ত বাবু—এক কথায় যে হারছড়া দিয়ে যেতে পারে, তার সিন্দুক ত কুবেরের ভাঁড়ার। তা সে যাই হোক বাবু, আপনার এবারকার দায় কিন্তু এদের পয়সাতেই উদ্ধার হয়ে যাবে, বাবু বলিলেন, তুমি ঠিক বুঝতে পাল্লেনা, কিন্তু ছিপতি তোমায় অপমান করেই গেল—

কান্তিবাবু—হিহি করিয়া হাসিল, বলিল, বুঝতে কি আর পারিনি বাবু—সব বুঝেছি, কিন্তু আমি বলে রাখছি, দেখে নেবেন—কাল মাগ-ছেলে নিয়ে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াবে তখন ও বিষয়টুকুও আর থাকবে না। আজ তবে আসি বাবু, বলিয়া একটু একটু হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

*　　　*　　　*　　　*

সারাদিন শ্রীপতি ঘরে ফিরিল না। কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিল। অন্ধকারে যখন রাস্তাও আর ঠাহর হইল না, তখন আস্তে আস্তে আগড় সরাইয়া উঠানে আসিয়া ডাকিল, নারাণী?

ভিতর হইতে নারাণী বলিল, যাই—

আলোকে নারাণীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীপতি বলিল, খোকা ত ভাত খেয়ে একটু ভালই আছে নারাণী?

ভগ্নকণ্ঠে নারাণী বলিল, দেখবে চল।

শ্রীপতি বলিল, আর কি সাড়াও দিচ্ছে না?

—না, ওষুধটা খাইয়ে দাও—

—ওষুধ, শ্রীপতির বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, বলিল, ওষুধ ত নেই নারাণী? সে হারটা বাবুর নাতির ভাতে যৌতুক দিয়ে এলুম—

—কি বললে?

শ্রীপতি বলিল, আমরা পেরজা হয়ে বাবুর অপমান ত সইতে পারিনি—তাই দিয়ে এলুম।

নারাণী আস্তে আস্তে বলিল, ছেলে ত সকলেরই সমান—তাদের একটু মায়াও হল না?

—জমিদারী কর্তে গেলে যে দয়মায়া ত্যাগ কর্তে হয় নারাণী!

নারাণী বাহিরে আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, তারপর মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিয়া বলিল, ভগবান, তুমি সব জানো। তোমার কাছে কেউ তফাৎ নয়—তুমি দেখো—

ভোরের আলো ফুটিবার পূর্বেই ছেলেটা মরিয়া গেল।

শ্রীপতি কুড়াল খানা লইয়া বাহিরে আসিল এবং যে গাছটার শুকনো গুঁড়িটার উপর ছেলেটা খেলা করিতে করিতে চড়িয়া বসিত, সেইটাই চেলা করিয়া কাটিয়া কাঠ জড়ো করিল। পরে ডোবাটার ওধারে একটি ছোট্ট চিতা প্রস্তুত করিয়া শবদেহটাকে তাহাতে তুলিয়া দিল।

একটু পরে আগড় সরাইয়া কান্তিবাবু বলিল, কখন মারা গেল ছিপতি?

—খানিক আগে ছোট বাবু—

—আহা ছেলেটি বড় ভাল ছিল। কেমন নেচে কুঁদে বেড়াত। ঐ গাছটিতে যখন তখন চড়ে ব'সে—ওকি গাছটির কি হল ছপতি—

—কেটেছি ছোটবাবু, তাইতে চুলো করিছি।

ভাল করনি ছিপতি, বাস্তুবৃক্ষ। ওই ত লক্ষ্মী, ও গাছ কেটে জমিদারেরই বেশী অমঙ্গল করেল। এ পাপ ত অমনি যাবে না। এতে গাঁয়ের পতন নিশ্চয়—তোমার, আমার, জমিদারের, সকলের পতন—

শ্রীপতি নীরবে চোখ মুছিতে লাগিল।

আড়চোখে চাহিয়া কান্তিবাবু পুনরায় বলিল, কেঁদোনো—কাঁদলে ত আর ফিরে পাবার নয়, গাছের সব ফল কি থাকে বাপু, একটা নষ্ট হয়েও যায়।

ভগ্নস্বরে শ্রীপতি বলিল, আমার যে সব গেল ছোটবাবু।

—চুপ কর, চুপ কর—চোখের জল ফেলো না। আজ এ গাঁয়ের এত বড় একটি শুভ অন্নপ্রাশনের উৎসব; শহর থেকে ভাল ভাল বাইজি এসেছে, তাদের নাচ গান—এত বড় একটা ভোজ, এতে চোখের জল ফেলে বিঘ্ন ঘটিয়োনা ছিপতি—বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিল, বাস্তুবৃক্ষ নষ্ট করে যে পাপ করলে—এ তো খণ্ডাবার নয়—কি করবে ছিপতি?

—অপরাধ হয়েছে ছোটবাবু—

—সে ত বটেই কিন্তু ও কথা বললে কি বাবু শুনবেন, না শাস্ত্রই তোমায় রেহাই দেবে ?

—আজ্ঞে করুন, কি করব, আপনি ব্রাহ্মণ।

—করবার ত কিছুই দেখতে পাইনি—কেবল একটি উপায় ঠাওরাতে পারি। কোনও প্রত্যক্ষবর্শী ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ, বস্ত্র, নৈবেদ্য আর দক্ষিণা দিলে এ পাপের কিঞ্চিত লাঘব হতে পারে—সেজন্যে তোমায় একটি যাগ্ করতে হবে—

শ্রীপতি চুপ করিয়া রহিল।

কান্তিবাবু আবার বলিল, মুখ বুজে থাকলে হবে না ছিপতি—এ প্রাচিত্তির তোমায় করতে হবে। জমিদারের অপমান যখন সইতে পার না, তখন তাঁর অধঃপতনই বা কোন্ প্রাণে সহ্য করবে ? ওরে বাবা, বাস্তু বৃক্ষ ! হে ভগবান, তুমি এ পাতকীকে ক্ষমা ক'র—কি সর্বনাশ !

সে চলিয়া গেল।

* * *

শীতের বেলা পড়িয়া আসিল। অদূরে শুভ উৎসবের বাজনা শুনা যাইতেছিল।

শ্রীপতি ডাকিল, নারাণী? সাড়া নাই। আবার ডাকিল। তারপর গভীর স্নেহে নারাণীর হাত দুইটি ধরিয়া বাহিরে আসিল। ডোবাতে স্নান করাইল,—নিজেও করিল। নারাণী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, বসতে যে পাচ্ছিনি—ঘরে চল। বলিয়া সে সেইখানে শুইয়া পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে শ্রীপতি বলিল, ঘর ত আর নেই নারাণী—সব গেছে—তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা যাক, এ পোড়া গাঁয়ে আর থাকব না—চল আজই আমরা চলে যাই। শহরে গিয়ে খেটে খাব—বলিয়া সে নারাণীর হাত ধরিয়া তুলিল।

চিতাটা তখনও অল্প অল্প জ্বলিতে ছিল।

নারাণী বলিল, ওটাতে জল দিয়ে যাও—

—না জ্বলুক—সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হক—চল—

—সঙ্গে কিছু নেবে না ?

শ্রীপতি বলিল, না সব থাক, ছোটবাবু প্রাশ্চিত্তির করবে—ওসব তার দক্ষিণে—চল—

* * *

অনেকদূর গিয়া নারাণী বলিল, পারিনা যে. আর কতদূর—রাত যে অনেক হল ?

শ্রীপতি বলিল, ময়নাবতীর মাঠ ছ'কোশ—তারপর ফাঁড়ি—সেখানে জিজ্ঞেস করলে রাস্তা ঠিক পাব—চল লক্ষ্মীটি।

আলেয়া

পড়ো জমিটার ধারে একতলা বাড়ীখানা—তারের জাল দিয়ে ঘেরা কাক-কোকিল ঢুকিবার উপায় নাই। রাস্তার সমতা থেকে নীচু, সুতরাং বৃষ্টি হইলে ভিতরে জল জমে। লোকগুলো মাছের মত ভাসিয়া বেড়ায়।

লোকে বলে, বাড়ী নয় ত খাঁচা। আরও কত কি বলে।

দিন-রাত ভিতরে হরিনাম হয়। চীৎকারে কান ঝালাপালা করে। কানাঘুষা হয়, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

পাশের বাড়ীতে যে মেয়েটার সেদিন বিবাহ হইয়াছে সে ইহার মেয়েও আরও কি একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল।

বৈষ্ণবী সে কথার উত্তর দেয় নাই—কিই বা দিবে! কেবল বলিয়াছিল, রাগ কর কেন ভাই, বামুনেরা ত নাস্তিক নয়!

মেয়েটা ছাদের পাঁচিলে একটুখানি মুখ বাড়াইয়া বলে, তোমার সাধ আহ্লাদ কিছু নেই গা? কেবল ওই 'ভজ নিতাই গৌর'? বলিয়া বৈষ্ণবী বেশে-বিন্যাস দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসে।

বৈষ্ণবী বলে, সাধ আহ্লাদ আর কি ভাই। উনি বলেন, নামের মধ্যে ওসব ডুবে যায়—বলিয়াই একটু হাসে। সাহস করিয়া আবার বলে, তুমিও জপ কর না ভাই, দিন-রাত কর—দেখবে মনটি কেমন ফুর ফুর করবে—

মেয়েটা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে, বলে, দূর—লোকে বলবে কি? বলিয়া চলিয়া যায়।

আবার আসে। বলে, তোমার নাম ত বোষ্টুমী, আর নাম নেই বুঝি?

বৈষ্ণবী একটু ভাবে, তারপর হাসিয়া বলে, আছে, তবে সে নামে কেউ ডাকে না—বলিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলে, শুনে হাসবে না? আমার নাম লীলা।

মেয়েটার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়। চোখে চোখে চাহিয়া বলে, ওই বাড়ীওয়ালা বুড়োটা কে?

বৈষ্ণবী একটু চুপ করিয়া থাকে। তারপর বলে, উনিই ত—বলিয়া চপল পদে চলিয়া যায়, আর আসে না।

লোকের ভিড় লাগিয়া আছে। সদাসর্বদাই কীর্তন চলে। সরু দালানটার উপর তাহারা ধুম ধুম করিয়া নাচে।

বৈষ্ণবীও নাকি ঘরের ভিতর নাচে, কিন্তু কেউ দেখিতে পায় না।

দলের মধ্যে মতিরামের সাধনা অদ্ভুত। নাচ গান করিতে করিতে সে প্রায়ই

আছাড় খাইয়া পড়ে। কখনও হাসে কখনও কাঁদে—চোখ দিয়া ধারা গড়ায়। সকলে বলে, ওর ওপর 'ভর' হয়েছে, ঠাকুরের দয়া—আহা!

রাধানাথ এ কথা শুনিয়া আড়ালে গিয়া হাসে। লীলা জানালার ফাঁক দিয়া তাহার হাসি দেখিতে পায়।

রাধানাথের সহিত কথা কহিতে তার একটুও লজ্জা করে না। জানালাটা আর একটু ফাঁক করিয়া বলে, হাসচেন যে?

রাধানাথ মুখ ফিরাইয়া বলে, হাসি আসে তাই—এতদিন হরিনাম করছি কিন্তু আমাদের ওপর ঠাকুরের দয়া নেই—বলিয়া আবার হাসে।

চোখ পাকাইয়া লীলা বলে, দয়া হবে কোত্থেকে? অবিশ্বাসী মন নিয়ে কি নাম করা যায়? কথায় বলে, মনে মুখে এক কও।'

রাধানাথ মুখ ফিরায়। আবার বলে, তোমার বিশ্বাস আছে ত?

খুব আছে, তোমাদের চেয়ে—বলিয়া লীলা আড়ালে সরিয়া যায়।

আবার খানিকক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসে। মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া বলে, নাচুনি আরম্ভ হয়েছে—এখানে দাঁড়িয়ে যে?

রাধানাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, এমনি—বুড়ো বয়েসে আর নাচতে ভাল লাগে না।

লীলা হাসিয়া ফেলে কিন্তু নিজের হাসিতে লজ্জিত হইয়া ঘাড় ফিরায়। তারপর বলে, বিষ্টুবাবু আবার হাউ হাউ করে কাঁদে—

ঠোঁট উল্টাইয়া রাধানাথ বলে, নামের মাহাত্ম্য! আমার কই চোখে জল আসে না—তোমার?

রামো—ওসব আদিখ্যেতা—বলিয়া লীলা চলিয়া যায়।

রাধানাথ উঁকি মারিয়া লীলার পথের দিকে চায়। কিন্তু লীলা আসে না।

সন্ধ্যার পর সকলে চলিয়া যায়। রাধানাথ যায় না। তাহার উপর বাবাজির কৃপাটা একটু বেশী।

ধুনুচিতে ধুনা দিয়াই তিনি বলেন, কোথায় গেলে গো? রাধুর বসবার আসনটা এগিয়ে দাও না—

থাক থাক, আর আন্‌তে হবে না—রাধানাথ বলে।

কিন্তু লীলা আসন আনে। বাঁ হাতের আঙুল কয়টা দিয়া মুখের হাসি টিপিয়া ধরিয়া বলে, এই যে পেতে দিচ্ছি—

রাধানাথও আড়চোখে চাহিয়া হাসে। বিনা কারণেই হাসি।

লীলা আসন পাতিয়া দেয়। তারপর রাধানাথের সুমুখ দিয়া সংকুচিত হইয়া বাহিরে যায়—যেন ছুঁইয়া না ফেলে।

বাবাজী পিছন ফিরিয়া তখন মন্ত্র জপেন।

দরজার আড়ালে গিয়া লীলা বসিয়া পড়ে। রাধানাথ দেখিতে পায় বাবাজী

মুখ ফিরাইয়া বলেন, দোষ নেই বাবাজি—গুরুপত্নীর সঙ্গে কথা চলতে পারে, আমাদের শাস্তরে বাধে না—

লীলা মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসে। রাধানাথ বিনয় করিয়া বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ—কিন্তু তাই বলে কি সকলেই কথা বলতে পারে?—

তা নয়। তবে আমি তোমাকে চিনি কি না—সেই ছোট্ট বেলাটি থেকে—বলিয়া গুরুদেব চুপ করেন। একটু পরে আবার বলেন, কিন্তু মা বলতে হবে না বাবা—ওটা যেন জোর করে সাধুগিরি দেখানো। আর উনি তোমার চেয়ে বয়েসেও বোধ হয় ছোট—দুটি ভাই বোনের সামিল। তুমি দিদি বলেই ডেকো—

রাধানাথ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে। মুখ তোলে না পাছে লীলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। কানাচের ধারে একটা বিড়াল ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকে। পাশের আস্তাবলে ঘোড়ার ক্ষুরের ঠকঠক্ শব্দ হয়। স্যাকরাদের ঘড়িতে টিং টিং করিয়া নয়টা বাজে।

রাধানাথ বলে, আমি উঠি এইবার—

উঠবে? আচ্ছা এসো—বাবাজি বলেন।

রাধানাথ আর কোনও দিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া যায়। দরজার কাছে গিয়া বলে, কাল সকাল সকাল আসব গুরুদেব—

লীলা আপন মনে হাসে।

কদম ফুলের মত মাথাটি ছাঁটা—কাঁচায় পাকায় চুল। গায়ের রং কালো—দেহটিও নাদুস নুদুস। দাড়িটা ঠিক সজারুর পিঠের মত—মত সাত জন্মে ক্ষুর পড়ে না। চোখ দুটি দেখিয়া ত লীলা ভয় পাইয়া গিয়াছিল। একদিন হাসিয়া বলিয়াছিল, নামাবলীখানা গায়ে না থাকলে লোকে ডাকাত বলত—

খুঃ-খুঃ করিয়া বাবাজি সেদিন হাসিতে হাসিতে লীলার চিবুক ধরিয়া বলিয়াছিলেন, রাধুর চেয়েও দেখতে ভাল ছিলুম—বুঝলে?

লীলা আর কিছু বলে নাই। কিন্তু বিশ্বাসও করে নাই।

পাশের বাড়ীটার মেয়েটা প্রায় রোজই বিকাল বেলা ছাদে আসিয়া দাঁড়ায়। আজও দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বলিল, শুনচ অ-দিদি।

সরিয়া আসিয়া লীলা বলিল, কি ভাই?

ডুমুর ফুল নাকি?—দেখতে পাই নে কেন?

অনেক কাজ কি না—

মেয়েটি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, জানি গো জানি কত কাজ—তুমিটি আর আমিটি এই ত—সেই রাধু বাবুও থাকে বুঝি?

দুর, সে থাকতে যাবে কেন? তারপর—এত সাজ-গোছ যে? লীলা বলিল।

মেয়েটি একটু হাসিয়া বলিল, তুমিই বা কি কম যাও ঠাকরুণ—চুল আঁচড়েছ, সাবানও মেখেছ, অমন কালাপেড়ে সাড়ীখানি, পায়ে আলতা ওকি গলার কণ্ঠি কি হল?

অপ্রস্তুত হইয়া লীলা বলিল, ছিঁড়ে ফেলেচি ভাই, ভাল লাগে না—

বিচ্ছিরি দেখায়, না? বলিয়া মেয়েটি খিল্ খিল করিয়া হাসিল। তারপর বলিল, শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি—

মুখ তুলিয়া লীলা বলিল, সতি, আবার কবে আসবে?

মেয়েটা কি একটা তামাসার কথা বলিল। বলিয়া চলিয়া গেল।

চোখের উপর আবার সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসে। ঘরে আলো জ্বালা হয় না। না হ'ক—সংসারে অত দরদ কিসের? নিত্য এ সন্ধ্যা-জ্বালা, নিত্য ঠাকুরের সেবা—আরতি—সবই প্রাণহীন। কেন এ সব।

বাবাজি ডাকেন, শুনচ—ওগো—

লীলা কাছে গিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়ায়। বাবাজি ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে বলেন, কাল সকাল-সন্ধ্যে হরিনাম হবে—জান ত?

—না, বলিয়া একটু থামিয়া লীলা পুনরায় বলিল, এখন কিছুদিন বন্ধ থাক—আমি বলি—

বাবাজি ভুরু উঁচু করিয়া বলিলেন, কেন?

তবে হ'ক—বলিয়া লীলা বাহির হইয়া গেল।

রাধানাথ আসিয়া হাজির। বাবাজি বলিলেন, শুনচ বাবু—তোমার দিদিটি কি বলে?

চৌকাঠের উপর বসিয়া রাধানাথ বলিল, কি?

বলে, হরিনাম বন্ধ থাক। চুপ ক'রে রইলে যে? শিউরে ওঠবার কথা এ—

বাবাজির গোল গোল চোখ দুইটা বড় হইয়া ওঠে।

রাধানাথ কথার উত্তর খুঁজিয়া পায় না। 'পদাবলী' খানা লইয়া নাড়াচাড়া করে। তারপর বলে, না হয় বন্ধ করেই দিন—

বাবাজি বলিলেন, দিদির মন্তর কানে গেল বুঝি? তোমার দিদিটি বেশ—বলিয়া হিহি করিয়া হাসেন। পুরু ঠোঁটের ভিতর হইতে দাঁত বাহির হইয়া পড়ে।

রাধানাথ কিন্তু হাসে না? বরং তার মুখ কালো হইয়া উঠে। দরজার আড়ালে সাড়ীর আঁচলটুকুর দিকে মুখ তুলিতে ভয় করে।

বাবাজি আবার বলিলেন, বন্ধ হবে, কিন্তু বুঝলে রাধু—হরিনামে কি পেট ভরে? কাল বেজায় পাওনার হল্লোড় যে—দুফোঁটা চোখের জলেই বেল্লা ফতে—ব'স, আসছি—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সুমুখের দরজাটি একটু ফাঁক হয়। লীলা উঁকি মারিয়া বলে, চলে গেছেন।

হুঁ। রাধানাথ বলে। বলিয়া এ-দিক ও-দিক চায়। আমি আপনার কানে মন্তর দিয়েছি, না?

কে বললে?

লীলা বলিল, না তাই বলছি—বাড়ী যাবেন না? রাত হয় নি বুঝি?

হলেই বা জলে পড়ে নেই ত—রাধানাথ বলিল। মুখের হাসি লুকানো যায় না। লীলা এ-দিক ও-দিক চায়। তারপর বলে, উনি নাকি আগে সুন্দর ছিলেন?

বিশ্বাস হয় না বুঝি ?

বিশ্বাস করলেই হয়—লীলা বলে। বলিয়াই বাহিরের দিকে চায়। কিন্তু কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতের হাওয়ায় গা শির্ শির্ করিয়া ওঠে।

রাধানাথ গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চললুম—

এরই মধ্যে ? রাত ত হয় নি—লীলা বলিল।

কিন্তু রাধানাথ পা বাড়াইয়া বলে, যাই আস্তে আস্তে—

কাল কখন আসা হবে ? বলিয়া লীলা আলো হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া যায়।

দুয়ারের কাছে গিয়া রাধানাথ হাসিয়া ফেলে, বলে, আমার সব খবরই কি তোমার দিতে হবে ?

লীলা আবার পিছন ফিরিয়া চায়। তারপর বলে, দিলেই বা—পর ত নই—বলিয়া মুখ নীচু করে। নিঃশ্বাসটা চাপিয়া রাখে।

রাধানাথ কি বলিতে যায়—পারে না। শুধু বলে, অচ্ছো। বলিয়া চলিয়া যায়।

সকালে সোরগোল শুরু হয়। নানা ঢঙের কীর্ত্তনীয়া নানা বসরৎ দেখায়।

রাধানাথের মন যায় না। আড়ে আড়ে ঘরের ভিতর চায়। আবার খঞ্জনী বাজায়।

লীলা জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া হাতছানি দিয়া ডাকে। রাধানাথ থুথু ফেলিবার নাম করিয়া উঠিয়া কাছে আসে।

লীলা বলে, রোজ রোজ তোমার ভাল লাগে ?—আমার লাগে না।

বাবাজি রাগ করেন যে না এলে—রাধানাথ বলে।

লীলা বলে, তা বললে কি হয় - মানুষের মন ত—চেঁচানির, চোটে বাড়ী ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে। ওই যে ওই আরম্ভ হল, বাবারে—

রাধানাথ চলিয়া যাইতে চায়। কিন্তু লীলা বাধা দিয়া বলে, থাক্—একটু পরেই হবে, না হয় বাড়ী চলে যাও—এখানে থেকে কাজ নেই। নয় ত এই ঘরে এসে ব'স—

না—না—উনি হয় ত দেখতে পাবেন। এবং আরও কি গোঁজ গোঁজ করিয়া বলে। মুখখানা লাল হইয়া ওঠে।

রাধানাথ বলে, দেখতে পেলেই বা, তাতে কি ? লজ্জা করে বুঝি ?

লীলা সে কথায় উত্তর দেয় না। একটু পরে বলে, নাকের ওই তেলক মুছে ফেল' —টিকিই বা রাখবার দরকার কি ? বুড়োর বেহদ্দ।

রাধানাথ আর হাসি চাপিতে পারে না, বলে, মানায় না বুঝি ?

জোরে ঘাড় নাড়িয়া লীলা বলে, না—বিচ্ছিরি দেখায়।

আবার হাসি আসে। রাধানাথ বলে, কি করলে তোমার পছন্দ হয় ?

দূর, আমার আবার পছন্দ—বলিয়াই লীলা কপাটের পাশে লুকায়।

লোহার গরাদে মুখ লাগাইয়া রাধানাথ বলে, বলতে লজ্জা হচ্ছে বুঝি, আমাকেও লজ্জা ?

লীলা আর একটু সরিয়া যায়। বলে, যাও আমি জানি নি। এবং আরও একটা কথা বলে, তোমার বউকে জিজ্ঞেস করগে—

বাবাজির পরণে বেনারসী জোড়। হাতে সোনার বালা। চন্দন-চর্চ্চিত ললাট। সময় সময় চোখে কাজলও লাগান। মাথায় জরির তাজ ত আছেই।

তাঁর গানের সঙ্গে দোয়ারেরাও চীৎকার করে। গলার শিরগুলো ফুলিয়া ওঠে।

আড়াল হইতে দেখিয়া লীলার সর্বাঙ্গ রি রি করে।

রাধানাথও হাসি চাপিতে পারে না। সময় সময় বাবাজির নজরে পড়িয়া যায়। হাতের দিকে চাহিয়া বলেন, তাল কেটে যাচ্ছে হে রাধু—

আড়ালে দাঁড়াইয়া ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া লীলা বলে, যাবে না? সব তাল বেতালের দল যে—বলিয়া দুম দুম করিয়া চলিয়া যায়। রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে, হরি-কথায় সকলের নাল গড়িয়ে পড়ে। অত করে হাত নেড়ে ডাকলুম, আসা হ'ল না—

বেলা গড়াইয়া আসে। সোরগোল থামিয়া যায়। সকলে ঘরে ফেরে। বাবাজি ভিতরে আসিলে লীলা বলে, না খাইয়ে অমনি ছেড়ে দিলে?

কাকে?

ওই ইয়েকে—লীলা বলে।

বাবাজি বুঝিতে পারেন। বলেন, কে—রাধু? ও ত চলেই গেল—বলিয়া রেজ্‌কিগুলা গুণিয়া টাকায় পরিণত করেন। লীলা চোখ পাকাইয়া চাহিয়া চলিয়া যায়। যাইবার সময় বলে, কেন খেয়ে গেলেই হ'ত—এত করে রাঁধলুম—

বাবাজি হাসিয়া বলেন, পরের ওপর এত দরদ—বেশ দিদি বটে—

দরদ না ছাই, যা নয় তাই বলা—আপন মনে লীলা বলে।

বাবাজি বিষয়কর্মে বাহির হইয়াছিলেন। দু একজন তামাক খাইতে আসিয়াছিল কিন্তু কলকে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

রাধানাথ তামাকও খায় না। তবু আসা চাই। ঠাকুর-ঘরে তাহার অবাধ প্রবেশ।

লীলা চৌকাঠে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি বেরিয়ে গেছেন—

তা ত জানি—তুমি তাড়িয়ে দেবে নাকি?

আমার দায় পড়েছে। একলাই থাক্‌বে? আমি রাঁধতে যাচ্ছি।

যাও, বোক্‌লা আর পাব কোথায়?

লীলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

আবার ঘুরিয়া আসিল। কথা বলা চাই। একটু থামিয়া বলিল, তোমার বিয়ে হচ্ছে নাকি?

কে বললে?

শুনলুম—তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি।

রাধানাথও হটিবার পাত্র নয়। বলিল, যাদের এত আপনার লোক তার বিয়ে দরকার কি?

লীলা বলিল, আমি আবার আপনার লোক কিসের ? এমন ত কত আছে।

এমন একজনও নেই—সত্যি বলছি।

আমার ভাগ্যি।

রাধানাথও হাসিয়া বলিল, আমারও ভাগ্যি, নৈলে এমন মিষ্টি কথা শোনায় কে।

—মিষ্টি কথায়ও আর পেট ভরে না—লীলা হাসিয়া বলিল।

বাবাজি আসিয়া পড়িলেন। রাধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, দিদির সঙ্গে আলাপ হচ্ছে বুঝি ? বেশ বেশ—

লজ্জায় রাগে লীলা চুপ করিয়া রহিল।

বাবাজি পা ধুইয়া ঘরে আসিয়া বলিলেন, দিদির মতন একটি সুন্দর মেয়ে বিয়ে কর-না রাধু ?

রাধানাথ বলিল, কি যে বলেন আপনি—

ঠিক কথাই বলি হে। আমারও একদিন অমন ছিল। আজই না হয় অর্থ পেয়ে অনর্থ ঘটেছে। কামিনী বড় আরামের চীজ বাবাজি—বুড়ো বয়েসেও ধাক্কা দেয়—বলিয়া হি হি করিয়া হাসিলেন।

সিঁড়ির কাছে আসিতেই রাধুর গায়ে একটা টিপ দিয়া লীলা বলিল, আমার মতন মেয়ে পেলে বিয়ে কর না কি ?

রাধানাথ থমকিয়া দাঁড়ায়। তারপর লীলা অতি নিকটে আসিলে চুপি চুপি বলে, তোমার মতন—তুমি ত আর নও ?

যাও—বলিয়া লীলা হাসিয়া চলিয়া যায়।

ক'দিন আর কীর্ত্তন বসে না। রাধানাথেরও দেখা নাই। কেন আসে না তা লীলা ভাবিয়াই পায় না। সে বলে তপিলের জোর আছে বুঝি ?

বাবাজি হাসিয়া বলেন, আছে ত—পয়সায় রস না থাকলে শুধু হরি ভাল লাগে ?

লীলা বলে, লোকজন এলে গেলে মনটা ভাল থাকে—

বাবাজি আড়চোখে চাহিয়া বলেন, রাধুর জন্যে বুঝি মন খারাপ। তা ত হবেই, ভায়েরও বাড়া—

রাধু—রাধু—কেবল রাধুর নাম। খাইতে শুইতে কেবল রাধানাথ বাবু। কান ঝালাপালা হইয়া যায়।

বাবাজি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলেন, দরদ বড় বালাই—

লীলা অন্যমনস্কভাবে বলে, ষাট ষাট, আমি কি তাকে বালাই বলছি ?

বাবাজি পুরু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলেন, বাবা—এত দরদ! মায়ের পেটের দিদিও এমন হয় না।

লীলা বিরক্ত হইয়া বল্লে, আঃ দিদি—দিদি—কেবলই দিদি। তিনি আমার বয়েসে বড় তা জান ?

বাবাজি থতমত খাইয়া বলেন, না তাই বলছি—বুঝলে?—ও একই কথা। তবে সে কি বলবে তাই ভাবছি—

বাবাজির রকম দেখিয়া লীলা হাসিয়া ফেলে। বলে, দিদি বলবার কি দরকার? আপনি বললেই ত হয়—

রাধু কিন্তু 'আপনিও' বলে না—দিদিও বলে না। বাবাজির সঙ্গে দেখা করিতেও আজকাল সময় হয় না। রাস্তা দিয়া যায়—একবার ফিরিয়া তাকায়।

··হয় ত কোনও দিন লীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে তার সঙ্গে চোখচোখি হইয়া যায়। লীলা বলে, বাবুর দেখা নেই কেন?

বাবু বলে, অনেক কাজ কি না, তাই।—ভাল ত?

আমার আবার ভাল মন্দ। মাটির সঙ্গে মিশলেই হয়।

রাধানাথ একটু হাসিয়া চলিয়া যায়। লীলা চাহিয়া থাকে।

চটি জুতা জোড়াটি দেয়ালে ঠেকো দিয়া রাখিয়া বাবাজি বলিলেন, বাবুর সঙ্গে দেখা হল, বুঝলে?

লীলা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। বলিল, আসছে নাকি? ক'দিন আসে নি কেন?

বলে তার অনেক কাজ, সময় হয় না। একটি খবর দিতে পারি, বল সন্দেশ খাওয়াবে? তোমারই ভাই ত—

কি?

তার যে বিয়ে। এই ক'টা দিন বাদে। তাই দেশে যাবার যোগাড় করছে।

দেওয়ালের ধারে বসিয়া পড়িয়া ঢোক গিলিয়া লীলা বলিল, বিয়ে কার সঙ্গে?

তা কি জানি, তবে মেয়েটি নাকি সুন্দরী। বলিয়া বাবাজি ঘরে ঢুকিলেন।

শূন্য দৃষ্টিটা যেন গতিহীন—অর্থহীন। সর্বস্ব হারাইলে লোকের চোখ দিয়া জল দিয়া জল পড়ে কি?

শীতকালের বেলা ছোট, কাজ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। উপায় কি।

বাবাজির আজ ভাঙসেবা হইয়াছে। সুতরাং সন্ধ্যা হইতেই তিনি কুম্ভকর্ণ। কার জন্যই বা রান্নাবাড়া, খাবেই বা কে? নিজের নিজের পরিচর্য্যা ভাল লাগে না। জীবন না দাসত্ব—যুগ যুগ ধরিয়া কেবল বন্ধনের অত্যাচার। সদর দরজায় দাঁড়াইয়া লীলা ভাবিতেছিল।

শীতরাতের চাঁদের আলো অবশ, নিঝুম। পৃথিবীর বুকের উপর জীবনের স্পন্দন থামিয়া গেছে।

···পিছন হইতে রাধানাথ বলিল, এখানে ব'সে যে?

লীলা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এমনি—

গুরুদেব কই?

ঘুমুচ্ছেন। জাগালে তাঁর শরীর খারাপ হবে। কেন?

দেশে যাচ্ছি, তাই একবার—

আচ্ছা কাল সকালে আমি বলব—লীলা বলিল।

এ মুখভঙ্গির সহিত রাধানাথের কোন দিনই পরিচয় ছিল না। তাই সে নিজের বক্তব্যও শেষ করিতে পারিল না। কিন্ত কথা কিছু কওয়া চাই। তাই সে বলিল, উঃ কি শীতই পড়েছে—বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় মাপ কর তুমি—কিছু মনে কর না—

লীলা বলিল, দোষ করলেই লোকে মাপ চায়—আপনি মাপ চাচ্ছেন কেন?

তাহার সজল কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধানাথ সরিয়া আসিয়া বলিল কাঁদচ?—কেঁদো না দিদি—ছোট ভাই ব'লে মাপ কর।

লীলা সাড়া দিতে পারিল না—ভিতরে চলিয়া আসিল। আবার বাহিরে গিয়া দেখিল রাধানাথ চলিয়া গেছে। অনেক দূরে তার অস্পষ্ট ছায়াটা মিলাইয়া যাইতেছিল।

...বিপুল জ্যোৎস্না মাটির বুকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সে মৃত্যুর মত বিষাদময়ী—অচেতন। তুহিনের যবনিকা সেই মৃত পৃথিবীকে ঢাকিয়া দেয়। তাহার দিকে চাহিলে বুকের ভিতর কাঁপুনি ধরে। চক্ষু বুজিয়া আসে।

ভাড়াটে বাড়ী। মালিক একটি স্ত্রীলোক। বয়স অল্প, দেখিতে মন্দ নয় কিন্তু বিধবা। পাড়ার লোক বলে, উঃ কি অহঙ্কার—একে পয়সা, তার রূপ। মাটিতে পা পড়ে না। হাজার হোক মেয়েমানুষ ত—

আমরাও মাঝে মাঝে তা টের পাই। নীচের তলায় থাকি। কলের জল লইয়া বচসা হয়। ছাদে কাপড় শুকানো লইয়া একদিন কলহও হইয়া গিয়াছে।

দিদি বলে, পুরোনো ভাড়াটে বলে তোমাদের জোর ত কিছুই নেই। উঠিয়েও দিতে পারি। নয় একদিন মনটা হু হু করবে—আরকি।

আমি বলি, বিশুর জন্যে কাঁদবে না দিদি ?

বিশু আমার দাদার ছেলে।

দিদি চলিয়া যাইতে যাইতে বলে, করলেই বা। সামলাতে কতক্ষণ। নিজের সন্তানই যখন নেই তখন এত কিসের মায়া ?

হাসিয়া বলি, সত্যি ?

দিদিও হাসিয়া বলে, সত্যি নয় কি মিছে ? তবে যদি মানুষ করতে না পার ত বিশুকে না হয় দিয়েই যেও। তা মা বাপ হয়ে কি সে কাজ পারা যায়—বলিয়া দিদি বিশুকে কোলে লইয়া দুম দুম করিয়া চলিয়া যায়।

বড় বউ রাগিয়া বলে, ঠাকুর-পো ?

কি—

এসব আমার ভাল লাগে না। দিন নেই রাত নেই—ছেলে কাঁধে করলেই হল ? 'না বিইয়ে কানায়ের মা' আর কি। 'বাঁজা'র কোলে ছেলে দেয়া পাঁজি পুঁথিতে নিষেধ আছে—তা জান ? ছেলের বয়েস চার বছর—তা তিন বছর ত ওর কোলেই মানুষ হল।

বলিলাম, বড় অন্যায়।

বৌ-দি রাগিয়া আগুন হইয়া বলে, তোমাদের কেবল তামাসা মিষ্টি মুখে বললেন অন্যায়। বলে, 'যার ধন তার নয়'—আমার যেমন পোড়া কপাল।

দিদি উপর হইতে শুনিতে পায়। দেখি খানিক বাদে আমার সুমুখে বিশুকে বসাইয়া দেয়। সে জানে, আমি কিছু বলিবই—তা এ কাজ। আমিও বলিলাম, সখ মিটল দিদি ?

দিদি একটু হাসিয়া বলে, কি করব ভাই—আমার ধন তার ধন নয়'—

আমি স্পষ্ট দেখি, দিদির মুখে মোটেই সেটুকু হাসি নয়।

দিদি আর কিছু বলে না। লুকাইয়া চলিয়া যায়। আবার ঘুরিতে আসে। বলে, আচ্ছা, বিশু যে আমার ছেলে নয় তার প্রমাণ? কিন্তু পরক্ষণেই জিব কাটে, মুখ লাল করিয়া থামিয়া যায়। একটু পরে সরিয়া আসিয়া বলে, উনি গেছেন আজ পাঁচ বছর হল ভাই, আমার বয়েস তখন ঠিক উনিশ বছর। সেই বছরেই ত তোমরা এ বাড়ী এলে।

সেদিন কি একটা কথা লইয়া বৌদির সঙ্গে দিদির খুব খানিকটা কলহ হইয়া গেল। কিন্তু সেদিন বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, পরাজয়ের ভারটা দিদি নিজের ঘাড়েই লইয়া চলিয়া গেল এবং সে যে কাঁদিয়াও ফেলিয়াছিল তাহাও পরে চুপি চুপি বৌ-দি আমায় বলিয়াছে।

সঙ্গে সংগে বিশুর যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল।

উপরে যাওয়া-আসার একটি মাত্র দরজা—সেটি বৌ-দি সেদিন তালা আঁটিয়া দিল। কেবল সদর দরজা খোলা—সেখানে দিদিও আসিবেন না, বিশুও যাইবার পক্ষে নিতান্ত ছেলেমানুষ।

বৌ-দি বলে, এই শাস্তি দিলে ঠিক জব্দ হবে।

আমি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, গেলই বা বৌ-দি। কোলে নিলে ত আর বিশুর গায়ে ফোস্কা পড়চে না। ছেলেপুলে নেই বলেই ও'র মায়া পড়েছে।

বৌ-দি গম্ভীর ভাবে বলিল, এসব কথা তোমার কানে ওঠবার দরকার দেখি নে ঠাকুর-পো। বাড়ী ভাড়াই নিয়েছি, ছেলেকে ত ভাড়া নিই নি। তবে তোমার সঙ্গে যে দিদির খুব ভাব এটা খুবই বুঝতে পাচ্ছি, যার জন্যে ভাজও পর হয়ে যায়—বলিয়া একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া সে পুনরায় বলিল, ভাগ্যিস দিদিটি পেয়েছিলে, তাই ত তোমার দিন কাটছে; এত আলাপ, তবু ভাল।

চুপ করিয়া রহিলাম।

বিশু কাঁদে, পিসীমা'র কাছে যাব—

বৌ-দি বলে, ও কথা বলতে নেই, মার খাবি।

দু'একদিন বিশু দরজা ঠেলিয়া দেখিল, দরজা আর খোলে না। সদর দরজার বাহির হইল না পাছে জুজু আসিয়া ধরে।

দুপুর বেলা ঘরেই ছিলাম। ও-ধারে বৌ-দি বোধ হয় দিবা নিদ্রায় মগ্ন। বিশু ছুটাছুটি করিতে করিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাব না—জুজু আছে—মা বকবে—

আড়াল হইতে দেখিলাম, দিদি তাহাকে হাত বাড়াইয়া ডাকিতেছে। আজ কয়দিন বাদে তাঁহাকে দেখিলাম। মনে হইল তাঁহার সে পরিষ্কার মুখখানির উপর কে কালি লেপিয়া দিয়াছে, চুলগুলি আলুথালু, চোখ দুইটি লাল, স্পষ্ট দেখিলাম, চোখের দুইটি লাল, স্পষ্ট দেখিলাম, চোখের জল গালের উপর গড়াইয়া আসিয়াছে। বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। ওই অশ্রুর সহিত যেন মনে মনে আমারও আত্মীয়তা আছে। বাহিরে আসিয়া বলিলাম, দিদির অসুখ বুঝি?

দিদি দ্রুতপদে সরিয়া গেল। একটু পরে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, দোষ করলে কি মাপ নেই ভাই?

বলিলাম, আমিও জানি—তুমিও জান দিদি—দোষ তোমার নেই, তবে মাপ চেয়ে কেন লজ্জা দাও?

দিদি এ কথা বোধ হয় শুনিল না, বিশুর দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমি পুনরায় বলিলাম, তোমার চেহারা কি হয়ে গেছে দিদি, আজ রান্না নেই?

দিদি একটু হাসিল, তার পর বাঁ হাতের চেটোর উপর আঙুল দিয়া লিখিয়া দেখাইল—একাদশী।

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম,—যা না বিশে, তোর পিসি-মা ডাকছে যে—?

বিশু আমায় ভয় করিত। বলিল, কোথা দিয়ে যাব?

বৌ-দি দ্রুতপদে বাহির হইয়া বলিল, লোভ সকলকারই আছে, মুখ দিয়ে লাল পড়ে কেন? চল্ বিশে, ঘুমুবি—বলিয়া সে বিশুকে টানিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

লজ্জায় ক্ষোভে মরিয়া গেলাম। দেখি, দিদি তার আগেই চলিয়া গিয়াছে।

বর্ষাটা সেদিন বড় জোরেই চাপিয়া আসিয়াছিল। মনে হইল, এ প্লাবনের বুঝি আর বিরাম নাই। সংসারের সমস্ত দুঃখের মলিনতা কি এর স্রোতে ধুইয়া যায় না?

শহরতলীর এক পাশ। সুমুখের পড়ো মাঠের ধার দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। হাঁটু অবধি কাদা। লোকালয় কম—মাঝে মাঝে এক আধটা বস্তি। এ মাঠে নাকি আগে কোন্ বড় লোকের বাড়ী ছিল। তার চিহ্নস্বরূপ দু'একটা পাঁচিলের ভগ্নাংশ আজও কাৎ হইয়া আছে, তাহারই ধারে একটা জীর্ণ অশ্বত্থ গাছের শাখায় বাদলার বাতাস ব্যথার ভার লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

আপন মনে বাড়ী ঢুকিতেছিলাম। উপর দিকে নজর পড়িতেই দেখি ছোট জানালাটির ধারে দিদি বসিয়া আছে। হঠাৎ কি জানি পা চলিল না—ছাতাটি তুলিয়া উপর দিকে চাহিলাম। দিদি দেখিতে পায় নাই। লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য করিলাম, কাঁদিতেছে। সহসা একটি বস্তু আজ কি জানি কেন হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আজ সংসারে ইহার কি কেহ নাই? জনহীন শূন্য পুরীর পাথরখানা এই যে ইহার তরুণ ব্যর্থ বুকটার উপর কতদিন হইতে চাপিয়া আছে, ইহার কি প্রতীকার নাই? রূপ ও ঐশ্বর্য্যের আবরণের তলায় শরাহতা কপোতীর মত ভূলুণ্ঠিত হইয়া এই যে নারীটি ছটফট করিতেছে, এর কারণ কি?—অথচ আমার এ অসংবদ্ধ অনভিজ্ঞ প্রশ্নের উত্তর আমি সেদিন কোনও মতেই পাই নাই।

চলিয়া আসিতেছিলাম। দিদি বলিল, হাসিয়াই বলিল, মাথা খারাপ হয়েছে বুঝি! জলে ভিজছ কেন? ভেতরে এসো।

লজ্জিত হইয়া কি করিব ভাবিতেছি। দিদি আবার অনুযোগ করিয়া বলিল, দিদির ঘরে পায়ের ধুলো পড়তে নেই বুঝি? খুব বিদ্যে হয়েছে যা হোক—

আজ আমার হাসিতে ইচ্ছা হইল না। বলিলাম, তোমারও ত খুব বিদ্যে, ছোট ভায়ের পায়ের ধুলো চাও?

ভিতরে আসিয়া দিদির উপরের দালানে বসিলাম। ভয় করিতেছিল পাছে বৌ-দি জানিতে পারে, কিন্তু বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে কিছুই শুনিবার উপায় ছিল না।

বলিলাম, জানালার ধারে বসেছিলে যে?

একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিদি বলিল, যে বাদল, কিছু ভাল লাগে না।

চুপ করিয়া রহিলাম। এতদিন বাদে আজও সেই বর্ষার স্বল্প অন্ধকারে দিদির করুণ সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে। ভাবি সেদিনকার সে মুখে কোন ভাবের ছায়াপাত দেখিয়াছিলাম। তখন বাহিরের দৃষ্টিই খোলা ছিল, ভিতরে তলাইবার বয়স হয় নাই। কিন্তু আজ জ্ঞান হইয়াও ত সে মুখখানির নিকট আমি তেমনি অজ্ঞান। তা সে যাই হোক, দিদি একটু থামিয়া বলিল, তোমার বৌ-দি ত আজ আমায় যাচ্ছেতাই করলেন—

মনে মনে লজ্জিত হইয়া বলিলাম, ও কথা আর না-ই তুললে দিদি।

—তোমার শোনা দরকার ভাই, শোন। বলিয়া দিদি যাহা বলিল, তাহার মর্ম এই, বিশু তাহার কাছে আসিবার জন্য কান্না জুড়িয়াছিল কিন্তু তাহার মা আসিতে দেয় নাই। অবশেষে বিশু জুজুর ভয়কে তুচ্ছ করিয়া সদর দরজায় আসিতেই তিনি কোলে করিয়া উপরে আনিয়াছিলেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, বিশু তাঁহার তরকারীর বঁটিতে হাতের আঙ্গুল কাটিয়া রক্তারক্তি করিয়াছে। শেষে দিদি সজল চোখে বলিল, আর শুনে কাজ নেই ভাই—বিধবাদের কানে সে কথা গেলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়—

মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে সুদূরের মাঠে বৃষ্টির অবিরাম ঝর ঝর শব্দ শুনা যাইতেছিল। সেও যেন বিধাতার মর্ম-ভাঙ্গা অশ্রুজল।

দিদি সত্যই আমি ভাল বাসিয়াছিলাম এবং সেদিন হঠাৎ তাহার গলা জড়াইয়া হাত ধরিয়া যাহা বলিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে করিতে পারি। পাগলের মত বলিলাম, দিদি কেঁদো না। তুমি মারো ধর, আমি সহ্য করব কিন্তু তুমি কেঁদো না—ও আমি দেখতে পারি না।—দিদির নিপীড়িত হৃদয় বুঝি আমার কাছে এইটুকু প্রত্যাশা করিয়াছিল। বলিল, আমরা কেন এক মায়ের সন্তান হই নি, ভাই?

আমি আবেগের সহিত বলিলাম, সেইটিই ধরে নাও না দিদি?

আমারও চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

দিদি চোখ মুছিয়া বলিল, ভাই, তোকে পেয়ে আমার একদিক যেমন ভরে উঠল, তেমনি আর এক দিক যে ভয়ানক ফাঁকা—সে ফাঁকার দিকে চাইতেও যেন ভয় করে ভাই।

চুপ করিয়া রহিলাম। দিদি আবার বলিল, গান জানিস রে? এমন অসময়ে গান নইলে কিছু ভাল লাগে না,—না থাক।—বলিয়া দিদি উঠিয়া গেল এবং একটু পরেই নানারকম খাবার আনিয়া হাসিমুখে বলিল, একটুখানি ভুল করছিলাম, গানের চেয়ে আমার এই ভাই-ফোঁটাই ভাল।

কিন্তু পূর্বদিনের ঘটনার জের টানিয়া বৌদি আবার যখন পরদিন কলহের সূত্রপাত করিল, তখন আর দিদি সহ্য করিল না। সেও ত মানুষ। বলিল, বড়বউ ভাই, কাল তোমার পায়ে ধরে মাপ চেয়েছি কিন্তু তাতেও যখন শুনলে না তখন আমি নিজেকে আর বেশী সস্তা করব না। আজ থেকে তিন দিনের সময় দিচ্ছি তোমারা বাড়ী থেকে উঠে যাও। সত্যি, টাকা দিয়ে তোমরা অসদ্ব্যবহারই বা সহ্য করবে কেন?

বৌদি বলিল, সে কথা না বললেও চলত। তত কাঁচা মেয়ে আমি নই। কালই আমি দাদাকে দিয়ে বাড়ী ঠিক করিয়েছি।

আড়াল হইতে দেখিলাম, দিদির মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। সে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু আমার এ কি হইল! আমি সারাদিন কোথাও শান্তি পাইলাম না। একদিন চলিয়া যাইব জানিতাম কিন্তু সে কবে তাহার কোনও স্থিরতাই যে ছিল না। আজ যাওয়ার কথাটা এমন নির্দয় সত্য হইয়া দেখা দিবে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। দিদিই বা কি। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি ছল করিয়া তাহার দোরে আনাগোনা করিলাম, কতবার তাহার জানালার দিকে উঁকি মারিলাম, নানারূপ শব্দ করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে এমনি নিষ্ঠুর যে, একবার দেখাটা পর্যন্ত দিল না। অথচ আমি কেমন করিয়া যেন জানিতেছিলাম, দিদি দেখিয়াও দেখিল না। সেদিনকার সে অভিমানটি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।

সকাল বেলা দাদা বলিল, তৈরী হয়ে নে—যেতে হবে আজ।

বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, বলিলাম, আর দুদিন থাকলে হয় না?

—গাধা কোথাকার। দুদিন বাদেও ত যেতে হবে। বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দাদা বলিলেন, মেয়েমানুষ কর্ত্তা সাজলে এমনি টানা হেঁচড়াই করতে হয়।

নূতন বাড়ীতে জিনিসপত্র চালান হইয়া গেল। দাদা আগেই চলিয়া গিয়াছেন। বৌদি'র দাদা গাড়ী লইয়া হাজির। ছেলেকে লইয়া বৌদি গাড়ীতে উঠিল।

আমিও যাইতেছিলাম, শব্দ আসিল, শোন।

ফিরিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সে দিদি আর নাই, চেনা দায়। একদিনেই বদলাইয়া গিয়াছে। আমায় ভাবিবার সময় না দিয়া দিদি কাঙালিনীর মত বলিয়া উঠিল, একবার বিশেকে দে-না ভাই, একবার—

অনেক অনুনয় করিয়া বৌ-দি'র নিকট হইতে বিশেকে আনিয়া দিলাম। বৌদি বলিল, যদি এত ভালবাসাবাসি, বিশের নামে বাড়ীখানা লিখে দিক না—

নির্লজ্জ উক্তির পর আমার আর কথা বাহির হইল না।

কিন্তু তারপরের সে দৃশ্য আমি আর ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। বিশেকে কোলে পাইয়াও দিদির চোখে অশ্রু নাই—যেন স্তব্ধ হইয়া গেছে। কিন্তু বিশু! ওই অতটুকু বালক—ও এত চোখের জল পাইল কোথায়? কে এমন করিয়া উহাকে সঙ্গোপনে অশ্রুর বাঁধ বাঁধিতে শিখাইয়াছিল?

দিদি বলিল, আমি যেতে দেবো না—গাড়ী ফিরিয়ে দাও। না, কিছুতেই আমি যেতে দেবো না।

আমি চেষ্টা করিয়া হাসিলাম। দিদি পুনরায় বলিল, হয় না? খুব হয়—ইচ্ছে থাকলেই হয়। বলিয়া গাড়ীর কাছে গিয়া বলিল, বড়বউ, ভাই, রাগ ক'র না—ফিরে এস!

বড়বউ বলিল, কেন দেরি করিয়ে দিচ্ছ ভাই? যাবার সময় আর কষ্ট দিও না।

দিদি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, ভাই, না হয় আজ থেকে লিখে পড়ে দিচ্ছি—তোমাদের কাছে আর ভাড়া নেবো না।

এইবার বড়বউ রাগিয়া বলিল, আমরা ত কাঙালী নই যে, অমনি থাকব? কিন্তু আর তোমার আদিখ্যেতা ভাল লাগচে না ভাই,—ঢের হয়েছে—ছেলেটাকে এখন ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দাও।—

বলিয়া হাত বাড়াইয়া বিশুকে টানিয়া লইল।

তারপর অনেকগুলি দিন দেখিতে দেখিতে পার হইয়া গিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন দিদির বাড়ী গেলাম। আমায় দেখিয়া বলিল, চিঠি পেয়েছিলে?

ঘাড় নাড়িলাম।

দিদি পুনরায় বলিল, তোমায় দরকার আছে—আমার শেষের কাজটি করে দাও ভাই। নৈলে কে আর আছে?

—কি বল না দিদি?

দিদি বলিল, বৈদ্যনাথে যাব। আমার জ্যেঠি-মা সেখানে আছেন, তিনি মায়েরও বড়। অনেক করে আসতে লিখেছিলেন, যাওয়া ঘটে নি, এইবার গিয়ে বাস করব। রেখে আসতে পারবে?—বলিয়া আমার কাঁধে হাত রাখিল।

হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, খু—ব পারব, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের কথাতে ভয় পাইয়া বলিলাম, দেশ ছেড়ে যাবে দিদি? দেখা হবে না যে।

দিদির চোখের জল গোপন করিয়া বলিল, দেখা না পেলেও যে বাঁচতে হয় ভাই।

'মৃত্যুরে কে মনে রাখে?'

ধূলার দেশ।—কেঁচোর মাটি আর ব্যাঙের ছাতা শুধু কথার কথা।

পশ্চিমের বড় শহর। কাছেই নদী—গঙ্গা; গতযৌবনা।

বাঙালী পাড়াটি ছোট,—কোণঠেসা। মাঝখানে মানস-সরোবর।

ওর প্রথম 'স'টি নেই—জলমগ্ন। এখন শুধু মানু-সরোবর। পানাপচা খানিকটা জল আর স্থবির দু' একটা কচ্ছপ—এই মূলধন।

বিশুদার আস্তানা পাশেই। একটা গলির বাঁকে। গঙ্গা হইতে মিনিট পাঁচেকের পথ।

বিশুদার কাজ শুধু পাথর-খোদাই,—দিনরাত। লোকটি বড় শান্ত। সংসারের বালাই নেই। বছর আষ্টেকের একটি রুগ্ন ছেলে—এইটুকু যা উদ্বেগ। বউটি পটল তুলিয়াছে মাস কয়েক আগে। ও তখন আরঙ্গাবাদে।

ইতর ভদ্র সকলেরই বিশুদা। শিল্পাগারের মেয়েরাও ওই বলিয়া ডাকে—আবার বাজারের ব্যাপারিদের কাছেও ওই নামে পরিচয়।

জল খাওয়ার নামে তাহারই বাড়িতে ইস্কুলের মেয়েদের আড্ডা। বিশুদার দিদি ওলা সকলেই।

সার্কাস দেখিবার পথে সেদিন বিশুদার ঘরে তাড়াতাড়ি আসিয়া রেবা কহিল, দেখ ত বিশুদা, আমি কিন্তু এবার সত্যিই রাগ করবো তা বলে দিচ্ছি।

অভিমানের সুর।—বিশুদা কহিল, কি হল দিদি?

তোমার কাছে পাথর-খোদাই শিখ্‌বো শুনে সবিতা-দি ঝগড়া করতে এল।

এতে তার কি?

সে-ই জানে! অথচ তোমার সঙ্গে ত ওর একটুও বনে না। এসে ত কেবল তোমার জিনিসপত্তর ভেঙে চুরে ভণ্ডুল করে' দিয়ে যায়। দাদা বলে' একবার ডাকতেও শুনলুম না কোনদিন। একগুঁয়ে মেয়ে কোথাকার! বলে—আমরা কেউ তোমার কাছে আসতে পাব না। বিধবা বলে' ওর সব আব্দার বুঝি আমাদের রক্ষে কর্ত্তে হবে?

না না—তা নয়। কি জানো রেবা—?

জান্‌তে চাইনে বিশুদা। তুমি ক রো একার নও।

বিশুদা এবার হাসিল—আমি সকলের বুঝি?

নিশ্চয়। কারো 'পেটেন্ট্' করাও নয়। আমার কথা শুনে—বুঝলে বিশুদা?

—সবিতা-দি ত গর গর কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেল। অম্বা ত ওকে যাচ্ছেতাই বলে' দিয়েছে।

বিশুদার হাতের কাজ পড়িয়া থাকে। মুখ তুলিয়া বলে, অম্বা কিন্তু ভারি দুষ্টু ভাই। সবিতাকে ও যা-তা বলে।

বলবে না? নিশ্চয় বলবে। সেদিন পাথর-কাটা যন্তরটা ছুড়ে সবিতা-দি তোমার হাতে রক্ত বার করে' দিল, তুমি ত কিচ্ছুটি বল্লে না।

বিশুদা হাত ঘুরাইয়া দেখিল। কহিল, দাগটা আছে বটে এখনও।—কিন্তু কিছু বলা কি উচিত ভাই? বিশেষত সবিতা—

বিধবা,—কেমন? তা আমরাও কুমারী সুতরাং বিশেষ তফাৎ নেই বিশুদা।—রেবা যেমন আসিয়াছিল, তেমনি চলিয়া গেল।

ও যেমন আপনার মনে নদীর মত গান গাহিয়া চলে—বাধা পাইলে তেমনি উত্তাল হইয়া ওঠে।

সবিতার কথা ওইখানেই শেষ হয়। বিশুদার খেয়াল থাকে না।

ঘরে রুগ্ণ ছেলে। কিন্তু কাজের কামাই নাই। নূতন মন্দির কোথাও হয়—অমনি বিশুদার ডাক পড়ে। চমৎকার হাত,—মাথাও! পাথর হইতে মূর্ত্তি কুঁদিয়া বাহির করে। নূতন গড়ন, নূতন ধরন, নূতন ভঙ্গি। কোনটা পুরুষ, কোনটা নারী—কোনটা বা জানোয়ারের।

কিন্তু নারী মূর্ত্তি—ওইটি হয় আরও চমৎকার।

কারণ আছে। বৌ ছিল বিদ্যুৎলতা। নাম—করবী। কিন্তু তার চোখ দুটি?—নীলপদ্ম। পাষাণে ফুটিয়া এখনও কথা বলে।

বিশুদার এখন শুধু ম্লান হাসি,—বাঁচবে না কেউই। কি রাণী কি কানি।

অম্বা রাগ করে,—কিন্তু তোমার এ তত্ত্ব কথা সংসারে খাটে না, বিশুদা।

কেন দিদি? ভাঙা হাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে লাভ কি?

ওদিকে রেবা তখন ছোঁক্ ছোঁক্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কোথায় কি হুট্‌পাট্ শব্দ করে। গান গায়। হয় বা কবিতা আওড়ায়। কিম্বা অন্তত ভাঙা-তক্তায় হাত চাপ্‌ড়াইয়া তব্‌লাও বাজায়।

রেবার জ্বালায় কোথাও শান্তি নেই বিশুদা।

বেশ। ভূতের মুখে রাম নাম।—একটু নীরব থাকিয়া বিশুদা আবার কহিল, শান্তিটাকে আমি বড় ভয় করি, দিদি। চারিদিক নিশুতি হলে যেন বুক চেপে ধরে। সরগরমে থাকাই জীবন—নৈলে ত মরেই আছি।

একমনে মূর্ত্তির উপর আবার তাহার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য চলিতে থাকে।

চট্ করিয়া অম্বা উঠিয়া গেল। কিন্তু রেবার কাছে নয়—অন্য ঘরে। একটু পরে ওদিক হইতে রেবা বাহির রইল,—কোথা গেল অম্বা? চলে গেল বুঝি?

ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া দেখে, অম্বার কোলে রুগ্ণ ছেলে। জানালার দিকে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া।—যেন সমাহিত ভাব।

সমস্ত পাড়াটার মধ্যে অতবড় চঞ্চল মেয়ে নাই। মার ধোর, দুষ্টামি, ইস্কুল পালানো—কোন বিষয়েই পুরুষের চেয়ে খাটো নয়। মাছ ধরিতে, সাঁতার কাটিতে যে-কোনও যুবকের সমকক্ষ। হকি খেলায় ইস্কুলের সব মেয়েদের মধ্যে সে প্রথম। দুষ্ট গরুর শিঙ্‌ ধরিয়া সে নাচিবার চেষ্টা করে।

আজ সে শান্ত। যেন বালকটির সীমায় আসিয়া তাহার সমস্ত চাঞ্চল্যের স্পন্দন একেবারে স্থির।

রেবা হাসিয়া ফেলিল,—ছেলে তোর কানে মন্তর দিলে নাকি?

ঘুমন্ত ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি অম্বা বিছানার শোয়াইয়া দিল।

যেন ধরা পড়িয়া গেছে—

বলিল, কাঁদছিল কিনা তাই একটুখানি—কিন্তু ছেলেটি বিশুদার ভারি শান্ত, না রে?

হুঁ—খুব।

চল্‌ বাড়ী যাই।

রেবার ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়িল—তাই চল্‌। তা ছাড়া যে আছাড়টি আজ হয়েছে তোমার—রাতের বেলায় বিছানায় শুয়ে নিজের গা নিজে টিপো।

অম্বার খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসি,—তা ছাড়া আবার কে টিপবে?

দুর মুখপুড়ি আমি কি তাই বল্‌ছি?

রেবা চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে অম্বা। সে আর একবার মুখ ফিরাইল—ছেলেটি তখন কাৎ হইয়া বিছানায় শুইয়া আছে।

নিজ্জীব, দুর্ব্বল!—অক্ষম শিল্পীর রচনা!

খানিক পরে রেবার পুনঃপ্রবেশ। আসিতে আসিতেই চীৎকার করিয়া অভিনয়।

আপনার খেয়ালেই—

হঠাৎ আসিয়া বিশুদার হাত হইতে বাটালি, উকো কাড়িয়া লইল,—আমি মরব চেঁচিয়ে আর তুমি কাজ করে যাবে? কক্ষণো না।

মহা বিপদ! বিশুদা হাত গুটাইল—কি করব তবে?

গান করতে পার না?

কি গান ভাই?

এমনি যা তা। পুতুল গড় আর গান জান না? ভাল একটি মূর্ত্তি ত গানেরই মতন।

কিন্তু লোকে কি বলবে?

বা—। বলবে আবার কি? গান ত চারিদিকেই ছড়ানো। নদী পাখী ফুল মাটি আকাশ—সবাই ত গান করে। মানুষ ত গানেতেই পাগল!

আমার গান গাওয়া যে সত্যই পাগলামি ভাই। গান গাইতে সকলেই পারে। পারে না পাথর, পারে না মরু। ছেলেটা কাঁদচে বুঝি—

বিশুদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরে গেল।

ছেলের তখন অকাতরে ঘুম। বিশুদা জানলা বন্ধ করিয়া দিল।—ঠাণ্ডা লাগিবে। বালিশটা গোছ করিয়া দিল। ছেলের গায়ে একটি কাপড় ঢাকা দিল। একবার একটুখানি আদর—। তারপর আবার বাহির হইয়া আসিল।

শিষ্ দিতে দিতে রেবার তখন যাইবার পালা।

যেন উচ্ছল ঝরণা—।

মরুপথে পথ-ভোলা জল-বালিকা যেন।

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল—আরে, সবিতা-দি বসে' এখানে চুপটি করে'?

আছি এম্‌নি।—মুখ তুলিল সবিতা।

তাহার কাছে বসিয়া রেবা কহিল, সবিতা-দি—মাপ করবে ভাই? তোমাকে যেন কি সব বলেছিলুম।

কি?

তা মনে নেই। কিন্তু মনের ভেতরেই দোষ করেছি।

মাপ চাও তবে নিজেরই কাছে।

দু'জনেই হাসিল। আর মেঘ নাই—পরিষ্কার।

বাড়ী যাই, ক্ষিধে পেয়ে গেছে।—রেবা উঠিয়া আবার শিষ্ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

ইঁদারার পাশটিতে সবিতা বসিয়া রহিল। পাশেই একটা বেলগাছ।

তারই মাঝে সবিতা যেন গোপন রজনীগন্ধা!

বিশুদা মুখ বাড়াইল—চুপটি করে' বসেছিলে কেন এতক্ষণ?

সবিতার প্রখর দৃষ্টি। কহিল, তাতে তোমার কি?

বিশুদা তাহাকে সমীহ করিয়া চলে। তবুও হাসিয়া কহিল, কিন্তু বাড়ীটা যে আমার।

কঠিন মুখে সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; নিঃশব্দে।

আর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নয়—দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া সটান্ বাহির হইয়া গেল—একেবারে রাস্তায়।

বিশুদা ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আমি তা বলি নি, শোন সবিতা,—এ শুধু হাসির কথা—।

সেও বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু সবিতা তখন নাগালেরও বাহিরে।

মুননা বলে, এ আমি মান্‌তে পারি না।

রেবা বলে, না মান বয়ে' গেল। বিশুদার কাছে আমরা যাবই। ওর কাছে জল না খেলে আমাদের তেষ্টা যায় না।

ইংরেজিতে মুন্‌না বলে, ভণ্ডামি—দুর্নীতি! যে মেয়েরা নিজেদের 'সংরক্ষিত' না রাখে আমি তাদের—

অম্বা তাহার দিকে নিঃশব্দে তাকায়। ইচ্ছা করে ওর গালে দুইটা চড় বসাইয়া দেয়।

মনুনা উকীলের মেয়ে। অঙ্ক জানে ভালো। বলে—

কি ছাই মূর্ত্তি গড়ে ও লোকটা ? না মাথা—না মুণ্ড। ভাল ভাল 'ক্রিটিকে'র পাল্লায় পড়লে নাস্তানাবুদ হতে হত। যেমন ছাঁদ তেমনি ছিরি।—আমার মুখ একটু আলগা—কি না-কি বলে ফেলবো, তাই ত যাই না ওই মিস্ত্রিরিটার ঘরে।

রেবা বলে, তোমার মতন শুকনো রুক্ষ মেয়ে হলে ত ভাই সকলের চলে না, তাদের যেতেই হয়।

যে যায় যাক্ না—আমার কি। তবে যতক্ষণ ঠাট্টা তামাসা করব ততক্ষণ একটা আঁক কষলে বরং—বাবার এক মক্কেল বলেন—

গোল্লায় যাক্ তোমার মক্কেল!—অম্বা আর রেবা উঠিয়া চলিয়া গেল।

বাবার মক্কেলের প্রতি এমন কটূক্তি!

তীব্র দৃষ্টিতে মনুনা সেদিকে চাহিল। কহিল, পুরুষ মানুষকে আমি ঘৃণা করি।

ঝালটা বিশুদার উপরেই—

পায়ে পায়ে সন্তর্পণে বিশুদার ঘরের কাছে সবিতা।—ছেলের জন্য বিশুদা দুধ গরম করিতেছিল।

মুখ ফিরাইয়া কহিল—সবিতা যে, এসো এসো। মনে হচ্ছিল সেদিন রাগ করে' চলে গেলে। সত্যি ?

রাগই ত। দাঁত দিয়া সবিতা অধর চাপিল।

বিশুদা হাসিল—তা হক্। সংলে যেন আমার উপর রাগই করে। একটুখানি তামাসাও করিল—রাগের বাঁ-দিকে 'অনু'টা যেন করো না নাকো।

উঠিয়া গিয়া বিশুদা একখানি আসন আনিল।

বসো সবিতা, সত্যি কথা বলতে কি—তোমাকে একটু ভয় করি ভাই।

আসন পাতিয়া দিল।

একটা পা দিয়া সবিতা আসনটাকে অন্যদিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, দরকার নেই খাতিরে।

বিশুদা মুখ তুলিয়া চাহিল।—ভয়ে কাঠ!

সবিতার ভ্রূক্ষেপ নাই। কহিল, কাজ কর্ম তোমার চলে কি করে' ?

বিশুদা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা এমনি—এমন আর কি কাজ। শুধু ছেলেটা—তা যা হক করে'—

ছেলের একটা ঝি দরকার হয় না ?

নু-নাঃ।

এদিক ওদিক তাকাইয়া সবিতা বলিল, আমার নামে রেবা যে এসে তোমার কাছে বলে, তা শুনেছি। গায়ে গায়ে বাড়ী, চোখ কান সবই থাকে এদিকে।

ও—। বিশুদা আড়ষ্ট। বলিল, কিন্তু রেবা ত এমন বিশেষ কিছুই—

তা জানি। হঠাৎ হাসিয়া সবিতা কহিল, কিন্তু আমার হয়ে তুমি ওদের কাছে ওকালতি কর কেন? আমার নিন্দে বুঝি তোমার গায়ে লাগে?

সবিতা হাসে কিন্তু জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকে তার দুটি চোখ। সন্ধ্যার অন্ধকারেও বিশুদা দেখিতে পায়।

হঠাৎ ছেলেটা কাঁদিয়া বাঁচাইল।

যাই রে যাই।—বিশুদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলাইল।

পিছন হইতে সবিতার শুষ্ক কঠিন কণ্ঠ,—ছেলের এতটুকু কান্নাও বুঝি সহ্য হয় না?

উত্তর পাইল না।

একটু পরে বিশুদা বাহির হইয়া আসিল। ছেলে শান্ত হইয়াছে।

দেখে—মেঝের উপর দুধের বাটি উল্টানো, জলের ঘটিটা গড়াগড়ি, খাবার ছিল ঢাকা—এখানে ওখানে ছড়ানো; জলে-দুধে-খাবারে একাকার চারিদিক।

অভিভূতের মত সে কহিল, কে বলে?

এক-পা এক-পা করিয়া সবিতা বাহিরে যাইতেছিল, বলিল—আমি।

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল।

সবিতা চলিয়া গেছে—

বিশুদা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিল। সুমুখের অন্ধকার বেলগাছটা। কহিল, উপোস করবে আজ রুগ্‌ণ ছেলেটা? আর ত কিছু নেই।

সংসারে ওই তৃণটিই সম্বল তাহার।

অম্বা আর ইস্কুলে যায় না। দেখা মেলা ভার। হঠাৎ সে দলছাড়া।

দুপুর বেলা সেদিন সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিল। পশ্চিমের এদেশে মেয়েদের বাঁধাবাধি বিশেষ নাই।

রূপলোভী পুরুষেরই কি অভাব? ওরা স্বর্গে গিয়াও উর্ব্বশীকে দেখে।

দূর ছাই—। অম্বা আবার ফিরিয়া চলিল।

গলিঘুঁজি পার হইয়া বরাবর গঙ্গার ঘাটে।

শীতকাল—তবু রৌদ্রটা খুব তীক্ষ্ণ। ঘাটে আসিয়া অম্বা একবার দাঁড়াইল।

গঙ্গার এপার ওপার অনেকখানি চওড়া। কিন্তু সবটা জল নয়—ওপারের প্রায় অর্দ্ধেকটা বালির চড়া। সূর্য্যের আলোয় দূর হইতেও চক্ চক্ করিতেছে। দূরে ছোট ছোট দু-একখানি নৌকা।

ওপারে রাজার প্রাসাদ—রামনগর।

ঘাটে লোকজন কেহ নাই। শুধু একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল।

অম্বা ঘাটে নামিল। জামাকাপড় সুদ্ধ একেবারে গলা জলে। অন্যদিন সিঁড়ি হইতে ঝাঁপাইয়া জলে পড়িত; আজ নিয়ম-ভঙ্গ।

সাঁতার কাটিতেও অরুচি। ধীরে সুস্থে স্নান সারিয়া সে উঠিয়া আসিল।

কাপড়ের একধারে মাথা মুছিল। জল ঝরাইল। তারপর রাস্তায় উঠিয়া আসিল।

মেয়ে যেন কত শান্ত।

বাঁ-হাতি কালি মন্দির। ভিতরে ঢুকিল। আঁচল হইতে পয়সা খুলিয়া পুরোহিতের কাছে রাখিয়া বলিল, ফুল নৈবিদ্যির জন্যে দিলুম। একটু পেসাদ দাও ত ঠাকুর।

প্রসাদ হাতে লইয়া অম্বা এদিক ওদিক চাহিল—কেহ কোথাও নাই। চট্ করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

এবারেও বাড়ীর পথে নয়—অন্যদিকে।

অপরাহ্ণ বেলায় সটান্ বিশুদার ঘরে।

কাহারও সাড়া নাই। তাড়াতাড়ি সে ঘরের ভিতর ঢুকিল।

রুগ্ণ ছেলেটা যেন কেমন-কেমন। মুখখানা রক্তহীন, চোখ দুটা ঝাপ্সা, গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ—যেন কি রকম। চিঁ চিঁ করিয়া অস্পষ্ট কথা বলে, হাত পা বিশেষ নাড়ে না—ভিতরে কোথায় যেন তলাইয়া থাকে।

অম্বা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। কাপড় চোপড় তখনও ভিজা। আবার তাহাকে বিছানায় শোয়াইল। পরে প্রসাদী ফুলগুলি তাহার মাথায় ঠেকাইয়া বিছানার উপরেই ছড়াইয়া দিল।

বাঁ-হাতে ছিল ডাক্তারী ঔষধ। শিশির ছিপি খুলিয়া সে একদাগ খাওয়াইল। বিছানা ভাল করিয়াই প্রস্তুত। সে আর একবার ঝাড়িতে মুছিয়া দিল।

এমুনি করিয়া যত্নের আর অন্ত নাই।

এ যত্ন যেন মায়েরও নয়—ভগ্নীরও নয়; এ যেন অন্যরূপ।

ছেলেটা চোখ চাহিয়াছিল, অম্বা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, কে আমি বল্‌তে পারো?

তুমি? কেউ না।

সময় কাটিতে থাকে।

ঘরে ঢুকিল বিশুদা। দেখে—ছেলের কাছে বসিয়া অম্বা। বিছানায় ফুলের গন্ধ চারিদিকে।

অম্বা-দিদির খবর কি গো? ফুলশয্যে নাকি?

ধড়মড় করিয়া অম্বা উঠিয়া পড়িল। বিশুদার আসা টের পায় নাই।

বলিল, ছেলেকে এক্‌লা রেখে তোমার এমন রোজগার নাই-বা হ'ল বিশুদা?

এক্‌লা? এমন দরদী আছে জান্‌লে বাড়ীই আসতুম না আজকে।

কি যে বল তুমি।—লজ্জায় অম্বার মাথা হেঁট।

বিশুদার মৃদু হাসি,—ছেলে আছে কেমন?

ভালই—সেরে যাবে।—অম্বা বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়।

ছাদের পাঁচিলের কাছে দাঁড়াইয়া সবিতা সবই দেখে।—বিশুদার সংসার চলে

ছেলের বিশুদার চোখে জল আসে। সবিতা তাহাও অনুভব করিতে পারে

ঠুক্‌ঠুক্‌ করিয়া সেদিন বিশুদা কাজ করিতেছিল আপন মনেই,—সবিতা ভিতরে আসিল।

ইঁদারার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—। অনেক নীচুতে জলের ভিতর নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিল।—দেখিয়া হাসিল। বিশুদার চোখা-চোখি হইলে রাগ।

হয় ত অকারণে বাল্‌তিটার শব্দ করিতে থাকে। ঘটিবাটিগুলা পা দিয়া এধার ওধার ছুঁড়িয়া দেয়। ইঁদারার বাঁধুনির উপর হাত চাপ্‌ড়াইয়া আওয়াজ করে। বিশুদার মনোযোগ নষ্ট হইলে সে খুশী হয়।

দেখিয়া দেখিয়া বিশুদা হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু কথা বলিতে সাহস নাই।

কিন্তু তাহার কাজও আর হয় না—ছেলের তদ্বির করিতে উঠিয়া যায়।

সবিতা গিয়া ঘরে উঁকি মারিল। দেখে—ব্যাকুলভাবে বিশুদা ছেলেকে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া আছে।

সন্তানের বন্ধন আরও দৃঢ় হউক!

সবিতার কঠিন হাসি। সরিয়া আসিল। সম্মুখে অসমাপ্ত মূর্ত্তিটা। হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের নখে করিয়া সেটা আঁচড়াইতে লাগিল।

পাথরে আঁচড় চলে না।

কাছেই খোদাই করিবার যন্ত্রগুলি;—তাহাই আঁচলের মধ্যে কুড়াইয়া লইয়া ওধারে চলিয়া গেল।

এক জায়গায় আসিয়া বসিল।—দাঁত দিয়া অধর চাপা।

বিশুদা যখন বাহিরে আসিল, দেখে—যন্ত্রপাতি উধাও। বুঝিতে পারিল; হাসিয়া বলিল, বা রে বা! গেল কোথায় এগুলো? একেবারে ভৌতিক।

সবিতার দিকে চাহিল—উত্তর নাই। বিধবা মেয়েটা এবার শুধু মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

থাক্‌ তবে,—এখন আর কাজকর্ম্ম কিছু হবে না। মুখ হাত ধুয়ে এখুনি ছেলের ওসুধ আন্‌তে যাবো।—চঞ্চল হইয়া বিশুদা আর একদিকে পা বাড়াইল।

সবিতার তৎক্ষণাৎ রাগ। যন্ত্রপাতিগুলি আঁচল হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিল,—আমি ত আর নিই নি।

বিশুদার কানে গেল না কথাগুলি। যখন মুখ হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিল—সবিতা তখন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া।

বেরিয়ে যাচ্ছো, ছেলে দেখবে কে?

ছেলে ঘুমিয়েছে। বিশুদা বলিল।

যখন জাগ্‌বে?

তৎক্ষণে আমি এসে পড়বো।

সবিতা নিরুপায়। হঠাৎ বিশুদার বাহির হইবার জামাটি টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

'শোন সবিতা শোন'—আমায় বেরোতে হবে এখুনি,—বিশুদা আগাইয়া আসিল।

সবিতা শুনিল না। দূরে সরিয়া গেল ;—আড়ালে। কোলে জামাটি লুকানো। মুখে হাসি।

বিশুদা অগত্যা যন্ত্রপাতির দিকে চাহিয়া বলিল,—থাক্ তবে, আবার কাজ কর্ত্তেই লেগে যাই।

কাজে-কাজেই কাজে বসিয়া গেল।

হাসি মিলাইল সবিতার মুখে। জব্দ করিতে গিয়া নিজেই অপ্রস্তুত। দ্রুতপদে আসিয়া জামাটি ছুঁড়িয়া দিল। আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

বুকের মধ্যে রুদ্ধ কান্নার প্রচণ্ড আবেগ। পথে পড়িয়া মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল।—কান্নায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে।

ঘরে দাদা আর বৌদি। পুরুষ মানুষ হইলে বৌদির পাকা-দাড়ির বয়স। ওদের সংসারে সবিতা খাটে-খুটে—আর থাকে। একবেলা রান্না। দীর্ঘ অবসর। সময় নাই, অসময় নাই,—বিশুদার ওখানে যাতায়াত।

পা টিপিয়া টিপিয়া আসে, লুকাইয়া চারিদিকে তাকায়, আবার চলিয়া যায়। কিন্তু বিশুদার নজরে পড়িলে অন্যরূপ। তখন আর বিড়ালের পা নয় ;—হস্তিনীর। বিশুদা ফিরিয়া তাকায় কিন্তু পরস্পর নির্ব্বাক।

কথা কয় না বলিয়া সবিতার রাগ হয়। অন্যপথে দৃঢ়পদে ঘরে গিয়া ঢোকে। কিন্তু কিই-বা। তখন হাতের কাছে যা পায়। সেলাই করা কাপড়খানার সেলাই ছিঁড়িয়া রাখে, খাবার জল ফেলিয়া দিয়া খালি কলসি উপুড় করিয়া দেয়, লণ্ঠনটা মুচড়াইযা দুমড়াইয়া যা-তা করে, গায়ের জামাটা জলে ভিজাইয়া দেয়।—এমনি সব মারাত্মক দৌরাত্ম্য।

বিশুদা অন্যদিকে চাহিয়া বলে, উঃ—দুপুর বেলা একটু হাওয়া নেই···গুমোট।

সবিতা তীরবেগে গিয়া হাতপাখাটি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতে থাকে।—তারপর একেবারে জানালার বাহিরে।

কিন্তু বিশুদা না করে প্রশ্ন—না দেয় উত্তর।

সবিতা বদ্‌রাগী : ধুলা লইয়া বিশুদার খাবারে ছড়াইয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়।

ছেলের অবস্থা এখন একটু ভাল। ডাক্তারী ঔষধের গুণ।

বিশুদার আহ্লাদ ধরে না। আধমরা মনে রঙের ছোপ ধরিয়াছে। দিনরাত কাজ কাজ করে, আপন মনে গানও গায়।

ছেলের কাছে গিয়া বলিল, ভাল হয়ে কি খাবি গোপাল?

গোপাল বলিল, ঝোল খাবো—আর—

ঝোল ? পাঁঠার বুঝি ? আচ্ছা তাই তাই।

হাসিয়া আবার বলিল, তোমার মায়ের নামটি কি ছিল গোপাল ?

মায়ের নাম গোপাল শিখে নাই।

করবী, বুঝলি ?—করবী। মরে গেছে তবু নাম এখনও কানের মধ্যে সর্বদা—

দালানের কোণে করবীর একটি পাষাণমূর্তি দাঁড়াইয়া। তাহারই হাতের তৈরী। যেন অবিকল। শুধু প্রাণটুকু চুরি গেছে। সেই হাসি। সেই চুল। সেই হরিণীর মত বড় বড় কালো দুটি চোখ ;—নীলপদ্ম।

বিশুদা বিহ্বল। পাষাণীর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, করবী।

অথচ আজ এতখানি উচ্ছ্বাসের কৈফিয়ৎই বা কি ?

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ছেলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিশুদা গান গাহিতে গাহিতে তাহাকে আদর করে। দূরে সরিয়া দিয়া বলে, এসো ত গোপালমণি হেঁটে হেঁটে ?

নড়্ বড়্ করিয়া গোপালমণি তাহার কাছে হাঁটিয়া যায়। রোগের পর নূতন পা।

সেদিন সবিতা আসিতেই বিশুদা একেবারে উচ্ছ্বসিত।

দেখছ সবিতা দেখছ—ছেলে আমার কেমন হাঁটতে পারে ?

দেখেছি—সবিতা বলিল। কিন্তু ফিরিয়াও তাকাইল না।

বিশুদা আপনার আনন্দেই বিভোর। সবিতা বলিল, ছেলে বুঝি খুব আদুরে ?

আদর আর কই করতে পারি। ওর মা মরবার পর—তখন আমি আসিনি এদেশে—সেই থেকেই ত ওর রোগ।

বৌ তোমার বুঝি খুব সুন্দরী ছিল ?

সত্যি—খুব। তোমার চাইতেও—না না তা নয়, তবে এই—তোমারই মতন—

কোথায় সে ?

এবারে বিশুদার হাসি,—জানো তুমি, তবু জিজ্ঞেস করছ সবিতা।

সবিতা এদিক ওদিক তাকাইয়া কহিল, রান্না হবে না তোমার ?

দাঁড়াও, আগে যাবো কালী-মন্দিরে পুজো দিতে, তারপর ডাক্তারখানায়, সেখান থেকে এসে, তবে বাজার হাট—

ছেলের ওপর দরদের যে আর সীমা নেই ?—ফরফর করিয়া সবিতার প্রস্থান।

ছেলেকে একদফা খাওয়াইয়া, বিছানায় শোয়াইয়া, জুতা জামা চড়াইয়া বিশুদাও বাহির হইল।

খানিক পরে সবিতা আবার আসিয়া হাজির। কেহ কোথাও নাই। একবার সে চারিদিকে চাহিল। তারপর সমস্ত বাড়ীটাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুমুখে পাষাণ প্রতিমা। একবার দাঁড়াইয়া দেখিল,—ক্রূর দৃষ্টি। আবার চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—ছেলেটা ঘুমাইতেছে। দুর্বল ছেলে।

বিছানার উপর ঝুঁকিয়া ছেলেকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। টের না পায়। না ছেলে—না বাইরের লোক। চুরি করিয়া দেখা।—নিজের কাছেই চুরি!

সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল—পারিল না। একটিবার ছেলের গায়ে হাত রাখিল। নরম গা। তুল্ তুল্ করে—এমনি মোলায়েম।

হাত আর সরানো যায় না। যেন বাঁধা পড়িয়াছে।

ধীরে ধীরে তাহাকে সবিতা কোলে তুলিয়া লইল।

মাতৃহীন! অন্ধকার দুর্গম এই চলাচলের পথে পরিত্যক্ত।—অভাগা!

চোখ জ্বালা করিয়া সবিতার চোখে জল গড়াইয়া ছেলের গালে পড়িল। তাহাকে নামাইয়া আবার সে বাহিরে আসিল।

কাজের ফেরতা বিশুদা ফিরিল। দেখে—ছেলে ঘরে নাই! এদিক ওদিক দেখিয়া রান্নাঘরে আসিল—সে এক কাণ্ড। রান্না চড়িয়াছে, কুটনো বাটনা,—সব প্রস্তুত। সবিতার কাছে বসিয়া গোপাল খাইতেছে।

বা—। এমন ত জানতুম না? আসবার আগেই যে তুমি—

সবিতা কহিল, আমিই সব আনিয়েছি—আমিই-—

আগে যদি জানতুম তুমি এমন করে'—

অনেক কিছুই জানো না তুমি।

তা বটে সবিতা, কিন্তু—এ যে—ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বিশুদা ঘরে উঠিয়া আসিল!

প্রকাণ্ড একটা অভাব চোখের সুমুখে!

নদী ছিল, তরঙ্গ ছিল,—আজ কিছু নাই; শুষ্ক! শীর্ণ রুক্ষ বালির চড়া—ধু ধু! তাহারই ভিতর হইতে আজ একটা ভয়ংকর সরীসৃপ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। ক্ষুধা পাইয়াছে তাহার, তৃষ্ণার জিব বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

বিশুদার গলা বুজিয়া আসিল।

খানিক পরে গোপালের নাম করিয়া সে আবার রান্নাঘরের কাছে আসিল,—আয় রে আয় আমার কাছে।

গোপাল উঠিতেছিল—ঝুপ করিয়া সবিতা তাহাকে কোলে টানিয়া লইল। যেতে দেব না।

থাক্ থাক্—তবে থাক্। মায়ের মতন হয়েছে কিনা। বিশুদা আবার পিছন ফিরিল।

কিন্তু সবিতা তৎক্ষণাৎ কোল হইতে ছেলেকে নামাইয়া দিল। হাতের সব কাজও পড়িয়া রহিল।

হঠাৎ ছুটিয়া গেল সে কুটনো কুটিবার বঁটিখানার কাছে। কি একটা কুটিতে গিয়া বাঁহাতের একটি আঙুল কাটিয়া ফেলিল। বিশুদার অলক্ষ্যেই।

ফিন্‌কি দিয়া রক্ত!

উঠিয়া আসিল। আঙুলটা দেখাইয়া বলিল, কেটে গেল বঁটিতে। যে ধার—

আহা হা, তাইত—ইস্, আমার জন্যেই ত এমন—বিশুদা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সবিতার মুখে মৃদু হাসি। বলিল, ওষুধ নেই? দাও না, একটু দাও না বেঁধে আঙুলটা ভাল করে'—

নিটাল সুন্দর বাঁ-হাত। বিশুদার হাতের কাছেই হাতখানি সরিয়া আসিল। চট করিয়া বিশুদা সরিয়া গেল। কহিল—কাটার ওষুধ? দেখি আছে বুঝি আমার কাছে। ছেনি হাতুড়ি নিয়ে কাজ করতে হয় কি না—অনেকটা কাটলো বুঝি?

হুঃ—অনেক।—সবিতা বলিল—ছুঁতে ঘেন্না করে নাকি আমাকে?

বিশুদা চলিয়া গেল।

কিন্তু ঔষধ আসিল না।

সবিতা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। তবুও বিশুদার দেখা নাই। তারপর নিজেই সে উঠিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল—চোরের মত বিশুদা বসিয়া আছে।

কই, ওষুধ দিলে না?—সবিতার কঠিন মুখ আরও কঠিন।

বিশুদা মুখ তুলিল। কহিল—সবিতা, তুমি যাও।

যাবই ত। ওষুধটা দিই আগে। ডান-হাতে ছিল খানিকটা নুন, তাহাই সবিতা ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিল।

ব্যাকুল হইয়া বিশুদা একবার তাহার হাতটা ধরিতে গেল—কিন্তু ধরিল না, নিজেই আবার সরিয়া আসিল।

যন্ত্রণায় বিকৃত সবিতার মুখ! হাসিয়া কহিল—এতেই সারবে।

রুদ্ধকণ্ঠে বিশুদা ছেলেকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। চোখের সুমুখে তাহার সব ধোঁয়া।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দ।

বিশুদা স্নান করিতে আসিল। দেখে,—মুখ গুঁজিয়া সবিতা রান্না-ঘরের দ্বারে বসিয়া আছে, কোথাও যায় নাই।

কাছে আসিয়া কহিল—কি হ'ল আবার?

উত্তর নাই।

রান্নাঘরে বিশুদা উঁকি মারিল—কিছু বুঝিল না। পাশ কাটাইয়া ভিতরে ঢুকিল।

একেবারে অবাক। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখিতে লাগিল,—ডাল, ভাত, তরকারি, দুধ, মিষ্টি চারিদিকে ছড়ানো। উনানে জল ঢালা,—ঘরময় ছাই উড়িয়া অন্ধকার। থালা, ঘটিবাটি এখানে ওখানে গড়াগড়ি। চারিদিক একাকার—মৈ-মাড়ন্।

কিন্তু বিশুদা বাহির হইবার অবসর পাইল না। অকস্মাৎ সবিতা উঠিল; দুই হাতে দরজার দুইটা কবাট ধরিয়া পথ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

তেমনি করিয়া অধর চাপিয়া মেয়েটার টিপি টিপি নির্বাক হাসি।

বিশুদা কহিল—বল না কি চাও? বল না?

সবিতা কথা কয় না—শুধু হাসে।

থাকো তবে দাঁড়িয়ে; আমিও বসে থাকি এইখানে।

তাই থাকো।—কপাট দুইটা টানিয়া শিকল বন্ধ করিয়া সবিতা প্রস্থান করিল।

বন্ধ দরজায় বিশুদা হাত চাপড়াইতে লাগিল—খোল, দরজা খুলে দাও—

খানিকক্ষণ পরে—

ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া শিকল খুলিয়া গেল।

কিন্তু সবিতা নয়—অম্বা! একেবারে মুখোমুখি।

অম্বা হাসি চাপিল—শেকল দিয়ে গেল কে তোমায় বিশুদা?

কি জানি ভাই, বোধ হয় সবিতাই হবে। যেমন ছেলে মানুষী কাণ্ড তোমাদের!

তা বলে একেবারে শেকল? আমাকেও হার মানলে যে!—অম্বা কিন্তু রান্নাঘরের ভিতর তাকাইল না।

তোমার সবিতা বন্ধুটি কোথায় গেল, অম্বা-দিদি?

তা ত জানি নে।

বিশুদা নীরব। অম্বা কহিল, ছেলেটা কাঁদছিলো যে এতক্ষণ।

কাঁদুক গে ভাই। দিনরাত ওর কথা আর ভাল লাগে না।—বিশুদা ইঁদারার কাছে গিয়া বসিল।

অম্বারও যেন অন্য কাজ আছে। ঘরের ভিতর উঠিয়া আসিল। ছেলে তৎক্ষণে শান্ত!

তাহার কাছে আসিয়া বসিল। গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল, ভাল আছ?

গোপাল ঘাড় নাড়িল।

আসবে আমার কোলে?—অম্বা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। পরে ছেলের মুখের উপর নিজের মুখ রাখিল। তারপর গাল দুটি ধরিয়া কহিল—বড় হয়ে আমায় কি বলে ডাক্‌বে?

ছেলে মুখের দিকে তাকায়! কিন্তু কথা বলে না।

নাম ধরে ডেকো, কেমন? ছেলেকে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিল, এমনি করে আমাকেও খুব আদর করো, বুঝলে?

একবার ছেলেকে নামাইয়া দেয়—আবার কোলে তুলিয়া লয়। এম্‌নি বার বার!

সমস্ত হৃদয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া ছেলেটিকে জড়াইয়া ধরে। বুকের উপর যেন পিষিয়া মারে।

বার বার সে শুধু মাত্র অনুভব করিতে চায়—সে নারী!

আর যাহাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে—সে পুরুষ!

অম্বা একেবারে বিহ্বল! ঘুরায় ফিরায় দোলায়—আর ছেলেকে দেখে। আবার আদর করে। তারপর যত্ন করিয়া নামাইয়া দিল। যাইবার সময় দেখে—ইঁদারার

পাড়ে বসিয়া বিশুদা। মুখোমুখি হইল, কিন্তু কথা বলিবার মন কাহারও নয়।

আহ্লাদীর বিয়ে—। রেবার নাম আহ্লাদী। যে শুনিল সেই গেল। আহ্লাদী বড় আদরের।

ছেলে-কাঁধে বিশুদাও গেল।—রেবাদিদির সশরীরে নিমন্ত্রণ।

গেল না মুননা। কোন পরিচ্ছদটি পরিয়া গেলে তাহাকে সুন্দর দেখাইবে—তাহা সে অংক কষিয়া বাহির করিতে বসিয়া গেল। কিন্তু কিছুতেই তাহার পছন্দ হইল না। তখন বলিল, একটা আঁক নিয়ে ব্যস্ত আছি। তাছাড়া যারা হ্যাংলার মত নেমন্তন্ন খেতে যায়, আমি তাদের ঘৃণা করি। বাবার এক মক্কেল বলেন—

বাবার মক্কেলকে কেহ গ্রাহ্য করে না।

আর গেল না সবিতা। তাহার বাড়ীর সকলে গেল। সেও বাহির হইল কিন্তু মাঝপথ হইতেই ফিরিল।

নিমন্ত্রণ সারিয়া বিশুদা ফিরিল। কাঁধে গোপাল।—অনেক রাত।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল—রাঙা আলো। প্রদীপের নয়, আগুনের আভা! চারিদিকে পোড়া গন্ধ।

সে কি!—বিশুদা ঘরের কাছে আসিল। অকস্মাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। পট পট করিয়া শব্দ। ভিতরে আগুন। আর সেই আগুনের কাছে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আগুনেরই শিখা,—সবিতা।

গোপালকে এক জায়গায় নামাইয়া বিশুদা ছুটিয়া আসিল।—সরো সরো, পথ ছাড়ো—ছারখার হয়ে গেল যে।

সবিতা পথ ছাড়িল না। দুই হাতে ঘরের পথ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। কহিল—যাক।

পুড়ে যাবে অমনি করে ঘর দোর জিনিস পত্তর?

হ্যাঁ পুড়ুক। বাইরের আগুনটাই কি এত বড়?

বিশুদা ছটফট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল কিন্তু সবিতা পথ দিল না। ততক্ষণে ঘরের যা কিছু সব পুড়িয়া গেছে।

হাওয়া পাইলে আগুন উড়িয়া বেড়ায়। একপাশে ছিল করবীর প্রতিমা। অতি যত্নে পাষাণ মূর্তিতে কাপড় চোপড় পরানো। তাহাতেও আগুন ধরিল। বিশুদা ঘুরিয়া যাইতেই সবিতা তীরবেগে গিয়া পথ আগলাইল।

পথ ছাড়ো সবিতা—পথ ছাড়ো, পায়ে ধরি তোমার—

সুন্দর সুডৌল ডান-পাখানি সবিতা বাড়াইল—ধরো পায়ে।

পায়ে আলতার দাগ। তাহাও আগুনের রঙ। বিশুদা পিছাইয়া গেল। সবিতা হাসিয়া কহিল, এখনও ছোঁবে না? ছুঁলে দোষ হয় বুঝি?

করবীর মূর্তি তৎক্ষণে পুড়িয়া পুড়িয়া কালো। বিশুদা কাঁপিতেছিল। বলিল, হ্যাঁ।

তবে ছেলে পাবে না—যাও। আমার ছেলে।—হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া সবিতা গোপালকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

বিশুদা আর পারিল না। ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গোপালের একটা হাত ধরিল। বলিয়া উঠিল—ছেলে তোমার নয়, আমার।—হাত ধরিয়া সে গোপালকে টানিয়া লইল।

তোমার?—বেশ।—সবিতা নিঃশব্দে চারিদিকে একবার তাকাইল তারপর অন্ধকারে বাহিরে আসিয়া পথে নামিল। দুই চোখে তার দুই ফোঁটা আগুন।

ওদিকেও আগুনের ক্ষুধা মিটিতে চায় না। পাথরের ঘর—তবু জ্বলিতে থাকে।

গোপাল ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। বিশুদা তাহাকে বুকে লইয়া আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল।

* * *

মন দিয়া বিশুদা আবার কাজ করে। কিন্তু মন থাকে না।

কোথায় অসমাপ্ত মন্দির। তাগিদের পর তাগিদ আসে সেখান হইতে। কিন্তু কাজ কর্মে বড় গোলমাল হইতে লাগিল। ভিতরের শিল্পী যেন পথ ভুলিয়া অন্যপথে গেছে।

তবু চেষ্টার অন্ত নাই।

যন্ত্রপাতি লইয়া বিশুদা আবার বসিল। আবার করবীর মূর্তি গড়িতে হইবে!

পাথর খোদাই চলিতে লাগিল।

করবী!—স্বপ্ন শুধু করবীকে লইয়াই। মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্ম!

দেহের সব গড়নগুলি ঠিক ঠিক হইল,—মুখখানি কেবল বাকি। যত গোলমাল এই খানেই।

ছেনি দিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া দাগ কাটিতে থাকে আর মানসসরোবরের দিকে তাকায়।

চুলগলি তেমনি হয়, কিন্তু কপালটি? ভুরু দুটি ত হইল না।—আবার কারিকুরি চলিতে থাকে।

চোখ দুটি হয়। নাকটিও এক রকম করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ঠোঁট দুটি? হাসিটি?—বিশুদার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকে।

কি যেন কোথায় হারাইয়া গেছে।—

ক্লান্ত মন। ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি—সুনিবিড়। উপরে দ্যুতিপাণ্ডুর আকাশে ফটফটে তারা। কোটি কোটি দীপ্ত চক্ষু শুধু তাহারই দিকে। বিবশ-বিহ্বল চাঁদের আলো ব্যথায় আতুর। দূরে অস্পষ্ট শাদা বাড়ীগুলি মায়াপুরীর মত।—

বিশুদার অর্ধজাগ্রত দৃষ্টি কাঁপিতে থাকে।····· ভুখারী অন্তরাত্মা বন্দীশালার বন্ধ দুয়ার আঁচড়ায়। পাথরে দাগ কাটে।

তা হ'ক—। বিশুদা আবার ফিরিয়া আসিল। আলো জ্বালিল। তারপর একমনে বসিয়া গেল।

কাজ শেষ হইল ; মোরগও ডাকিল।

নিখুঁৎ মূর্তি এইবার। চমৎকার! ধ্যান আসিয়া আকারে ধরা দিল।

ম্লান প্রদীপ ম্লানতর হইয়া নিবিয়া গেল।

দিনের অস্পষ্ট আলো—

ক্লান্ত চক্ষুদুটি রগড়াইয়া বিশুদা উঠিয়া দাঁড়াইল। এক মুখ হাসি। সমস্ত ক্ষোভ মুছিয়া গেছে।

বাহিরে গেল। মুখে চোখে জল দিল। ছেলেটা তখনও অকাতরে ঘুমাইতেছে।

······সুন্দর প্রভাত! দূরে উষসীর শুভ্র ললাটে ব্যাধের বাণ বিঁধিয়া রক্ত ঝরিতেছে। আরক্ত মুখখানিতে শুকতারার উজ্জ্বল অশ্রু বিন্দুটি!—পাখী ডাকে না? সলজ্জ মধুর গন্ধটুকু কার? নিপিগন্ধার শেষ মিনতি বুঝি?

বাকি কাজটুকু সারিতে সে আবার বসিল।

কিন্তু একি! অকস্মাৎ বিশুদা শিহরিয়া উঠিল।

সদ্য-সমাপ্ত মূর্তিটি,—এ ত' করবীর নয়! কে এ?

অথচ চেনা মুখ, চেনা দুটি চোখ, চেনা হাসি,—সবই চেনা!—কিন্তু করবী ত নয়!

সমস্ত হৃদয়, সমস্ত মন দিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিল—সে যে সবিতা। সবিতাই ত বটে! বিশুদা উন্মাদের মত উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। কপালের শিরাগুলি স্ফীত, ক্ষুরধার দৃষ্টি। নিজের কাছে নিজে অপরাধী।

নিজের ভিতরেই কি একটা ঘুমভাঙ্গা বস্তুর প্রতি সে তাকাইতে লাগিল।

এবার বিশুদার পথের জীবন। ঘর দোর আর ভাল লাগেনা না।—প্রলোভনের পঙ্কিল বাতাসে বিষজর্জর।

ঘরে অক্ষম দুর্বল সন্তান। তাও যেন একঘেয়ে।

সে চায় দূর-দুর্গম পথ। নিজের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা।

কিন্তু ক্ষুধা আছে—তৃষ্ণা আছে। ছেলেটার তদ্বিরও দরকার।

সারাদিন বাধে ঘরে ফিরিল। হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল—ভিতরে চীৎকার!

অম্বার গলা। বিশুদা ছুটিয়া ঘরে আসিল। অম্বা ছুটাছুটি করিতেছে। বলিল, শিগ্‌গীর দেখ বিশুদা, ছেলে কেমন করছে। আমি এসে দেখি যে—

বিশুদার পা অবশ। দেখে—ছেলেটা ছটফট করিতেছে, হাত পা বাঁকিয়া গেছে, মুখ দিয়া শব্দ বাহির হয় না,—দুইটা চোখই কপালে তুলিয়াছে।

ডাক্তার! কিন্তু কেই-বা ডাক্তার ডাকে। ছেলেকে চাপিয়া ধরিয়া বিশুদা চীৎকার করিল—গোপাল?

আর গোপাল! ঘরময় শুধু তার বিদ্রূপাত্মক প্রতিধ্বনি। ছেলের তখন শেষ অবস্থা। শক্ত শীর্ণ আঙুলগুলি দিয়া পিতাকে আঁকড়াইতে চাহিল, প্রাণপণে সাড়া দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু শক্তি কই! বিছানার উপর আবার ঢলিয়া পড়িল। নিঃশব্দ—নিস্পন্দ।

বিশুদা, ও বিশুদা—ছেলে গেল যে?

বিশুদা পাথর। মরা ছেলেকে অম্বা জাপ্‌টাইয়া ধরিল। বলিল—ও বিশুদা, শুনছ?

শনছি—তা আমি কি করব অম্বা? গেল মরে! গেল ত গেল···যাক। আমি কি করব!

ঘার নাড়িতে নাড়িতে বিশুদা চলিয়া গেল।

অম্বা ত কাঁদে না,—কাঁপে।

তারপর—। সে কথা কেহ ভাবে নাই। বিশুদার বিদায়।

অলক্ষ্যে বিশুদা বাহির হইল। হাতে একটি পুঁটলি।—সন্ধ্যাকাল।

বাঁ-হাতি রাস্তায় নামিয়া বরাবর গঙ্গার পথে। রাস্তায় তখনও আলো জ্বলে নাই।

অনেকদূরে গিয়া ডান দিকে। রাস্তাটি একেবারে গঙ্গার কোলে গিয়া মিশিয়াছে।

ঘাটে নামিয়া চুপ করিয়া বিশুদা দাঁড়াইল। নদীর ওপারে পূর্ণিমার চাঁদ। সুমুখে জল স্থির,—ভিতরে শুধু অবিরাম কল্‌কল্‌ শব্দ। সোনার মত চাঁদের আলো তাহারই উপর।

ঘাট জনহীন। শুধু দূরে একটা জ্বলন্ত চিতা। তাহারই কাছে বসিয়া একটা হিন্দুস্থানী কানে হাত চাপিয়া দেহতত্ত্বের গান করিতেছিল।

চিতা!—আর একটা উহারই পাশে। ওইটিতে তাহার সংসারের একটি মাত্র বন্ধন জ্বলিয়া পুড়িয়া গেছে!

পিছনে কে দাঁড়াইয়া!—এ কি, সবিতা!

আসছিলে বুঝি পেছনে পেছনে?

হুঁ।

যেন উন্মাদিনী; উপর দিয়া ঝড় গেছে, ঝঞ্ঝা গেছে, প্রলয় গেছে।

কি চাও সবিতা?

অব্যক্তকণ্ঠে সবিতা কহিল—আমিই মেরেছি, আমিই—বিষ খাইয়ে—

বিশুদা ফিরিয়া তাকাইল। অকস্মাৎ হো হো করিয়া হাসি—তাই নাকি? বিশ্বাস করতে হবে এ কথা?

বিশুদা সব পারে—এ-কথাটি শুধু বিশ্বাস করিতে পারে না।

ধুলো-বালির উপর সবিতা বসিয়া পড়িল। বিশুদা কহিল, শেষ বেলায় সে ত অম্বাকে ডাকে নি—আমি জানি—তোমাকেই সে চেয়েছিলো। সবিতা, তুমিই তার মা।

সবিতা পা ছুঁইবার চেষ্টা করিতেই বিশুদা সরিয়া দাঁড়াইল—ছোঁবার সময় এখনও াসে নি, সবিতা।

অস্ফুটকণ্ঠে সবিতা কহিল—শাস্তি দাও।

শাস্তি! বিশুদা হাসিল,—তোমাকে ত জানি সবিতা, নিজেকেও চিনেছি। বতা ত নই!

নিঃশব্দে উঠিয়া সবিতা আপনার পথে চলিয়া গেল।—অভিমানিনী!

কিন্তু এ জীবনে বাসনাই বা কি তাহার।

এই যে নৌকা! কোথায় ছিল এতক্ষণ!—ওগো মাঝি, পার করবে? আর যে াঁড়াতে পারি না।

দূর হইতে শব্দ আসিল, করব গো করব, ব্যস্ত কেন? ওই ত কাজ আমার!

ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়িল। দুইজন নামিয়া আসিল। রেবা আর নির্মল—বার বর।

এ কি—বিশুদা? কোথায়?

পারে যাবো ভাই,—ওই রামনগরে। কাজের চেষ্টায়—

নির্মল দাঁড়াইয়া রহিল। রেবা আসিয়া তাহার হাত ধরিল—আর আসবে না বশুদা?

আসবো বৈকি দিদি,—যাওয়া আসাই ত সম্বল!—ও মাঝি, রাত হল যে।

চল না বাছা, বসেই আছি ত তোমার জন্যে। তুমিই মায়া কাটাতে পাচ্ছ না!

হেঁট হইয়া রেবা বিশুদার পায়ের ধুলো লইল। আনন্দ ছুঁইল বেদনার পা দুটি! ৃত্যুর পায়ে জীবন মাথা ঠেকাইল!

কি কাজ সেখানে করবে বিশুদা?

এই যা হক একটা—না না, পাথরের কাজ আর নয়, দিদি। ওটা কেমন গোলমাল য়ে যায়। ওসব আর নয়।

মাঝ নদী—। চাঁদের আলোয় আবছা দুই তীর। উপরে আকাশ।

কত দেবে গো?

দিয়েছি ত ভাই তোমার পাওনা।

ওতে হবে না।

হবে না?—নাও তবে এই পুঁটলিটা?

ওটা ত পুঁটলি!—জঞ্জাল একটা।

বিশুদার দৃষ্টি উপর দিকে। মুখ তুলিয়া রহিল—সবই ত দিলাম—যা কিছু ছল,—সব। আর ত কিছু নেই!

চল তবে,—কি আর করি। পার করতে হবে ত!

* * *

আর এদিকে—।

পরিত্যক্ত অন্ধকার ঘর।—

বাণ-বিদ্ধা একজন মাটিতে লুটাইয়া দুই হাতে বুক মুচড়াইয়া ছট ফট করে। বুক মরুভূমি—কিম্বা পাথর। আঁচড়ায় শুধু, জল নাই। চীৎকার করিতে যায়—কণ্ঠস্বর নাই।

সবিতার প্রেতাত্মা।

আর একজন ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; নিশি-পাওয়ার মত।—অম্বার ছায়া।

ওদের কে পার করে?

ছি ছি

পাড়া গাঁ নয়—শুধু পাড়া; শহরের কাছেই। 'ডেলি প্যাসেঞ্জারের' কৃপায় টাট্‌কা খবর রেলে চড়িয়া আসে। আবহাওরাটা এমনিই।

ব্যাপারটা যে শোনে সেই ছি ছি করে। তা তলাইয়া কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক।

ঘটনাটা পাড়ার মধ্যেই। কে একটা ছোকরা নাকি একটি মেয়েকে লইয়া কলাবাগানের সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা আশ্রয় করিয়াছে। মেয়েটীর মাথায় সিঁদুর নাই কিন্তু নীলাম্বরী পরে।

অনেক কানাকানি করিয়া বলিল—দেখেছি হে, ছোঁড়াটাকে কলকাতার শহরে ঘুরতে দেখেছি—ওই আমাদের অফিস-পাড়ায়।

একজন বলিল—আমিও যেন দেখলাম একদিন; স্বাদিশীস্বাদিশী ভাব,—লক্ষ্মীছাড়া চেহারা—রুক্ষ!

একটা মানুষকে ঘিরিয়া এমনি আন্দোলন চলে।

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই।

খবরটা মেজ বৌও শুনিল। তার মন্তব্য শুনিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। লেখা-পড়া-জানা মেয়ে।

বলিল—এত বড় আস্পর্দ্ধা! এই পাড়ায় সকলের মাঝখানে এসে একটা বিধবাকে নিয়ে—শাস্তির ভয় নেই? অপমানের ভয় নেই?

সে যেন সমাজ-রীতির জ্বলন্ত শিখা!

ভাসুর-পো থাকে পাশের ঘরে। নাম ভানু। আজ বিশ বছর কি একটা রোগে পঙ্গু হইয়া আছে। সেও বসিয়া বসিয়া বাহিরে আসিয়া বলিয়া গেল—রোগটা যদি আমার না হত, দেখে নিতাম বেটাকে।

সে মনে করে, রুগ্ন না হইলে সে পৃথিবী জয় করিতে পারিত।

আলো জ্বালিয়া, সন্ধ্যা দিয়া মেজ বৌ তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া বলিল—সুবোধ জেগে আছিস্—সুবোধ?

সুবোধ বিছানায় শুইয়া ছিল। বলিল—কেন?

তুই কি কেবলই ঘুমুবি? ঘুম ভিন্ন কাজ নেই তোর?

না। কি বলচিস্—বল্ না?

বাহিরে তখনও গোলমাল মিটে নাই। সেই দিকে তাকাইয়া সুবোধ বলিল—ব্যাপার কি রে চন্দ্রা?

চন্দ্রা তাহার প্রায় সমবয়সী বৈমাত্রেয় বড় বোন। কখনও নাম ধরে—কখনও

বা দিদি বলে। মা-বাপ নাই। বোনের শ্বশুরবাড়ী ভাই আসিয়াছিল কালীপূজো বাবদে—আর যায় নাই। কোথাও গেলে সে আর নড়িতে চায় না। যেখানে সেখানে গিয়া থাকিতে তাহার লজ্জা করে।

চন্দ্রা বলিল—দ্যাখ না বাইরে গিয়ে। ঘরের বাইরে এত বড় পৃথিবীতে কি তোর কোনও কাজ নেই ?

উঠিয়া আসিয়া সুবোধ কহিল—কি, হল কি ?

চন্দ্রা তাহাকে সব খুলিয়া বলিল। সুবোধ কহিল—ভারি অন্যায় ত।

চন্দ্রা কহিল—এত বড় সাহস কার ? এই বামুন-পণ্ডিতের পাড়ায়,—একবার দেখে আয় ত। সব ঠিক ঠিক বলবি কিন্তু।

সুবোধ কহিল—সে যদি তার স্ত্রীই হয় ?

স্ত্রী হলে ক্ষেতি নেই—কিন্তু বিধবা স্ত্রী হবে কোন্ সাহসে ? যা তুই একবার।

জামা কাপড় পরাইয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া চন্দ্রা সুবোধকে বাহিরে পাঠাইল।

ঘণ্টাখানেক বাদে সুবোধ ফিরিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রা তাহারই অপেক্ষায় আলো জ্বালিয়া বসিয়া ছিল। গলা বাড়াইয়া বলিল—আড়ালে কেন ? সুমুখে আয়।

অপরাধীর মত সুবোধ সরিয়া আসিল।

কি হল,—যা শুনলাম—সত্যি ?

হল না।

হল না কি ? যাস্ নি বুঝি ? এমন ভীতু—এমন লাজুক তুই ?—এতক্ষণের রাগটা সুবোধের উপরেই পড়িল,—মানুষের সামনে গিয়ে কি কোন দিন দাঁড়াতে শিখবি নে ? ঘরই চিনেচিস শুধু, মেয়েদের মতন ?

সুবোধ কহিল—গেলাম ত।

কদ্দূর ? গিয়ে আবার ফিরলি কেন ?

বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সুবোধ বলিয়া উঠিল—কি বলতে হবে শিখিয়ে দিয়েছিলি তুই যাবার সময় ?

ও হরি। এই তোমার ইংরিজি লেখা-পড়া শেখা ?

কথায় কথায় শিক্ষা-দীক্ষা এবং পুরুষের পোরুষকে খাটো করা চন্দ্রার একটা কাজ ছিল।

সুবোধ বেচারা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। না পারে কথা কহিতে—না পারে ঘরের বাহির হইতে। দুনিয়ার যে দিকটায় কোলাহল, ও যেন তার আড়ালে থাকিতে চায়।

শুধু তাই নয়। মানুষের যে-কোনও একটা অন্যায় দেখিলেই তাহার লজ্জা। ও-পাড়ায় কে বিধবাকে লইয়া ঘর করিতেছে,—তাহার লজ্জার একশেষ !

সেদিন শহর হইতে ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছিল,—লজ্জায় সুবোধ দুই দিন মুখ দেখায় নাই।

চন্দ্রা এক সময় ডাকিয়া বলিল—সারাদিনই যে তোর কুমড়োর মাচা নিয়ে কেটে গেল রে? বাড়ী ঢুকবি নে?

ঘরের পাশেই ছোট্ট বাগান। সেখান হইতে মুখ তুলিয়া সুবোধ কহিল—কেন রে?

নন্দর বৌ তোকে ডাকছিলো একবার।

আমাকে?

হ্যাঁ। ওই যে তার একখানা চিঠিতে ঠিকানাটা লিখে দেবার জন্যে। দ্যাখ্ না—হয়ত বাইরে এখনও বসে আছে।

সুবোধ লুকাইয়া ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। বলিল, না—না, তুই বল্‌গে যা ভাই, বল্ আমি ঘুমুচ্ছি। ও-সব আমি পারি না—লজ্জা করে।

তার নিজের ঘরটিই পৃথিবী; আর সব অন্ধকার!

চন্দ্রা চুপ করিয়া রহিল। সুবোধ ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সেদিনকার কথাটা পাড়িল। আমিও ভাবচি, এত বড় অন্যায়টা কি চেপে যাওয়া উচিত? ও-সব লোককে আস্কারা দেওয়া—তুই-ই বল্ না দিদি?

চন্দ্রা কহিল—তোর এ সব কথায় থাকবার দরকার নেই।

না, তাই বলচি, তুই সেদিন বলছিলি কি না; আর আমিও ভেবে দেখলাম, উঃ কি অন্যায়! ইচ্ছে করে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিই।—বলিয়া সে বিছানায় গিয়া ঢুকিল।

চন্দ্রা বলিল—কার মাথা?

ওই হতভাগা,—ওই যার বৌ বিধবা?

কেন? কিই-বা দোষ করেছে সে? দুজনের সুখ-শান্তির জন্যে বিয়ে যদি তাদের হয়েই থাকে,—অন্যায়টা কি?

অন্যায় নয়? খুব অন্যায়, একশো বার—হঠাৎ দিদির মুখের দিকে চাহিয়া সুবোধ বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, না হয় ধরে নেওয়া গেল—

কিন্তু কথা বাড়াইত আর তাহার সাহস হইল না। ফস্ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

শহরের রাস্তাটা সটান্ সিধা গিয়াছে। তাহারই এক পাশ দিয়া সুবোধ এম্‌নি খানিকটা চলিতেছিল। সে এমন যায় প্রায় রোজই। বেশি দূর যায় না—খানিকটা ঘুরিয়া ঘরে আসিয়া ঢোকে। লোকের ভিড় দেখিলে তাহার মাথা গোলমাল হইয়া যায়।

ফিরিবার মুখে নজরে পড়িল, একটি লোক ছোট একটি মুদির দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার পকেট হাতড়াইতেছে।

পুরুষ মানুষের এমন অপরূপ সুন্দর চেহারা সুবোধ আর কখনও দেখে নাই। সৌন্দর্যের পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্য—এ যেন বিধাতার দান নয়,—তাঁহার সৌন্দর্যের ভাণ্ডারে এ যেন ডাকাতি।

হাতের ইসারা করিয়া লোকটা হঠাৎ সুবোধকে ডাকিল। সে ডাক উপেক্ষা করিবার নয়।

কাছে গিয়া সুবোধ কহিল—কি বলচেন ?

আনা চারেক পয়সা দিতে পারো ?

চার আনা ! আনা দুই আছে—নেবেন ?

দোকানি অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল। লোকটী বলিল—চাল কি না; কিন্তু—কম পয়সায়, আচ্ছা দাও, দু আনাই দাও—সিগারেট কেনা আর হবে না দেখছি।

সুবোধ পয়সা বাহির করিয়া দিল। সবচেয়ে মূল্যবান যদি কোনও বস্তু তাহার নিকট থাকিত, তৎক্ষণাৎ সে বাহির করিয়া দিত।

লোকটা হাসিতে হাসিতে পান সিগারেট কিনিতে লাগিল। সুবোধ পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছিল।

পরণে এই শীতের দিনে একটি ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি, ময়লা একখানি বিলাতী কাপড়। রুক্ষ মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। গায়ে এক পরদা ময়লা। ছেঁড়া জুতার ফাঁক দিয়া পায়ের আঙুল বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। তবুও তাহার সেই জ্যোতিষ্মান দেহে কোথাও রূপের কার্পণ্য নাই।

সিগারেট ধরাইয়া সে বলিল—দেবো আর একদিন তোমার পয়সা দু আনা। এ রাস্তায় আবার দেখতে পাবো ত ?—আসি।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে শুরু করিল।

সুবোধেরও ওই পথ—।

অনেকদূর পর্যন্ত লোকটি নিজের মনেই চলিতে লাগিল, একবার পিছন ফিরিয়াও চাহিল না।

সুবোধের মনে হইতে লাগিল, লোকটির চলনের ভঙ্গীটিতেও যেন একটা চুম্বক আছে।

ক্রমে রাস্তা জনশূন্য হইয়া আসিল। সংকীর্ণ রাস্তার দুইধারে গাছের ছায়ায় ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দুজনেরই পায়ের শব্দ হয়।

লোকটি হঠাৎ পিছন ফিরিল। সুবোধকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—তুমিই না দু আনা পয়সা দিলে একটু আগে ?

সুবোধের কথা বাহির হইল না। মুখ তুলিয়া বোকার মত চাহিল।

তুমি বটে !—লোকটি হাসিয়া আবার বলিল—পুলিশের গোয়েন্দা হলে এ সময় অন্ততঃ বেশ কায়দা করে একটা জবাব দিত। তাদের ঠেঁঙে এমন অনেক

পয়সা নিয়েছি কি না। আর তাছাড়া ভুলে যাওয়াই বা আশ্চর্য্য কি! এমনি হয়। সেই মুদির দোকানের সুমুখে যদি কোন দিন তোমাকে দেখতাম তবেই মনে পড়ত; সেইখানেই তুমি একান্ত; আর নৈলে মানুষের স্রোতে মিশে গেলে,—তখন তোমার কোনও পরিচয় নেই।

সুবোধ সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। লোকটি যেন এক মুহূর্ত্তে তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিল—আজ তুমি যে আমার একটুখানি উপকার করলে, এর জন্যে কোন দিন গর্ব করো ভাই। এ তোমার গৌরব! আজ তুমি ধন্য হয়ে গেলে!

সুবোধ যেন তাহার কথা গিলিতে লাগিল। মুখে কহিল—কোন্ দিকে যাবেন?

মুখ বিকৃত করিয়া লোকটা সহসা বলিল—ছি ছি, এই তোমার কথা? কোন্ দিকে যাবো, আমরা কে, কি নাম আমাদের, কি করি—এ সব প্রশ্ন কেন মনে আসে? আমরা আছি—শুধু এইটুকু জেনে রেখো। চললাম।

গলির একটা বাঁকে মোড় ফিরিয়া সে চলিতে লাগিল।

সুবোধ কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর গলা বাড়াইয়া বলিল—কাল আবার দেখা হবে কি?

অন্ধকারে লোকটা গলার শব্দ করিয়া হাসিল। কহিল—হবে বৈ কি! পয়সা দু আনা দিয়ে তুমি যে আমায় কিনে রাখলে!

সুবোধের মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল।

খানিকদূর গিয়াছে—পিছন হইতে লোকটি আবার আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিল। সুবোধ বিমূঢ়ের মত বলিল—এ কি···আবার আপনি···?

লোকটি কহিল—মানুষকে আঘাত দিতে ভাল লাগে; কিন্তু চোখেও আবার জল আসে—দেখবে?

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই লোকটা তাহার বড় বড় দুইটা চোখে স্পষ্ট হু হু করিয়া জল আনিয়া ফেলিল। তার পর বলিল—তোমার যখন ইচ্ছে এস ওই কলাবাগানে—

কলাবাগানে। কোন্ বাড়ী?

সে হাসিয়া বলিল—ওই ত একটিই বাড়ী ভাই কলাবাগানে···কখন হুড়মুড় করে পড়ে। ওদিকে শেয়াল-কুকুরের বাস, আর এক দিকে—তোমার চমৎকাবার কাবণ আমি জানি। বলিতে বলিতে লোকটা আবার গলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু হজম করা শক্ত। বিশেষতঃ চন্দ্রার পক্ষে। কিন্তু এ যুগে প্রতিপক্ষে দাঁড়াইবার মত কেই বা আছে। তবু এর গুরুত্বটা চন্দ্রাই যেন বেশি করিয়া নিজের ঘাড়ে লইল।

দেবর ও ভাসুরের চার পাঁচটি ছেলে-পুলে। কেহ স্কুলে, কেহ-বা কলেজে

পড়ে। যে ছেলেটি এবার বি-এ পরীক্ষা দিবে, সে কহিল—ননসেন্স! ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যুগে এসব তোমার কি রকম কথা, মেজখুড়ি?

চন্দ্রা রাগে ফুলিতে লাগিল; কিন্তু ছেলেরা তাহার সমবয়সী,—কিই-বা বলা যায়!

বন্ধ ঘরের জানালায় মুখ বাড়াইয়া ভানু সবই দেখিতেছিল; এবার হাতের উপর ভর দিয়া কোনও রকমে বাহিরে আসিয়া বলিল—খুড়িমা, আপনি আমার মায়ের মতন—মার চেয়েও বেশি—আমি যদি ভাল থাকতাম তাহলে দেখতেন—দেখতেন তাহলে ওর এই সাহসের কত বড় শাস্তি—শাস্তি দিতাম। কি বলব—কি বলব খুড়িমা, আপনার ওই সোনার মুখখানিতে আমি—আমি হাসি ফুটিয়ে দিতাম। কিন্তু—

সেই অকর্ম্মণ্য পঙ্গু, পরিত্যক্ত, ত্রিশ বছরের জোয়ান ছেলেটি ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চন্দ্রার চোখেও হয় ত তখন জল দেখা দিয়াছে। কাছে আসিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—দীর্ঘজীবী হও বাবা, তুমিই আমার মান রাখলে।

সেই কদাকার, শীর্ণ, অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলিয়া হঠাৎ ভানু বলিল—কি বললে?

চন্দ্রা চুপ।

হাতের উপর ভর দিয়া কোনওরূপে ভানু আবার ঘরের ভিতর গেল। ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া, চীৎকার করিয়া, কাঁদিয়া, মাথার চুল ছিঁড়িয়া বলিয়া উঠিল—তুমি আমায় দীর্ঘজীবী হতে বল? আমায় কেন মারলে না, কেন খুন—খুন করলে না; ও কথা—ও কথা কেন বললে তুমি?

তার সে কি ভীষণ চীৎকার আর কান্না! দেহের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া তাহার বন্দী নিপীড়িত আত্মা যেন বাহিরে আসিয়া মাথা কুটিতে চায়।

কিসে কি হইল। মুহূর্ত্তে বাড়ীর মধ্যে যেন কি কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

সুবোধের সব কিছু একেবারে বিশৃঙ্খল! এ যেন কোথাকার একটা ঝড়ো হাওয়া আসিয়া তাহার সব ওলোট পালট করিয়া দিল।

দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি—সব যেন নিতান্ত একঘেয়ে। চনচন করিয়া শুধু শুধু এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ধরা পড়িয়া গেল।

গলার আওয়াজে পিছন ফিরিয়া দেখিল, লোকটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। কাছে আসিয়া বলিল—চলে যাচ্ছ যে? লজ্জা কেন অত?

না, লজ্জা আর কি!

সে কহিল—তোমার বৌদি ডাকচেন তোমাকে।

বৌদি! আমার বৌদি ত নেই!

আছে বৈ কি! এত বড় পৃথিবীতে খুঁজে পেতে দেখলে এক-আধটা বৌদিও কি মেলে না?—বলিয়া সুবোধের হাত ধরিয়া বলিল—একটা দাদাও মিলে যেতে পারে—এস।

কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সুবোধকে সে লইয়া গেল।

লোকটাকে ভালও লাগে—আবার ভয়ও করে।

কলাবাগানের সেই বাড়ী। বাহিরের অন্ধকার নোংরা কুঠুরিগুলা পার হইয়া সে কহিল—এই সিঁড়ি, দেখতে পেয়েছ? খুব সাবধানে ভাই, ডান দিকে দেয়াল ঘেঁষে—ইয়া।

কোনও রকমে দুইজনে উপরে উঠিল। সুবোধের গা ছমছম্ করিতেছিল। অপরিচিত কোনও লোকের বাড়ী তাহার এই প্রথম প্রবেশ!

আসনের বালাই নেই ভাই, মাটিতেই যা'হ'ক করে। দেখো, জল প্যাচ প্যাচ কচ্ছে। জামাটা যেন তোমার,—হাসিয়া আবার বলিল—মানুষকে সাবধান করবার মত মুদ্রাদোষ আমার নেই। তবে পরিচয়টা প্রথম কি না, তাই একটুখানি—

যা'হ'ক করিয়া সুবোধ সেইখানেই বসিল। এলোমেলো কতকগুলা বই, খবরের কাগজ সেখানে ছড়ানো। অনেকগুলি বইএর ইংরাজি হরপা কিন্তু ভাষা তাদের ইংরাজি নয়।

সবোধ চাহিয়া বলিল—এ-সব পড়েছেন আপনি।

শুধু পড়েছি, পড়ে জেল খেটেছি!

জেল খেটেছেন? কেন?

লোকটা শুধু হাসে। হেসে বলে—ইংরাজ রাজত্বে কি আর 'কেন'র উত্তর পাওয়া যায়?

আগাগোড়া অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইতেই সুবোধ উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। এ অন্ধকারে পলাইবার কোনও উপায় নাই। পথ দেখাইয়া না দিলে সমস্ত রাত্রির চেষ্টাতেও হয় ত সে এখান হইতে বাহির হইতে পারিবে না। চীৎকার করিলেও কেলেঙ্কারী!

মুখে বলিল—খুব ত আপনি?

লোকটা আবার হাসিতে থাকে। তাহার এই নিরর্থক হাসি, এই অন্ধকার, ওই মিটমিটে আলো, চারিদিকের অবরুদ্ধ নোংরা গন্ধ,—সমস্ত মিলিয়া সুবোধকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

হঠাৎ সে কহিল—যাই এবার। দিদি আবার এর পর—

তবে এসেছিলে কেন? বৌদির প্রতি লোভটা খুব প্রবল হয়েছিল বুঝি?

উক্তিটা একেবারে লজ্জাহীন। সুবোধের কান দুইটা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে মৃদুকণ্ঠে কহিল—ঘর থেকে বেরোনো আমার অভ্যেস নেই কি না, তাই। তাছাড়া দিদি আমাকে কোন দিন—

দিদি-ময় যে! বলি, পুরুষ মানুষ ত? নাকি বিধাতা ভুল করে ছিলেন, শোধরাবার সময় পান নি—বল না হে?

এই অপমানকর প্রশ্নের আর কিই-বা উত্তর দেওয়া যায়।

বেশ একটা রোমান্সের আঁচ পেয়েছিলে—না? দুনিয়ার আড়ালে থাকি, ভবঘুরে লোক, বিধবাকে নিয়ে ঘর করি,—বেশ লাগছিল তোমার—নয়? কিন্তু তোমার দিদিই যে সব মাটি করে দিচ্ছেন। এমন রাজজোটক অবস্থাটার প্রতি তাঁকে একটু কৃপা-দৃষ্টি দিতে ব'লো—বুঝলে?

সুবোধ কহিল—আপনি জানলেন কি করে যে দিদি আপনার বিরুদ্ধে—?

সে হাসিয়া বলিল—মানুষ চেনার কাজেই এই তিরিশটা বছর কাটিয়ে দিলাম। তোমার দিদিকেই যে বেশি চিনি হে। ভেতর ভেতর তাঁর ক্রিয়া কলাপ—

আপনি কি তাঁকে দেখেছেন?

দেখলে কি আর চিনতাম? ওদের যে না দেখেই স্পষ্ট চেনা যায়। অমন অনেক দিদির কবল থেকে যে মুক্ত হয়ে এসেছি,—বলিতে বলিতে হঠাৎ ভিতরের দিকে চাহিয়া সে পুনরায় বলিল—কি বল মলিনা, আমার চেয়ে তোমার হাড়ে তাদের পরিচয়টা একটু বেশিই ঠোকাঠুকি হয়েছিল—না?

মলিনা!

কিন্তু যাহার উদ্দেশে প্রশ্ন—সে সম্পূর্ণ নিরুত্তর!

আড় হইয়া সে শুইয়া পড়িল।

বইগুলি সমুখে পড়িয়া রহিল; আলো জ্বলিতে লাগিল।

চোখ বুজিয়া সে ডাকিল—সুবোধ?

সুবোধ কহিল—আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

এ-কথার উত্তর সে দিল না। চোখ বুজিয়াই হাসিয়া সে কহিল—তোমার দিদি আমাদের দেখতে পারে না—না?

সুবোধ চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পূর্বে চন্দ্রার প্রতি সেই শ্লেষটা তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল।

জড়িত কণ্ঠে লোকটি আবার কহিল—আচ্ছা সুবোধ, এমনও ত হতে পারে, এতক্ষণ তোমায় যা বলেছি সে সব আমার ভেতরের কথা নয়!

সুবোধ মনে মনে পথ হারাইয়া গেল। বিভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল—এবার আমি যাই—কেমন?

যাবে? তা যাও।—সে যেন ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—ঝড়ের রাতে আ[illegible] আকাশে তোমরা এমনি করে এক একবার জ্বলে উঠেছ, আবার ঠিক এমনি [illegible]নিয়ে গেছ! এ জীবন শুধু দু'হাতে অন্ধকারই ঠেলে চলবার!

[illegible] ততক্ষণে উঠিয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়াছে। লোকটি অকস্মাৎ

উঠিয়া বসিয়া কহিল—দিদিকে তোমার ব'ল, তাঁর ওপর আমার ভক্তি দিন দিন,—এমনি একটা কিছু ব'লো—বুঝলে ?

আবার সে আড় হইয়া শুইল।

নেশাখোর !

সেই বীভৎস অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া সুবোধ নামিয়া আসিল। ইতিমধ্যে দুইবার মাথা ঠুকিয়া গেছে। কোন্ দিকে যাইবে তাহার ঠিক পাইতেছিল না। সহসা দেখিতে পাইল, উপরের পাচিলের পাশ দিয়া তাহার পথের প্রতি কে আলো বাড়াইয়া ধরিয়াছে।

সুবোধ কিন্তু চোখ আর নামাতেই পারিল না।

সুগোল সুন্দর একখানি নারীর হাত! চিক্‌চিকে একগাছি চুড়ি আঁটা। কিন্তু সেই অপরূপ হাতখানির অধিকারিণী আড়ালেই রহিয়া গেল। সুবোধ দু'তিনবার ঢোঁক গিলিয়া ফেলিল।

তার পরই কখন্ চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া আলোটি সরিয়া গেল।

অন্ধকার······

অতি কষ্টে সুবোধ পথ দেখিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিল।

পলাইয়া আসিয়াও স্বস্তি নাই। চকিত দৃষ্টি আর সাগ্রহ মন ওই-দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে,—কম্পাসের কাঁটার মত।

খানিকক্ষণ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করিল। কেহ আর দেখিতে পায় না।

শেষে সাহস করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ডাকিল—দাদা আছেন ?

ভিতরে কোথায় কিসের শব্দ হইতেছিল। তবুও তাহার মৃদু কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া দাদা ডাকিল—এস সুবোধ !

তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া দাদার সেই ঘরের কাছে আসিয়াই চট্ করিয়া সুবোধ থমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মেয়েটি পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দাদা তাহাকে যাইতে দিবে না।

এস হে, ভেতরে এস। লজ্জা কি! একটি বৌদি মিলিয়ে দেবার কথা ছিল যে তোমার সঙ্গে।

লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সুবোধ ভিতরে গিয়া বসিল। দাদা কহিল—তোমারই নাম কচ্ছিলাম এতক্ষণ! কদিন আর দেখা নেই কেন? আমার সঙ্গে এত অল্প পরিচয় হয়েই কেউ যে আমার নেশা কাটিয়ে উঠতে পারে, এমন লোক ত আর আমার চোখে পড়ল না। যাই হোক—সেদিন, আর আসবে না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলে,—আজ কি শত্রুপক্ষের উপবাসী দুখানি শুক্‌নো মুখ দেখতে এলে নাকি ?—তা দেখবে ত দেখ!—বলিয়া সে পাশের সেই মেয়েটির মাথার ঘোমটাটা হট্ করিয়া খুলিয়া দিল, পরে তাহার লজ্জানত সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

সুবোধ মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, মেয়েটির মুদ্রিত চক্ষু দুটির কোলে তখনও জল শুকায় নাই,—আর একদিকে দাদা তাহার আঁচল চাপিয়া আছে। কিন্তু সে তখনকার মত কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—আপনাদের কি এখনও খাওয়া-দাওয়া—?

আরে সেই জন্যেই ত ঝগড়া হে! বলছিলাম, দুজনের প্রেমা-লাপের ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া দাওয়ার কথাটা আর নাই বা তুললে, শুয়ে বসে ত দিন কেটে যাচ্ছে?—বলি, ওমলিনা বিবি,—তোমার কদিনকার উপবাসের তালিকাটি দেবরের কাছে একবার মেলে ধর না গো।

কিন্তু মলিনা বিবি আর নড়ে চড়ে না। মাথার ঘোমটাটিও আর মাথায় তুলিয়া দেয় নাই। সুবোধ অলক্ষ্য একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই নতমুখখানি বাহিয়া ঠোঁটের কাছে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিয়াছে।

হয়ত অপমানে—হয়ত-বা লজ্জায়! হয়ত-বা নিষ্ফল ঘৃণায়।

দাদা নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল। সুবোধ ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে কহিল—ছি!

মেয়েটি এবার চোখ মুছিয়া মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর টানিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বাহির হইয়া গেল। সুবোধ পিছন হইতে দেখিল, সেদিন হাতে দুগাছি চুড়ি ছিল, আজ তার বদলে ফালি বাঁধা!

খানিকক্ষণ পরে সুবোধ উঠিয়া নীচে নামিয়া আসিল। হঠাৎ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল—ডানদিককার ঘরটায় পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য জন্তুর মত দাদা পায়চারি করিতেছে।

আপনি, ওখানে—কি?

আগুনের ডেলার মত চোখ ফিরাইয়া দাদা চাহিল। মনে হইল তাহার ভিতরের কোথায় পুঞ্জীকৃত বিষের জ্বালা মাথায় চড়িয়াছে।

বলিল—মেয়েদের চোখের জল মানুষকে কেমন করে নষ্ট করে, জানো? বিয়ে করেছিলাম ওকে তিন-আইনে। সেদিন অসহায় বিধবার চোখের জল অস্বীকার কর্ত্তে পারলাম না। বদমাইস বাপটার অত্যাচার থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনলাম! কিন্তু মহত্ত্ব কি দেখালেই হল? সেদিনকার সেই ভুলের শাস্তি আজও—

খামখেয়ালীর গল্পের মত দাদা সেখানে দাঁড়াইয়া আপনার কাহিনী শুরু করিল।

একবার একটা ডাকাতের দল পুলিশের ভয়ে পথে ছত্রভঙ্গ হয়।

দাদা লুকাইয়া বাঙলার বাহিরে কোথায় এক পার্ব্বত্য প্রদেশে যান। অনেকদিনের কথা। গাঁয়ে এক গৃহস্থের খোঁজ পায়। ভাব আলাপের পর নিমন্ত্রণ খাওয়া এবং বক্তৃতা দেওয়া চলে। একদিন গৃহিণী মারা পড়িলেন। বড় আদরের

বিধবা মেয়েটি তখন একা। বাপটা মাতাল। দূরে কোথায় সাঁওতালি পাড়ায় গিয়া রাত কাটায়। মাঝে মাঝে মদ খাইয়া আসিয়া মেয়েটাকে প্রহার করে। বেশ উপযুক্ত অবসর!

দাদা হাসিয়া বলিল—আমার প্রতি মেয়েটির গোপন প্রেম না কি প্রথম দর্শনের পর থেকেই ফল্গুধারার মত,—তারপর একদিন দূরে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ি ঝরণার পাশে বসে উনি খামকা কাঁদতে শুরু করলেন! অর্থাৎ নাটুকে কায়দায় প্রেম-নিবেদন আর কি! কি করি—বললাম, চোখের জল ফেলো না, তোমায় আমি বাঁচাতে পারি কিন্তু। ও বললে, বাঁচাও, তোমার পায়ে পড়ি। ব্যস্—কুড়ি টাকায় দুটি বোতল ওর বাপকে কিনে দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনলাম!

তারপর।

তারপর বোষ্টমী বললে, তোমার দুটি শ্রীচরণ ছেড়ে কোথাও যাব না। তারপর থেকে যেখানেই ভেসে যাই, উনি আমার গাধাবোট!

এ ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কিছু—?

দাদা কহিল—বললাম, বোষ্টমি, এ জন্মটা তুমি বিধবা হয়েই থাক, মা হয়ে আর দরকার নেই।

সে কি?

অর্থাৎ একটি সুসন্তান হয়েছিল; কিন্তু দিলাম সেটাকে কুড়ি টাকায় ঝেড়ে, ডাক্তার বাবুদের সেই কোচোয়ানটার কাছে!

সুবোধের মুখখানা দেখিতে দেখিতে সাদা হইয়া গেল। আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল।

নিয়মের ব্যতিক্রম বৈ কি!

যেখানে ছিল অন্ধকার গুহা, সেখানে ফাটল দেখা দিল; নীল আকাশের আলো আসিয়া পড়িল। ষড়ঋতুর যেখানে যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল, এখন সেখানে বাতাস চলাচল করে। জড়ের মধ্যে গতির বেগ দেখা দেয়।

চট্ করিয়া সুবোধ বাহির হইয়া যায়, আর শীঘ্র ফেরে না। রাস্তায় রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরিয়া আসে। হয়ত-বা কোনদিন পায়ে হাঁটিয়াই শহরে যায়।

সেদিন দাদার নজরে পড়িয়া গেল। বলিল—কি হে অভিমানী বালক! আর যে ওদিক মাড়াও না?

সুবোধ কহিল—কোথায় চলেছেন?

চল না—যাবে? ও কি মাথায় তোমার তালি মেরে দিলে কে?

চুল কেটেছি।—সুবোধ কহিল।

এঃ—কাঁচির দাগ হয়ে গেছে যে! দিদি কেটে দিলে বুঝি?

আপনি জানলেন কি করে?

জানতে পারি বৈ কি। পুরুষের চুল সম্বন্ধে মেয়েদের ভয়ানক হিংসে! রাগ করে কেটে দিলে না কি?—কেন?

আমি না কি লোকের দেখে দেখে চুল রাখছিলাম।

দাদা হাসিয়া বলিল—আমিই বুঝি সেই লোক?

এমনি করিয়া পথ চলিতে চলিতে গল্প হয়। সে কেবল এক পক্ষের ব্যক্তিগত গল্প।

সুবোধ ভাবিল, এ পথ যেন আর ফুরায় না।

ক্রমে বেলা গেল, গাছের মাথা হইতে আলো ফুরাইল। শহরের দোকান পসারিতে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

শেষে দাদা দূর পথের দিকে চাহিয়া আপনাকেই যেন আপনি শুনাইতে লাগিল—কিন্তু যা দেখছ ভাই, এসব মিথ্যে। মানুষকে কোনদিন যেন বিশ্বাস কর না; ভগবানকে মানার চেয়ে একটা আদি বৈজ্ঞানিক শক্তিকে স্বীকার করো; পুণ্যকে এড়িয়ে চলো কারণ তার রং শুধু সাদা, কিন্তু পাপকে ভালবেসো,—তার মধ্যে রঙয়ের খেলা পাবে, বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলবে। যদি প্রেমে পড় তাহলে আনন্দ পাবে; কিন্তু প্রেমের ব্যর্থতা না ঘটলে পরিপূর্ণ রসের অস্বাদ পাবে না। আমার বন্ধন কোনদিন স্বীকার কর না—কারণ তাই তোমার মৃত্যু।

সুবোধ স্তব্ধ হইয়া তাহার কথা শোনে।

দাদা তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া হঠাৎ বলে—আচ্ছা, মলিনাকে দেখতে কি খুব ভাল নয়? কিন্তু আমি যে ওর স্বামী—এ ত আমি সইতে পারিনে। ওকে আলতা পরতে দিই না, পান খেতে দিই না, তেল মাখতে দিই না,—আমার ভয়, পাছে ও ভাল দেখতে হয়। সিঁদুর পরাই না ভাই,—ওকে স্ত্রী মত ভাবতে আমার গা কাঁপে! কিন্তু তবু ত তাই, মলিনা ভাল! আমার দিকে যখন আনমনে চায়, ভাবি—আমি যদি কাব্য লিখতে পারতাম!

তাহার মুখের প্রতি সুবোধ খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল,—তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কোনও কথা বাহির হইল না।

দাদা আবার বলিল—একখানির বেশি কাপড়ও ভাই আমি তাকে দিই না, পাছে তার রূপের বৈচিত্র্য ঘটে, পাছে আর ভালও দেখতে হয়। সেই নীলম্বরীখানি মাত্র সম্বল; তার যে কত জায়গায় ছেঁড়া—ছেলেমানুষ তুমি, কি আর বলব। কিন্তু এর জন্যে এতটুকু অনুযোগ কোনদিন করে না!

কিছুই বলেন না?

বলে তাই, চার পাঁচদিন উপবাসের পর আর থাকতে পারে না। ছেলেমানুষ ত হাজার হক, তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদে—এই যেমন সেদিন—

ক্রমে মলিনার সঙ্গে পরিচয় হয়। আগে দেখিলে পলাইত; এখন আর পলায়

না। যে ঘরে সুবোধ বসে সে-ঘরে যাতায়াত করে। দাদা বলে—লজ্জা বটে! একেবারে গুণ চটের আবরণ,—ছিঁড়তে চায় না।

তারপর একদিন আগল খুলিয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া সুবোধ নামিয়া যাইতেছিল। মলিনা এদিক-ওদিক তাকাইয়া চুপি চুপি বলিল—দেখুন আপনি···আপনি ও'র সঙ্গে আর বেড়াবেন না। ভারি বিপদে পড়বেন একদিন।

ঘরে ফিরিয়া সুবোধের সেদিন চোখে জল আসিয়াছিল। অকারণে চোখে জল!

বার-বাড়ীর যে দিকটা প্রায় খালিই পড়িয়া থাকে, সেখানে সেদিন সুবোধ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

তখন সন্ধ্যা।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে চন্দ্রা আসিয়া বলিল—বসে আছিস্ এখানে? বড় বিপদ যে?

তাহার ভয়-ব্যাকুল আলুথালু অবস্থার দিকে চাহিয়া সুবোধ বলিল—কি রে?

ভানু কেমন কচ্ছে, হয়ত বাঁচবে না। শ্বাস আরম্ভ হয়েছে।

অমন হয়েছিল ত দু'তিনবার। আবার ত—

না, না—সেদিন আমার সঙ্গে ঝগড়ার পর থেকে কেমন যেন—

বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহই নাই। ইস্কুল কলেজের ছুটি ফুরাইতে ছেলেরা শহরের বাসায় চলিয়া গেছে। বড় কর্ত্তা গেছেন শিষ্যবাড়ী। মেজ গেছেন মামলার তদ্বির করতে কলিকাতায়; ফিরিতে আরও দুএকদিন। ওদিককার বড়-বৌ আর ছোট-বৌ ছেলেমেয়ে লইয়া ভাইয়ের সঙ্গে গেছেন তীর্থ করিতে।

সুবোধ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রা শুধু মুমূর্ষু ভানুর প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কাছে গিয়া চন্দ্রা দেখিল—মুখ গুঁজিয়া মরিয়া আছে।

চন্দ্রা শুধু বলিল—এখন উপায়?

তাই ত!

নিয়ে যাবার লোক ত কোথাও—। খবরই বা কাকে দিই?

সুবোধ কি ভাবিয়া বলিল—যদি রাজি হস্ ত বলি।

কি?

দাদাকে খবর দেবো? ওই কলাবাগানের—

সে কি রে? এ বাড়ীর মড়া সে ছোঁবে? এ'রা এসে বলবেন কি; যদি

জাতে ঠেলে আমাদের ?—তাছাড়া যে শত্রুতা করা হয়েছে তাদের সঙ্গে, আমাদের সাহায্যে সে আসবে কেন ?

সে রকম লোক সে নয় !

খানিক ভাবিয়া চন্দ্রা বলিল—তবে দেখ ভাই। যদি সে আসে দয়া করে'।

সুবোধ বাহির হইয়া গেল।—মড়া আগলাইয়া চন্দ্রা সেইখানে বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে মানুষের সাড়া পাইয়া চন্দ্রা নড়িয়া উঠিল। মাথায় ঘোমটা টানিয়া সে একপাশে উঠিয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইল।

দাদা হেলিতে দুলিতে ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। তারপর অনুমানে চন্দ্রার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল—ভায়া গেলেন ডোম পাড়ায় পালঙ্কের সন্ধানে। শুনলাম সবই—এই জড়পিণ্ডটিকে জয়যাত্রায় নিয়ে যেতে হবে! বেশ বেশ—এটা আমার চিরদিনের অভ্যেস।

মাথা হেঁট করিয়া চন্দ্রা সবিনয়ে বলিল—আপনার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে; কিন্তু যে উপকার আজ পেলাম—

মুখের একটা শব্দ করিয়া দাদা বলিল—মানুষ আর কি অন্যায় কর্ব্বে আমার উপর, কতটুকু তার শক্তি! আর উপকার? ওটা আমি খুব পারি।

তামাসা করিবার উপযুক্ত সময় বটে!

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়া দাদা কহিল—নিন, মাথার দিকটা ধরুন—আমি ধরছি পায়ের দিকটা—চ্যাংদোলা করে বাইরে নিয়ে যাওয়া যাক্ ততক্ষণ!

চন্দ্রা সরিয়া আসিয়া শবদেহটি মাথার দিকটা তুলিয়া ধরিতেই—

আলো পড়িয়াছিল দুইজনেরই মুখে।

অকস্মাৎ চন্দ্রার দৃষ্টি পড়িল তাহার মুখের উপর।

চলুন—নিয়ে যাই; দেরি কচ্ছেন কেন? এর পর আবার,—

চোখ নামাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চন্দ্রা মৃতের মাথার দিকটা পুনরায় ধরিতেই দাদা খানিক হাসিল।

হাসিয়া কহিল—পূর্ব্ব স্মৃতির আলোড়ন—না চন্দ্রা?

চন্দ্রা চমকিয়া উঠিল। বলিল—কাকে কি বলছেন?

খানিক বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়া দাদা বলিল—তোমাকে হঠাৎ তখন ছুঁয়ে ফেললাম—না? না ছুঁলেই ভাল হত চন্দ্রা, এ জীবনে অনেক পাপ করেছি।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে চন্দ্রা শুধু বলিল—আপনি কবে যাবেন এ পাড়া থেকে ? কাল সকালেই না হয়—

শবদাহ শেষ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত দুইজনে শেষরাত্রে ফিরিতে ছিল।

দাদা ডাকিল—সুবোধ ?

সুবোধ মুখ তুলিল।

আজ আমার জীবনের রহস্যটি তোমায় শোনাবার দিন ছিল, কিন্তু কথা বলতে পাচ্ছিনে, ভাই।

তাহলে কাল শুনবো। বলবেন ত ?

দাদা চুপ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

তার পরদিন। বেলা তখন অনেক! কলাবাগানে সেই বাড়ীর উপর তলাকার নিজ্জর্ন ঘরে সুবোধ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

মলিনাকে লইয়া দাদা কখন চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় তাহাকে একবার বলিয়াও যায় নাই।

পায়ের শব্দ পাইয়া মুখ তুলিতেই সুবোধ দেখিতে পাইল—চন্দ্রা!

চন্দ্রা থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—তুই এখানে? খুঁজছিলাম যে! খবর পেলাম। এরা চলে গেছে বুঝি? এমন ভাঙা বাড়ীতে ছিল কি করে?

কোনও মতে সে আপনার মুখভাবকে গোপন করিতে চেষ্টা করিল।

ওকি—যাস্ কোথা ?

খুঁজতে ?

কাকে খুঁজতে ?

দাদাকে। তার শেষ কাথাটা শুনতেই হবে। যেখানেই সে থাকুক—আমি তাকে,—

চন্দ্রা কহিল—যদি না পাস্ ?

না পাই, আর ফিরবো না।

তাড়াতাড়ি সে পথে নামিয়া আসিল।

রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ পথ। বৈরাগীর মত উদাসীন। কিন্তু তাহার সেই বিস্তৃত বাহুর আড়ালে এই ছেলেটি হয়ত চিরদিনের মত আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।

* * *

দিনকয়েক বাদে কাহারা দাদাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল। অনেকে বলে পুলিশের লোক। কেউ কেউ বলে, গোয়েন্দা! একটা জালিয়াতি আসামী

না কি এই পাড়ায় কোথায় আসিয়া লুকাইয়া ছিল। কেউ বলে—এ তারই কাজ।

বার বার মাথা নাড়িয়া চন্দ্রা বলিল—না, না—কিছুতেই না; আমি জানি সে—

বাসুর পিসি বলে—না বৌমা, এ সেই ঝাঁকড়া-চুলোরই কাজ।

চন্দ্রা আমতা করিয়া বলে—সত্যি? তা হলে কিন্তু—এ যে ভারি, ছি ছি—

অনুতাপ

জীবন সায়াহ্নে, মরণের আধো আলো আধো অন্ধকারের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে, আজ কেবলই সেই যৌবনের রঙ্গিণ চিত্রপটখানি জলবিম্বের মত আমার দিব্য-দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে উঠছে। সে কাহিনী যে অতি নূতন; সম্মুখে কালো ভবিষ্যৎ—পিছনে অতিদূরে নিক্ষিপ্ত সে যে আমারই বর্ণবৈচিত্র্যময় উৎফুল্ল যৌবন—সে আমারই কাহিনী—চিরনূতন! কিন্তু যাক্ সে সব—তার মধ্যে রয়েচে এক জ্বলন্ত, ঘৃণিত প্রতিহিংসা। আমার সেই পৈশাচিক কাহিনী আজ সকলের কাছে তুলে ধরব, জগতের কাছে আমি মাথা নত করে ভিক্ষা চেয়ে যাব, যদি আমার পাপের গুরুভার তাতে এক বিন্দুও কমে!

মা বাপের আমিই একমাত্র সন্তান। আদর-সোহাগের মধ্যে বেশ মানুষ হয়ে উঠতে লাগলুম, স্কুলে গিয়ে লেখাপড়াও মন্দ হল না, তার জন্য চারিদিকে আমার নাম ছড়িয়ে গেলও বেশ। দেখতে শুনতে কেমন ছিলুম বলতে পারিনি, তবে অনেকেই যে আমায় দেখে থমকে দাঁড়াত বা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমার পড়বার ঘরের দিকে লোলুপ নয়নে চাইত, সেটা এখনও বেশ মনে পড়চে। তারপর কোনদিন যে আমার অজ্ঞাতে আমার নামটি যৌবনের খাতায় উঠে গেল জানিনি,—যৌবনের অলঙ্কার আমার দেহে ফুটে উঠে অনেককেই লুব্ধ করল। আমারও দেখতে দেখতে প্রণয় কুঁড়িটি ফুটে উঠল, পাশের বাড়ীর তাঁকে অজ্ঞাতসারে ভালবেসে ফেললুম, সেই আমার কাল হল। তারপর যা হয়ে থাকে; অনেক ঝুলোঝুলির পর উপন্যাস প্রথার মত আমাদের চার হাত এক হ'য়ে গেল। "গোত্তরে মিলচে না" বলে রাঙ্গাদি' আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু যেহেতু আমি শিক্ষিতা, পিতা 'গররাজী' হয়ে কাজ সেরে ফেললেন।

তাঁর কলেজে পড়া, বিদেশে থাকতেন। কিছুদিন চিঠিতে চিঠিতে প্রেম অভিনয় হল। ছুটি-ছাটার দিন আমি পথের দিকে পথিকের পানে চেয়ে তাঁর মুখের সাদৃশ্য খুঁজতুম। তারপর হয়ত তিনি আসতেন, আমায় কোলে বসিয়ে সর্ব্বদেহে চুমো খেয়ে আমায় রাঙ্গা করে দিতেন, মনে মনে ভাবতুম আমি কোথায়!

২

এরপর অনেক দিন গেল, ছেলেপুলে হ'ল না। তিনি আর ঘন ঘন আসতেন না, হয়ত দুমাস অন্তর একবার। ক্রমে তাও বন্ধ হল, ছ মাসে ন মাসে;

তারপর মোটেই না। আমার প্রথম অভিমান, তারপর রাগ, তারপর চিন্তা হল, চিঠি লিখে লিখে উত্তর পেলুম না। মা বাবা ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছিলেন, একটি ছোট ভাই ছিল, তাকে অনেক জায়গায় পাঠিয়েছিলুম, কোন কাজ হয়নি। আমি মনমরা হয়ে রইলুম।

হঠাৎ একদিন তিনি বাড়ি এলেন। অভিমান করার অবসর না দিয়েই আমায় চুমো খেয়ে বললেন, "চারু, ভাল ছিলে ত? আমি অনেক দিন আসি নি।"

তাঁর মুখে মদের গন্ধ পেয়ে আমি শিউরে উঠেছিলাম, ভাবলুম এসব তাঁর কপটতা। অনেক কথাবার্ত্তার পর হঠাৎ আমি বলে ফেললুম, 'লোকেরা সব তবে নানা কথা বলে তা সত্যি?"

তিনি ভীম মূর্ত্তি ধরে বললেন, "লোকের কথায় যদি তুমি বিশ্বাস কর তাহলে তোমার ভালবাসার বাঁধন নেই।"

তিনি আর কিছু না বলে চলে গেলেন; আমি আর কি করব, পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম।

৩

একদিন রাতে একখানা গাড়ী এসে তাঁর দরজায় দাঁড়াল। ঘুমের ঘোরে টের পেলুম না আমার বুকের ধনকে ছিনিয়ে নেবার জন্য এক প্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গে এল। খানিকপরে গাড়িখানা গড়গড় করে যেন আমারই বুকের উপর দিয়ে চলে গেল। সকালবেলা আমি জানলায় এসে দাঁড়ালুম,—আমার জানালা দিয়ে তাঁর ঘর দেখা যেত,—দেখলুম এক তরুণীর সঙ্গে তিনি হাস্যালাপ করচেন। আকার ইঙ্গিতে বুঝলুম সে বেশ্যা। আমার গায়ের রক্ত চনচন করে উঠল, চক্ষের জল আমার শুকিয়ে গেল, অভিভূতের মত যেন আমার দেহ অবসন্ন হয়ে এল। এক লহমায় আমি সমস্ত ব্যাপার টের পেলুম। ছুঁড়িটার নাম হেমন্ত। দুতিন দিন বাদে তিনি তাঁর বাড়ীতে আমায় নিয়ে এলেন, চক্ষের সম্মুখে ব্যাভিচার হতে লাগল। হেমন্ত তাঁকে গ্রাস করে রইল, আমি কথা কইবারও অবসর পেতুম না। দিন কতক পরে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না,—প্রতিহিংসার জ্বালায় আমি উন্মত্ত হয়ে উঠলুম, শয়নে স্বপনে অহোরাত্র প্রতিশোধের উন্মাদনায় আমি উদ্ভ্রান্ত হলুম। সর্বদা মনে হতে লাগল,—রক্ত, রক্ত; আহারের দিকে চাইতুম,—রক্ত; জলের দিকে চাইতুম,—রক্ত; বাতাস বইত যেন বলত,—রক্ত, রক্ত, সূর্যের উদয় অস্ত দেখতুম যেন রক্ত ঝরে পড়চে; তারা দুজনে কথা কইত,—আমার গায়ে এসে যেন রক্তের ছিটে লাগত। একটা পৈশাচিক প্রবৃত্তিতে আমি ধড়ফড় করে উঠলুম, আমার আমিত্ব ভুলে গিয়ে কঠোর প্রতিহিংসার জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। চট করে আমার মাথায় পিশাচ জেগে উঠল।

আহার যোগানের ভার আমার ওপরেই ছিল।

তোমরা আমায় যা ইচ্ছে গালি দাও আমার দুঃখ নেই, যদি তা'তে আমার পাপের ভার কমে।

আমি হেমন্তর আহার দ্রব্যে উগ্র বিষ মিশিয়ে দিলাম! তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম,—হেমন্তের মৃতদেহের জন্য। "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী—"তা আমার মনে আসে নাই। শুধু এই কথা মনে হচ্ছিল, "তোমার ভালবাসার বাঁধন নেই।',

৪

একটা অস্ফুট গোলমালে আমার চমক ভাঙ্গল। প্রতিহিংসা চরিতার্থের উচ্চ অট্টহাস্যে আমি ঘরখানা পুড়িয়ে দিলাম। কিন্তু সর্ব্বনাশ। হেমন্ত ছুটে এসে বললে, "ওগো, শিগগির এস।"

সে আর আমি উন্মাদিনীর মত ছুটে এলুম, তাঁর মুখ দিয়ে তখন ভলকে ভলকে রক্ত উঠচে,—তিনি বললেন,—"আমি সব জানি, চারু! ভালবাসা কাকে বলে তুমি জাননা, হয়ত জীবনাবধি তোমায় অনুতাপ কত্তে হবে।" আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল, অজ্ঞান হয়ে সেইখানেই পড়লুম।

যখন জ্ঞান হল দেখলুম চারিদিকে পুলিশ গিস্ গিস্ করচে। তাঁর লাস তখন চালান দেওয়া হয়েচে, সামনে দুজন পুলিশ হেমন্তকে ধরে রয়েচে,—চক্ষের জলে যেন সে ভেসে যাচ্চে!

বিচার আরম্ভ হল। হত্যাকারিণী পিশাচিনী আমি তখনও সত্য কথা বললুম না,—আমার হল বেকসুর খালাস। হেমন্তর চোদ্দ বৎসর দীপান্তর হল,—কেননা সে কাপড়ের ভিতর লুকোনো বিষ খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তাঁকে হত্যা করেচে। আমি এই বিচার শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিলুম, তারা ভাবলে, সাধ্বী সতী স্বামী শোকে বুঝি উন্মাদিনী হয়েচে।

আমার পাশ দিয়েই পুলিশের লোক হেমন্তকে নিয়ে গেল। তার চক্ষের এক ফোঁটা জল আমার গায়ে পড়ল—সেটা অনুতাপের কীট।

৫

তারপর চোদ্দ বৎসর নানাদেশে ঘুরেচি; কোথাও শান্তি পাই নাই। অনুতাপের দহনে তিলে তিলে দগ্ধ হয়েচি। কাশীতে একদিন গঙ্গার ঘাটে এক সন্যাসিনীকে দেখেছিলুম,—স্ত্রীপুরুষ ব'সে তার কাছে যোগ শিক্ষা ক'রচে। আমি ছাড়া এ রহস্য আর কেউ জানত না, কারও কাছে ব'লে আমি আমার পাপের ভার লাঘব করিনি—যদি বা তাতে বাড়ে! মনের শান্তি পাবার আশায় সব কথা তাকে বলব ভেবে তার কাছে গিয়ে বসলুম।

তোমরা কেউ আশ্চর্য্য হ'য়োনা, সেই সন্যাসিনীকে চিনতে পারলুম—সে

হেমন্ত। চোদ্দ বৎসর অনুতাপ করার পর সে তার জীবনটিকে নূতন ছাঁচে ঢেলেছিল। আহা! সেই বা এখন কোথায়!

*   *   *

বহুদিন চলে গেছে। সে সন্ন্যাসিনীর আর খোঁজ পাই নি। তার কাছে পাপ স্বীকার করেছিলুম—সেই মুহূর্ত্তে তার মুখখানি এমন জ্যোতির্ম্ময় হয়ে জগতের চক্ষে নিষ্কলঙ্ক হল যে আমাকে মাথা নত করতে হয়েছিল। আমি? আমার মুক্তি নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। আছে তীব্র অনুতাপের জ্বালা, অন্তর্বিদ্রোহের বিভীষিকাময় উত্তাপ, অশান্তির লেলিহান অগ্নিশিখা! তাই আজ এই আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়ায় দাঁড়িয়ে তোমাদের কাছে ভিক্ষা করছি,—ওগো দাও আজ একটু ক্ষমা, একটু স্নেহ তাই এই স্মৃতিহীন মহাযাত্রার মহামূল্য পাথেয় স্বরূপ নিয়ে যাই। দুই চক্ষু আজ অন্ধ, বাত পক্ষাঘাতে আজ পঙ্গু,—স্থবির বৃদ্ধাকে তোমরা পথ দেখাও,—ওগো প্রায়শ্চিত্তের উপায় বলে দাও। আজ ঘোরতর পাপীর পায়ে ধরেও আমি বলচি—আমার চেয়ে পাপী জগতে নেই, ওগো, দাও একটু মার্জ্জনা, একটু মনের শান্তি!

ওই, ওই আবার সেই উৎকট করাল মূর্ত্তি, ওই তার হাত কণ্টকময় লৌহদণ্ড। আঁধার, আঁধার! আকাশ, বাতাস, পৃথিবী সকলই আঁধার! কেবলই,—ওই যে তার জ্বলন্ত চক্ষু—ওই তার বিভীষিকাময় অগ্নি কটাক্ষ! অসুর-অবতার, ওই যে তার রক্তাক্ত দেহ, হাত রক্ত, মুখে রক্ত, চক্ষে রক্ত! ওই বাতাস গর্জ্জে উঠল, প্রলয়ের সূচনায় প্রকৃতি নড়ে উঠল, বজ্রের তাড়নায় দিগন্ত কেঁপে উঠল,—ওই আবার সকলে বলচে, "তোমার ভালবাসার বাঁধন নেই, জীবনাবধি তোমার অনুতাপ ক'র্ত্তে হবে"—ওঃ!

আমি মাথা পেতে দিচ্ছি, তোমরা পদাঘাত কর।

আগ্নেয়গিরি

সামান্য কথা লইয়া বিবাদ। যেখানে আত্মীয়তাবোধ নাই, সেখানে নগণ্য ত্রুটি লইয়াও বচসা বাধিয়া যায়।

মানদা কহিল, শুতে পারিসনে আলাদা? তোর ঘর নেই? নিজের বেলা আঁটিসুঁটি!

নলিনী কহিল, ভারি জায়গা তোমার, গাছতলায় পড়ে থাকি; না একখানা মাদুর, না একটা বালিশ? ঘর আমারও আছে, দেশে গেলে পায়ের ওপর পা দিয়ে—

তাই যা না, মরতে কেন আসিস আমার ঘরে? ডাইনী কোথাকার! খবরদার, তুই আমার ছেলের গায়ে হাত দিবিনে, আজ থেকে আমি বলে রাখলুম।

নলিনী চেঁচাইয়া উঠিল, লম্বা লম্বা কথা! কে চায় তোমার ছেলেকে? আমার ঘরে আসে কেন? কেন যখন-তখন নোংরা করে যায়? কিছু বলিনে তাই!

মানদাও জবাব দিল। কহিল বলবি কি লা? কোম্পানির রাজত্ব, বলে পার পাবি? দিনের বেলা বাওচাল্লি, রাতের বেলা মরতে আসিস কেন আমার আঁচলের তলায়? অত যদি ভূতের ভয়, ঘরভাড়া নিলি কেন?[1] ভূত, তুই তো ভূত একটা, ভূত তোর ইয়ে—

মুখ সামলে কথা বোলো মানদাদি, ভাল হবে না কিন্তু—বলিয়া নলিনী তাহাকে শাসন করিয়া দিল। কহিল, অমনি থাকতে দাও, কেন? দু-দুটো ছেলে তোমার হাসপাতালে যখন কাজ করতে যাও, কে রাখে তোমার ছেলেকে? বাসন মেজে দিইনে? দু' আনা, এক আনা নাও না যখন-তখন? রাতে একটু কাছে শুই বলে আবার চোখরাঙানি।

মানদা কহিল, অমনি করিস, কেমন? রাঁধে কে শুনি? খাসনে তুই আমার গতরে? এক হাঁড়ি ভাত পর্যন্ত নামাতে জানিসনে, মেজাজ দেখাতে এসেছিস!

নলিনী গরগর করতে লাগিল। নিজের ঘরে গিয়া নিজের মনেই বকিতে

লাগিল, রান্নার আবার খোঁটা দেয়! কী না করি, ওর কুকুরটাকে আমি খেতে দিইনে? ওর ছেলের ঝি-গিরি করিনে? লম্বা লম্বা কথা। থাকব না, কিছুতে থাকব না অমন ছোটলোকের সঙ্গে—

ওধার হইতে মানদা গরগর করিতেছিল, মুখ খসে যাবে, ও তেজ থাকবে না! বুকে করে ওকে সামলে রেখেছি। বলি, আহা সোমত্ত বয়সে, কোথায় কোন বিপদে পড়বে, থাক আমার কাছে। যা না কোথায় যাবি? আমিও দেখব, যদি বেনের মেয়ে হই, কে তোর মাথা রাখে ছাতা দিয়ে।

ভারি দেখছ তুমি, বেনোজল ঢুকিয়ে ঘেড়াজল টানছ, বসে বসে কায়েতের মেয়েকে শুষে খাচ্ছ! তোমাকে যেন আর আমি চিনিনে?

এমন সময় আমি আসিয়া ইহাদের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। হাসিয়া কহিলাম, থালা বাটি বুঝি একসঙ্গে থাকবার জো নেই, কেমন? এ-বেলা কি নিয়ে লাগল, ও মানদাবাবু?

মানদার হইয়া নলিনী বাহির হইয়া আসিল। কহিল, এ-বেলা লাগল আপনার মাথা নিয়ে।

বলিলাম, মাথার দাম আছে গো, দৈনিক কাগজে চাকরি করি। রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে বস্তি-সাহিত্য পর্যন্ত লিখতে পারি।

নলিনী কহিল, পারবেন বৈকি, শেষেরটাই আপনার হাতে মানাবে ভাল।

ভারি লজ্জিত হইলাম। নলিনী কাহাকেও ছাড়িয়া কথা ক'বার মেয়ে নয়। খোঁচা দিয়া কথা না বলিলে তাহার কথা বলাই হয় না। বলিলাম, রাগ করলেই ভাত বেশি খেতে হবে, অত চট কেন? নলিনীবাবু, তুমি বড় রগচটা!

নলিনী কহিল, দেখুন না, যখন-তখন রান্নার খোঁটা দেয়! আমি বুঝি গতর খাটাইনে? মাস মাস টাকা ঢালছি কিসের জন্যে? ওর ছেলের ঝি-গিরি করে আমার হাড় কালি হ'ল, দেখতে পায় না?

মানদা ছুটিয়া আসিল। কহিল, ঠাকুরপো, জিজ্ঞেস করো দিকি আমার ছেলে ধরতে কে বলে ওকে? ছোট ছেলে, ওদের কি জ্ঞানগম্যি আছে? মাসি বলে ছুটে যায়। তাড়িয়ে দিলেই ত' পারিস।

নলিনী কহিল, তাড়িয়ে দেব, শোনে কিনা আমার কথা? এত মারি ধরি তবুও ত' কাছছাড়া হয় না। আমি কি ডাকতে যাই? পরের ছেলের ওপর অত দরদ আমার নেই।

বলিলাম, বটেই ত', কেন থাকবে, মিথ্যে কথা !

মানদা হাত উঁচু করিয়া শাসন করিয়া কহিল, আজ থেকে যদি আমার ছেলে তোর কাছে যায় তবে ওদের মেরে খুন করব।

মেরো, খুব মেরো, খুন কোরো, তাতে আমার কি ? জাত নয়, জ্ঞাত নয়, রাস্তার লোক ! মারলেই অমনি হয় না, পুলিশ আছে, বিচার আছে।—বলিয়া নলিনী ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল।

মানদা কহিল, বেশ করব, খুন করব, ছেলে আমার, আমি ওদের পেটে ধরেছি।—এই বলিয়া সেও রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। দুইজনের রাগ আর পড়িতে চায় না।

ঘরের ভিতর হইতে আমাকে শুনাইয়া নলিনী কহিল, খুন করে আদালতে গিয়ে বোলো, তারা সন্দেশ খেতে দেবে।

ইহারা দুইজনেই ভদ্রঘরের মেয়ে, সে কথাটা ইহারা দুইজনেই মাঝে মাঝে কেন যে ভুলিয়া যায়, তাহা বলিতে পারিব না। সম্ভবত ভাষার চেহারা বদলাইয়া এমন কলহ অভিজাত সমাজেও হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রকাশটা হয়ত কিছু সংযত। ঝগড়া থামাইতে আসিয়াই ইহাদের সহিত আমার আলাপ হয়, সেই আলাপ হইতেই ঘনিষ্ঠতা। সকাল বেলা কোনদিন নলিনী আসিয়া ঠাকুরের প্রসাদ আমাকে খাইতে দিয়া যায়, কোনদিন মানদার হাতে পাই আলুর চপ অথবা ইলিশ মাছ ভাজা। আমি ভালই আছি।

মানদার স্বামী আছে, সে লোকটি কোন-এক কোম্পানির হইয়া সুগন্ধী তেল সাবান বিক্রয় করিতে মফঃস্বলে যায়, এবং একবার গেলে পনের-কুড়ি দিন বাড়ি ফিরে না। তাহার উপার্জন সামান্য। মানদাও বসিয়া থাকে না, কোন-এক লেডি ডাক্তারকে ধরিয়া প্রসূতি পরিচর্যা করিয়া সামান্য কিছু কিছু আনে। দুইটি ছেলে হইয়াছে। নলিনী ইহাদের মধ্যে আসিয়া অনেকদিন ধরিয়াই আছে। সে কায়স্থ ঘরের কন্যা, তাহার কে আছে এবং কে নাই, কেনই বা এখানে আসিল, এখানে থাকিবার তাহার কি প্রয়োজন—আমি ইহার কিছুই জানি না। কেবল এইটুকু জানি, সে এইখানেই কোন-একটা মেয়ে ইস্কুলে ছোট ছোট বালিকাদের তত্ত্বাবধান করিতে যায়। সারাদিন সেখানে থাকে, বিকাল বেলায় বোর্ডিংয়ে কি-একটা কাজে যায়। মাসে পনেরটি টাকা সে উপার্জন করে। তাহার চেহারার শ্রী না থাক, স্বাস্থ্যটা আছে অটুট।

ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় নলিনী বাহির হইয়া আসিল। আমি বলিলাম, ও কি, খেয়ে গেলে না যে নলিনীবাবু ?

নলিনী বলিল, না, ওর হাতের রান্না···এই আমি দিব্যি করলুম—বলিয়া বাহির হইয়া সে ইস্কুলে চলিয়া গেল।

বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় মানদা আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, যুদ্ধের ঘোড়া, দেখলে ত ঠাকুরপো? আমি বলি, যা তোর যেখানে খুশি, এটা ত' আমার হোটেল নয় যে, যাকে তাকে ঘরে রাখব? ছেলে দুটোকে বশ করেছে!

বলিলাম, তোমার ছেলে দুটোও যে ওকে ছেড়ে থাকতে পারে না। সেদিন দেখি সন্ধ্যে বেলা মাসি ফেরেনি বলে কান্না নিয়েছে।

মানদা কি যেন কিয়ৎক্ষণ ভাবিল, তারপর কহিল, তেজ করে না খেয়ে গেল, বয়েসের গরম! কার ওপর রাগ করিস, শুনি? নিজের পয়সায় নিজে খাবি··· তোর টাকায় ত' আর আমার সংসারের সাহায্য হয় না!

বলিলাম, একটু যদি মানিয়ে-বনিয়ে চলা যায়—

কেমন করে চলবে, মেজাজ যে ঠাণ্ডা নয়, রাগটাই বড়, রাগ ওর সকলের ওপর। সেদিন আমার ছেলেটাকে মেরে আধমরা করলে।

তাই নাকি, তুমি কিছু বললে না মানদাবাবু?—বলিয়া হাসিলাম।

মানদা কহিল, বলব? ওরে বাবা, ওর কাজের ওপর কথা বললে আমার মাথা থাকবে? ছেলেটাও যে ওর আঁচলধরা ঠাকুরপো! অত মার খেয়েও দেখি, ওরই কোলে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল। ডাইনীর হাত থেকে ছেলে দুটো আমার বাঁচলে হয়!—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ছুটির দিনে সন্ধ্যোবেলা নিজের ঘরে বসিয়া লিখিতেছি, এমন সময় নলিনী আসিয়া আমার ঘরে ঢুকিল! সাড়া দিয়া কুণ্ঠিত হইয়া লোকের ঘরে ঢুকিবার বদ অভ্যাস তাহার নাই, তাহার আবির্ভাবের ভিতরে যেন আক্রমণের ভাবটাই প্রবল। উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, এমন অসময়ে যে নলিনীবাবু?

সে কহিল, আমার অসময় নয়। খাঁচায় ঢোকবার আপনার শ্রীচরণদর্শনে এলুম। আপনার ঘরটি বেশ ভাল।

কেন?

বই-কাগজের গন্ধ। দেশ-দেশান্তরের খবর আপনার ঘরে ঘুরে বেড়ায়। আপনার সুখের জীবন।

হাসিয়া বলিলাম, নদীর এপার বলে, ওপার ভাল।

নলিনী আমার ঘরের চারিদিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল,

তারপর কহিল, আমারও ইচ্ছে ছিল খুব লেখাপড়া শিখি। হল না। যাকে খেটে খেতে হবে তার আবার অত শখ কেন ?

বলিলাম, নলিনীবাবু, লেখাপড়া শিখেও ত' উপার্জন করা যায়।

নাঃ, অনেক শিখে যা পাব, পরিশ্রম করেও আমি তাই পাব। লেখাপড়া করবার সময় নেই, পেট চলবে না,—বলিয়া নলিনী ম্লান হাসি হাসিল।

বলিলাম, যাই বল, তুমি একটু বদরাগী কেমন না ?

তা হবে।—নলিনী কহিল, বলব না, আমাকে ফাঁকি দিতে আসে কেন ? ভারি শয়তান, এই আপনাকে বলে রাখলুম। কি করে—শুনবেন ? মাসকাবারে টাকা নেয় আমার কাছে আদায় করে, খেতে দেয় ছাইভস্ম। রুক্ষু ডাল, দুখানা আলু আর সরষের তেল, এই ত' খাই। চালের মন সাড়ে তিন টাকা, দশ সেরের বেশি চাল খাইনে। বাট টাকার হিসেব দিন ত' ? তাছাড়া দু টাকা ঘরভাড়া—বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

বলিলাম, অন্য জায়গায় তোমার বুঝি যাবার কোন সুবিধে নেই ?

আমার কথার উত্তর সে দিল না। কহিল, একখানা ভাল কাপড় কি ওর জন্যে থাকবার জো আছে ? ভাল জামা, ভাল শাড়ি সব প'রে প'রে উনি যাবেন কাজ করতে। কার না কার নোংরা, আমি কি আবার সেসব ফিরিয়ে নিতে পারি ? আমার জন্যে ওর জামা-কাপড়ের খরচ বাঁচে। বড় শঠ মেয়েমানুষ, বুঝলেন ?

বলিলাম, তুমি পাও পনের টাকা, এত ভাল জামা-কাপড় তুমি কোথা থেকে—?

গান গাই যে।—নলিনী কহিল, বোর্ডিংয়ের মেয়েদের গান শোনাই, তারা খুশি হয়ে আমাকে দেয়। ওমা, তারা সব বড়-বড় ঘরের মেয়ে। ও কোথায় কী পাবে ? দুদিন খাটলে তবে পায় এক টাকা।—চুপি চুপি সে পুনরায় কহিল, একদিন কার বাড়ি থেকে যেন একটা শেমিজ চুরি করে এনেছিল, তারা আর বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি !—বলিয়া সে যেন পরম আনন্দে হাসিতে লাগল।

তাহার হিংস্র হাসি দেখিয়া আমি কহিলাম, যার এত নিন্দে করছ সে ত' তোমাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে, নলিনীবাবু ?

নিন্দে এর নাম ? এর কোন্‌টা মিথ্যে বলুন ত' ? সব সত্যি, আপনাকে দিব্যি করে বলছি। হ্যাঁ, আশ্রয় আমাকে দিয়েছে বটে, সে ত' নিজের সুবিধের জন্যে।

বলিলাম, তুমি তার জন্যে উপকৃত !

নলিনী কহিল, যদি তাড়িয়ে দেয়, চলে যাব। জায়গার কি অভাব? তা ছাড়া—

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাছাড়া কি ?

বাতির আলোর দিকে চাহিয়া সে ম্লান হাসিয়া কহিল, আমার জীবনের দাম নেই। বোঁটা থেকে খসে পড়েছি। উড়ে উড়েই ত' বেড়াতে হবে।

বলিলাম, কি জান নলিনীবাবু এমনি করে দিনের পর দিন নোংরা ঘাঁটলে মন ছোট হয়ে যায়।

হোক না ছোট, দেখি না কতদূর!

ইহার পরে আর কথা চলে না, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু নলিনী চুপ করিয়া ছিল না, মনে মনে সে যেন কী কথা ভাবিতেছিল। এক সময়ে কহিল, কথায় কথায় আমাকে খোঁটা দেয়, বলে, তুই থাকিস কেন? আরে, আমি থাকলে তোর সম্মান বাড়ে যে, আমি ভদ্রঘরের মেয়ে। জানি অনেক নীচে নেমে গেছি, তবু ত' জাতসাপের বাচ্চা। আর তুই? জানিনে বুঝি তোর কিছু? বলতে গেলে অনেক কথা—বুঝলেন?

অনেক কথা আমার শুনিবার কোন কৌতূহল ছিল না—নলিনী তাহা বুঝিল। সে কহিল, বেঁধে রেখেছে তাই সহজে—

বলিলাম, কে বেঁধে রাখল তোমাকে?

শত্তুরে। আর জন্মের দেনা। শেকল ছিঁড়ব যেদিন, বুঝবে। মায়াদয়ার মাথায় ঝাড়ু। কার জন্যে কার আটকায় বলুন ত'?—নলিনী কহিল, যার চালচুলো নেই, আপন-পর নেই, সে আবার বাঁধন মানবে কেন? আমি ওসব পরোয়া করিনে।

বলিলাম, নলিনীবাবু, তোমার আত্মীয় এখানে কে কে আছেন?

আত্মীয়!—নলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, সবাই আমার আপন—আচ্ছা, আজ উঠলুম।

বলিলাম, হাতে তোমার কী, লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছ যে?

নলিনী কহিল, বাবা রে, কী সন্দেহ! আপনার ঘরের কিছু নয় গো মশাই—

না, না। তা বলিনি—। আমি হাসিলাম।

এ দুটা জাপানী খেলনা—। বলিয়া সে দুইটা কাগজের বাক্স দেখাইল।

বলিলাম, খেলনা? কার জন্যে?

নলিনী হাসিয়া কহিল, এটা মোটরগাড়ি, আর এটা রেলগাড়ি!—এই বলিয়া

সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বুঝিলাম শৃঙ্খলটা তাহার কোথায়, কোথায় সে বাঁধন মানিয়া চলিতেছে। বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় বোধকরি এমনি করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

আমি ইহাদের নিয়মিত খোঁজখবর লই না, লইবার কথাও নয়, এবং তাহার অধিকারও আমার নাই। মেয়েমহলে ঘুরিয়া স্নেহ আদায় করিয়া বেড়ান আমার পেশা নয়। মাঝে মাঝে মনে হয় দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এ-পাড়ায় আসিয়া পড়িয়াছি। দিবারাত্র বিশ্রী কলহ শুনিয়া শুনিয়া সত্যই আমিও যেন ছোট হইয়া যাইতেছি। পুরুষের তত্ত্বাবধানে না থাকিলে মেয়েরা অতি সহজেই পরস্পরকে নখরাঘাত করে। আমার ঘরের উপরতলায় রজনী তাহার পরিবারকে লইয়া ছিল, কিন্তু স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যুর পর সে তাহার শিশুকন্যাকে লইয়া ঘর ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে আমি তাহার সন্ধান জানি না। আমিও শীঘ্র চলিয়া যাইব, বাড়িওয়ালাকে এক মাসের নোটিশ দিয়াছি।

সেদিন সকালবেলা ইহাদের ভিতরে আবার একটা প্রবল গণ্ডগোল বাধিল। সামান্য কলের জল লইয়া ঝগড়া। তাহার পরে শুনতে পাইলাম, বড় ছেলেটা রান্নাঘরে গিয়া কি যেন অপাট করিয়াছে। মানদা তাহাকে প্রহার করিতে আসিল, নলিনী দিল বাধা। ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন অকারণে ইহাদের অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকে, সুযোগ পাইলেই গলগল করিয়া বাহির হয়।

মানদা কহিল, মা'র পোড়ে না পোড়ে মাসির— নলিনী কহিল, পুড়ে ত' ছাই হল। মারো না, মেরে একবার মজাটা দ্যাখো। আমার ওপর ঝাল, কেমন?

ঝাল নয়? কোন্ আঁস্তাকুড়ে ঠাঁই পেয়েছিলি? মরতে এলি কেন আমার ঘর জ্বালাতে? ওরে বাবা রে বাবা, কালকুটে মেয়েমানুষ।

তুমি কম, কেমন? তুমি আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে বেড়াওনি? মাথায় সিঁদুর মেখে এখন গেরস্থালি করতে এসে,—সাবধান, আমাকে ঘাঁটিও না, এখুনি ধুড়ধুড়ি নেড়ে দেব।

ঝঙ্কার দিয়া মানদা কহিল, আশকারা দিয়ে ছেলেদুটোকে নষ্ট করতে চাস, কেন লা? কথায় কথায় শাসন! তোর খাই না পরি? সোয়ামি-পুত্তুর নিয়ে ঘর করি, তোর মতন উড়ানচুড়ে? কই, তাকে বেঁধে রাখতে পাল্লি? কি খ্যামোতা তোর? না রূপ না গুণ! চ'লে ত' গেল লাথি মেরে! আবার কথায় কথায় বলে, ধুড়ধুড়ি নেড়ে দেব!

হঠাৎ একটা দাপাদাপির শব্দ পাইলাম, তাহার পরেই বড় ছেলেটা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই মুহূর্তে মানদাও গর্জন করিল, মারলি আমার ছেলেকে, এত বড় আস্পদ্দা? এখুনি পুলিশ ডাকব, হাতকড়া দিক এসে।— ওগো, কে কোথায় আছ—

দ্রুত পদে গিয়া তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মানদা কহিল, ঠাকুরপো, ওর হাত দুখানা বাঁধো। সাধে বলি খুনে মেয়েমানুষ?

ছোট দুইটা ছেলে 'মাসি মাসি' বলিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছিল। মানদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিল, খুন করলে আমার ছেলেকে। করবেই ত'। ও যে নষ্ট-দুষ্ট, ওর কি মায়া-দয়া আছে? তুমি এর হেস্তনেস্ত করো ঠাকুরপো, আমি ছাড়ব না। ওর রাগের কি আমি ধার ধারি, তুমিই বল দিকি?

দুমদাম করিয়া নলিনী ঘরের ভিতর জিনিসপত্র ওলোটপালট করিতেছিল। নিজের ঘর সে আজ নিজেই ছারখার করিবে। তাহার আক্রোশ পৃথিবীর সকলের উপর।

বলিলাম, কেন এই রাগারাগি?

ও যে পাগল, মরিয়া—, মানদা কহিল, এসেছিলি কেন মরতে দেশ থেকে পালিয়ে? ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বল দিকি তোর কুমতলব ছিল কি না? ভদ্দল্লোকের ছেলেকে টেনে আনলি, তোর বেয়াড়াপনা সইবে কেন সে? আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।—ও ঠাকুরপো, ওই দ্যাখো আমার ঘরদোর সব ভাঙলে, ভাল হবে না কিন্তু—

এখান হইতে ডাকিলাম, নলিনী!

নলিনী উন্মাদিনীর মত বাহির হইয়া আসিল। তখনও তাহার শুষ্ক চক্ষু জ্বলন্ত আক্রোশে ধকধক করিতেছিল। কাপড় আলুথালু, চুলের রাশ এলোমেলো। উপর দিকে চাহিয়া সে বিদীর্ণকণ্ঠে কহিল, সব মিথ্যে, সমস্ত মিথ্যে, যা সবাই জানে তার একটুও সত্যি নয়। যাক, সব ভাঙুক, সব ছারখার হোক।— বলিতে বলিতে সে হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, অপমান কল্লে মানদাদিদি, আর থাকব না আমি তোমার কাছে, আর দেখব না তোমাকে এ জীবনে।

যেন একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় তাহার হৃদয়ের ভিতরের রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাহাকে বাধা দিতে গেলাম, সে মানিল না। নিজেকে কিছু পরিমাণে সংযত করিয়া পরনের কাপড় সামলাইয়া কি জানি কেন আমার পায়ের

কাছে আসিয়া একটা প্রণাম করিল, তারপর বড় ছেলেটার মাথায় মুহূর্তের জন্য একবার হাত বুলাইয়া সটান দরজা দিয়া পথে বাহির হইয়া গেল।

মানদা নীরবে সমস্ত লক্ষ্য করিল, তারপর শান্তকণ্ঠে বলিল, ছেলে রেখে যাবে কোথায়, ঠিক ফিরে আসতে হবে।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, ছেলে ত' তার নয়, মানদাবাবু ?

দেখিলাম, মানদার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। কেন জল আসিয়াছে, কী তাহার রহস্য, তাহা বুঝিলাম না, বুঝিবার চেষ্টাও করিব না। ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলাম।

দিন চারেক পরে মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় মানদা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। কহিল, ঠাকুরপো, চ'লে যাচ্ছ ?

বলিলাম, হ্যাঁ।

মানদা কহিল, ছোট ছেলেটার বড় অসুখ, হেদিয়েছে, কান্না থামছে না। তুমি তাকে ইস্কুল থেকে ফিরিয়ে এনে দাও ঠাকুরপো। নাকখত দিচ্ছি, আর ঝগড়া করব না।

বলিলাম, খোঁজ নিয়েছিলুম, ইস্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

ওমা তবে কোথা গেল ?—মানদা শিহরিয়া প্রশ্ন করিল।

কোথায় গেছে কেউ তার খবর জানে না। আচ্ছা, আমি যাই।—বলিয়া চলিয়া গেলাম। মানদা পাথরের মূর্তির মত পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।

মার্জ্জনা

…ঘৃণা, ঘৃণা! যে সমাজে মার্জ্জনা ভিক্ষার বিনিময়ে অত্যাচার, দুঃখ-জ্ঞাপনের বিনিময়ে অর্থের জন্য নিষ্পেষণ, সে সমাজকে বিপ্রদাস ঘৃণা করে। আর না, আর তার গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হওয়া,—যাহার মনুষ্যত্ব আছে, তাহার উচিত নয়। ঘৃণা ক'রে, অবজ্ঞা ক'রে, অবহেলা ক'রে তার মস্তকে, তার ব্যবহারে পদাঘাত ক'রে, দূরে সরে যেতে হয়।

সেই তিন বছরের কথা…সেদিন, সেই কাল অমানিশায় দুর্জ্জয় অন্ধকারের মধ্যে, সেই বর্ষার আকাশের রুদ্র তাণ্ডব নৃত্যের মধ্য দিয়ে যখন সে ছোট বোনের শ্বশুর-বাড়ী গেল। উঃ এখনও যেন কে দেহখানাকে ক্ষত বিক্ষত ক'রে দিচ্ছে, শত বৃশ্চিক-দংশনে জর্জ্জরিত ক'রে এখনও যেন কে বুকের ফুসফুসটো টেনে বার করছে। কেন, যার অর্থ নাই, সে কি জগতে এত হেয়, এত অমার্জ্জনীয় ঘৃণ্য, জাতিপাত সমাজচ্যুত হবার ভয় কি তার এতই বেশী? অর্থে যে লালিত, অর্থের ভোগে যে পুষ্ট, সে দুর্জ্জয়, অত্যাচারী হৃদয়হীন হ'লেও শাসনের পীড়ায়, অত্যাচারের আঘাতে তাকে সম্মান করতে হবে, কুকুরের মত পুচ্ছ সঞ্চালন করতে করতে তার পদলেহন করতে হবে?

তার পর,—তার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে—সে কি দৃশ্য! সর্ব্বাঙ্গে তার নিষ্ঠুর প্রহারের কালশিরা দাগ, আর তারি মাঝে মাঝে জ্বলন্ত লৌহশলাকার দগ্ধ ক্ষত!—পিতৃমাতৃহীন অনাথিনী বোনটি! ঝর ঝর করিয়া বিপ্রদাসের চক্ষু হইতে জল ঝরিয়া পড়িল। মরণার্ত্ত ভগ্নীর কাতর কণ্ঠ এখনও বুঝি বিপ্রদাসের মনে উঁকি দিয়া চীৎকার করিতেছে, শত বজ্রের নির্ঘোষে এখনও বুঝি ডাকিয়া বলিতেছে,—ওগো দাদা, এরা আমায় পুড়িয়ে মেরে ফেললে—তার পর চক্ষু দিয়ে তার শেষ অশ্রুবিন্দু কয়টি…তখনও তখনও মরন-যাত্রীটির চক্ষে উদ্বেগ-আকুল দৃষ্টি, যে দৃষ্টি কয় মুহূর্ত্ত মধ্যেই স্থির হ'য়ে আসবে,—দাদাকে এরা অপমান করে।…

সতীর চিতায় শুয়ে যখন বোনটি অনল-তপ্ত শেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল, নিষ্ঠুর সমাজ তার অচিরপ্রসূত একমাসের শিশুকে, সেই অন্ধকার বাদল রাতে সেই নদীর ধারের ঠাণ্ডা মাটির উপর উলঙ্গ শিশুকে ফেলে রেখে দিলে।

দরিদ্র নিঃসম্বল শিশু কন্যাটিকে কোলে তুলে সেদিনে ভেবেছিল, দিদি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মরণ-দুয়ারে দাঁড়িয়ে কি তার শেষ মর্ম্ম-ব্যথাগুলি আমায় জানিয়ে রেখে গেছে?

ক্ষিপ্রবেগে রক্তচক্ষু বিপ্রদাস তাহার নামাবলীর খুঁত হইতে বহু-যত্ন-রক্ষিত একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল,—এ অভাগা ভাইয়ের বুকে কেন এ তপ্ত শেল বিঁধে গেছিস্ দিদি আমার ?…বিপ্রদাস কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল,—পাষণ্ডটাকে পেলে আজ নখে ছিঁড়ে ফেলি।…তাহার মুখ ও চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস নিবিষ্ট মনে পত্রখানি পড়িতে লাগিল—

দাদা,

তোমার অভিমান আমি এ জীবনে ভাঙতে পারি নি,—আমি কত বলেছি, কত পায়ে ধরেছি, কিন্তু তুমি অচল অটল হয়ে হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করেছ,…ইহ জীবনে তুমি এখানে পদার্পণ করবে না…এরা তোমার মা-বোনকে অপমান করেছে বলে ? —কিন্তু ভুলে যাও কেন, তুমি দরিদ্র ! ভুলে যাও কেন তুমি দুঃখীর বুক-ফাটা কান্না কেঁদে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলে। এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলে শুধু কি স্বচক্ষে আমার মৃত্যু দেখবার জন্যে…যদি তাই ক'রে থাক তো দেখে যাও, এখনও বোধ হয় আমি দু'দিন বাঁচ্‌ব,—আমি উঠ্‌তে পার্‌ছি না, মেরে আমার হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে, আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে সমস্ত দেহে আমার ঘা ক'রে দিয়েছে,—মর্‌তে দেরী হচ্ছে বলে আবার বল্‌ছে বিষ খাইয়ে দেবে…ওগো দাদা, কেন তুমি কুঁড়ে বাঁধা দিয়েও জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব করনি। মা-বাবা অনেক দিন চলে গেছেন, কিন্তু দাদা, আমায় ছেড়ে, আমায় না দেখে তুমি থাক্‌তে পার্‌বে ? না তুমি এস না, এস না,—যদি তোমায় দেখে কিংবা তুমি যদি আমার এমন অবস্থা দেখ তা স্থির থাক্‌তে পারবে না, ঝগড়া কর্‌বে ;…এরা তোমায় অপমান করবে, তার চেয়ে আস্তে আস্তে আমায় মরতে দাও…আর লিখ্‌তে পার্‌ছিনে—

অভাগিনী সুশীলা

২

"মামা"—

বিপ্রদাস ফিরিল, সেই শিশু ! তার সারা দেহের সমস্ত রক্তটা ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। তাই কি ?…হাঁ তাই ; রক্তবীজ…হাঁ…রক্তবীজই বটে…তাহারই বংশধর, একটি বীজানু পড়িয়া তাহা হইতে শত সহস্র কোটি কোটি বীজের উদ্ভব হয়…বিপ্রদাস দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া উঠিল—কুচি কুচি ক'রে কেটে ফেলে প্রতিহিংসা নিবৃত্তি কর্‌তে হয়।

বালিকাটি কি একটা সংবাদ দিতে আসিয়া সহসা বিপ্রদাসের মুখের দিকে চাহিয়া ভীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

"আয় আয় মা নির্ম্মলা, তোকেই সে শেষ চিহ্ন রেখে গেছে, আয় কোলে আয়"

—বলিয়া বিপ্রদাস ক্ষিপ্তবেগে উঠিয়া নির্ম্মলাকে কোলে লইয়া আবেগভরে অজস্র চুম্বন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

কতকটা শান্ত হইয়া বিপ্রদাস স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল, "বল ত মা নির্ম্মলা, কি বলছিলে।"

বালিকা আধ আধ অস্পটভাষায় বুঝাইল যে কে একজন বাহিরে ডাকিতেছে। এই অসময়ে আহূত হইয়া বিপ্রদাস বিরক্তি বোধ করিল, অনুচ্চস্বরে বলিল, "কে ডাক্‌ছ, ভেতরে এস।"

যে আসিল সে বয়সে বিপ্রদাসের অপেক্ষা ছোটই হইবে, যৌবনের প্রান্ত সীমাবর্ত্তী; দারিদ্র্য তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, অকাল বার্দ্ধক্য তাহার দেহকে একেবারে জীর্ণ করিয়া দিয়াছে, দেহস্থিত বস্ত্র ছিন্ন, জীর্ণ, মস্তক তৈলহীন, অনাহারে বাক্‌শক্তিশূন্য। তাহার বিনীত ভাব দেখিলে দয়ার উদ্রেক হয়। ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞাসা করিল "এইটাই কি বিপ্রদাস মহাশয়ের বাড়ী?"

"হাঁ, আমিই।"

নবাগত বিস্ময়-স্তম্ভিত দৃষ্টিতে বলিল, "আপনি আপনিই বিপ্রদাস! এত বৃদ্ধ হয়েছেন আপনি?"

উত্তপ্ত ভাবে বিপ্রদাস বলিয়া উঠিল—"দুপুরবেলা ভাল লাগে না বাপু, কে তুমি বল আমি চিন্‌তে—"

অপ্রতিভ ভাবে নবাগত বলিল, "আমি,—অজিত।"

নিজের চক্ষুকে বিপ্রদাসর বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না, বলিল, "কে তুমি?" দেহের রক্ত তার টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল···

"আমি নকীপুরের জমীদারের—"

সহসা সে বিপ্রদাসের আকৃতি দেখিয়া ভীতচিত্তে বলিল, "আমি আপনার ভগ্নীর পাণিগ্রহণ—"

"পিশাচ স্ত্রী-হত্যাকারী—"

"বলুন, বলুন, আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আমার নিষ্ঠুরতা, হিংসার প্রতিশোধ ভগবান্ বেশ ভাল করেই দিয়েছেন···খুনের মামলার দায়ে আমার সমস্ত জমিদারী যথাসর্ব্বস্ব গিয়েছে, মা নৌকাডুবি হয়েছেন, বাবা না খেয়ে মরেছেন, আমি দু'বছর কারাবাসের পর আজ মুক্ত হ'য়ে এসেছি।···"

"তাই কি···তাই কি? সত্যই সে অনুতপ্ত? ধন-জন-যৌবনের উত্তাপে এইই না একদিন বিপ্রদাসকে পদাঘাত কর্‌তে আসিয়াছিল, এই না একদিন অর্থের আধিক্যে বিপ্রদাসের মাতা ও ভগিনীর নামে অপকলঙ্ক রটাইবার সাহস করিয়াছিল? এইই না তাহার প্রাণের প্রিয় সহোদরাকে তপ্ত লৌহে শেক দিয়াছিল? ···এখন কি সেই হিমাচ্ছন্ন ক্রূর সর্পকে বিপ্রদাস অনুগ্রহে পুষ্ট করিবে? উঃ, না-না, সে প্রতিহিংসা লইবে।···দীর্ঘ তিন বৎসর ব্যাপী তার নির্য্যাতিত প্রাণটা

ধিকিধিকি করিয়া জ্বালাময়ী প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধ হইয়াছে।…সে তিলে তিলে, প্রতি পলে প্রতিহিংসার সুন্দর উজ্জ্বল কামনাকে মনে মনে কত বর্ণেই না চিত্রিত করিয়া আসিয়াছে। আজ সেই শুভক্ষণ উপস্থিত। এই তার চির আকাঙ্ক্ষিত, অতৃপ্ত কামনার উদ্‌যাপনের অবসর।

"প্রাণঘাতী দস্যু—"

নির্ম্মলা একদৃষ্টে অজিতের পানে চাহিয়াছিল, অজিতের চক্ষু হইতে জল পড়িতেছিল…

মুহূর্ত্তের দৌর্ব্বল্যে সব ক্রোধ জল হইয়া গেল! চির অদর্শনের বস্তুর পানে আজ কুহকিনী বালিকা বিস্ফারিত চক্ষে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।…মূঢ় শিশু, অকৃতজ্ঞ রক্তবীজ!…না না, ও যে সুশীলার, সেই অভিমানিনী ভগ্নীটির শেষ স্মৃতিটুকু।…

দৌড়াইয়া বিপ্রদাস নির্ম্মলাকে কোলে তুলিয়া অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল।…

অজিত শ্রান্তভাবে মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

——

প্রবোধকুমার সান্যালের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রবোধকুমার সান্যালের সমগ্র জীবন বিত্তকে চারটি পর্বে বিভক্ত করা হলো। প্রথম পর্বের কাল পরিসর হলো জন্ম থেকে বিদ্যাশিক্ষা ও সাহিত্য জীবনের উন্মেষ কাল (১৯০৫ খ্রীঃ—১৯৩৮ খ্রীঃ), দ্বিতীয় পর্ব নির্দ্ধারিত হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল—সমাজে, জীবনে ও সাহিত্যে অনিশ্চয়তার অধ্যায় (১৯৩৯ খ্রীঃ—১৯৪৫ খ্রীঃ)। তৃতীয় পর্ব সূচীত হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের স্বীকৃতির বছর পর্যন্ত—সমাজ ও সাহিত্য জীবনে স্থিতির কাল (১৯৪৬ খ্রীঃ—১৯৫০ খ্রীঃ)। আর চতুর্থপর্ব গৃহীত হলো বিংশশতাব্দীর পঞ্চাশের দশকোত্তর কাল—সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের সুবর্ণ যুগ (১৯৩১ খ্রীঃ—১৯৫৩ খ্রীঃ)।

প্রবোধকুমার সান্যালের ব্যক্তি জীবন ছিল নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন। অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য ও শৈশবে পিতার মৃত্যুতে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিভাবকের অভাবে ছাত্রাবস্থায় জীবনকে সুষ্ঠভাবে গড়ে তোলার কোন সুযোগই তাঁর ছিল না। জীবনের সমস্যা, সংসারের প্রয়োজন উপেক্ষা করে তিনি একের পর এক বেসরকারী ও সরকারী চাকরী অল্প দিন করার পর পরিত্যাগ করে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন 'কল্লোল' গোষ্ঠীর মধ্যে এক স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী। ঐকান্তিক সাধনাই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের আসরে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি অর্থ, যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নিজস্ব অনন্য প্রতিভার গুণে। তাঁর মধ্যে ছিল বোহেমিয়ানিজম—যার ফলে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে তিনি নতুন স্বাদের গল্প ও ভ্রমনোপন্যাস নামে একটি নতুন ধারার অভিযোজন করতে সমর্থ হন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার তাপেই তাঁর সাহিত্য বিকশিত হয়ে উঠেছে। প্রবোধকুমারের পরিচয় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত। তাই এই প্রথিত যশা সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত জীবন তথা বাংলা সাহিত্যের রসিক পাঠক ও অনুরাগীদের জন্য পরিবেশিত হলো।

জন্ম ও বাল্যকাল

১৯০৫ সাল। এক ঐতিহাসিক বছরের ৭ই জুলাই শুক্রবার সারাদিন বৃষ্টি ঝরছে অঝরে। বাংলার জনজীবন বিধ্বস্ত। এমনি দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড বালফোর ভারত সচিবের মুখে ঘোষণা করলেন বেঙ্গল পার্টিশন। বাঙালী জাতির চরম দুর্দিন। সমাজ জীবন অনিশ্চিৎ। ঐ দিনই সুরেন ঠাকুরের বাড়ীতে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিল কয়েকজন মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ বাঙালী—বাংলার বুকে জন্ম নিল বিপ্লববাদের। এমনি অচিন্ত্যনীয় সামাজিক পরিবেশে ও সাংঘাতিক আকাশ ভাঙা প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাতে উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানের এক বাড়ীতে বিদ্যুতের ঝলক আর বৃষ্টির প্রবলধারা বরণ করে নিল এক দুরন্ত শিশুকে—বজ্রের হুঙ্কার ধ্বনির মাঝে শোনা গেল সদ্যজাতকের কান্না আর সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো বাড়ী কাঁপিয়ে মঙ্গল-শঙ্খ।

পিতা রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল মাতা বিশ্বেশ্বরীদেবী। জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই পিতা রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল পরলোক গমন করেন। সংসারে এমন কেউ নেই যে, এই দুর্ভাগ্যের দিনে বেসামাল সংসারের হাল ধরতে পারেন। তাই মামার বাড়ীতে প্রবোধকুমারকে মা ও অন্যান্য ভাই-বোনেদের সঙ্গে আশ্রয় নিতে হয় শিশুকালেই। ছোটবেলায় প্রবোধকুমার ছিলেন খুবই দুরন্ত প্রকৃতির। অজানাকে জানবার কৌতূহল বালক প্রবোধকুমারের ছিল অপরিসীম। যেখানে ভয়, বাড়ীর লোকেরা বালকের বিপদের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত, সেখানে লুকিয়ে যাওয়া তাঁর চাই। অতি ছোট বয়সেই একদিন হারিয়ে যান কলকাতার পথে—বারাণসীর পথ খুঁজতে। পুলিস রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে আসে বাড়ীতে, সন্ধ্যা তখন হয় হয়। সারাদিনের উদ্বেগ শেষ হয় সবার। জল ভর্তি চৌবাচ্চা,—একদিন দুপুরবেলা সবাই যখন ঘুমাচ্ছে তার মধ্যে বালক প্রবোধকুমার নেমে পড়লেন চুপি চুপি। কি আছে দেখিই না, এমনিই বালকে আগ্রহ। ছেলেটির উৎপাতে অন্যান্য সকলের বুক যখন ভয়ে দুরু দুরু করতো তখই দিদিমার স্নেহ উঠতো ঢেউ খেলিয়ে।

একদিন রঘুপণ্ডিতের পাঠশালায় তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। তখন বয়স মাত্র পাঁচ বছর। বালক প্রবোধকুমার রঘুপণ্ডিতকে কেবল ভয় করতেন যমের মতো। দুরন্ত বালক পাঠশালা থেকে যখন বাড়ী ফিরত তখন সন্ধ্যে হয় হয়। আর তার কিছুক্ষণ পরেই বালকের মা সান্ধ্য প্রদীপ জেলে ক্ষীণ আলোয় পড়ে শোনাতেন প্রহ্লাদ চরিত্র, পড়তেন ধ্রুবর কাহিনী। দুরন্ত প্রবোধকুমার শান্ত হয়ে শুনতেন মায়ের সুরেলা কণ্ঠ। অবাক হয়ে যেতেন প্রহ্লাদ আর ধ্রুবর কথা শুনে। দিদিমার বাড়ীতে একাদশী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাবেলা মাঝে মাঝেই হতো রামায়ণ গান। বালক প্রবোধকুমার সেই গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এমনি ভাবেই প্রবোধকুমার বড়ো হয়ে উঠতে লাগলেন। মনে মনে বিচরণ করতে লাগলেন কল্পনার জগতে। জন্মলগ্ন থেকেই সঙ্গী হয়ে রইলো দুর্ভাগ্য। পথে খেলার সাথী হয়ে এলো সমবয়সী নণ্টু। দিদিমার বাড়ীতে ভাড়া থাকত নণ্টুরা। একই দুরন্তপনার দুই সঙ্গী। দুজনে মিলে চড়াই পাখী ধরতেন, বিড়ালছানা পুষতেন, কাকের বাসা লুকিয়ে ভেঙে দিয়ে আসতেন। এমন সব কতো দুরন্তপনার ইতিহাস।

দিদিমার বাড়ীর উত্তর দিকে ছিল বস্তি পল্লী। ছোটবেলায় ওই টুকুই ছিল তাঁর চেনা জগৎ।

শিক্ষা ও খেলাধুলা

প্রবোধকুমার তখন স্কটিশচার্চ ইস্কুলের ছাত্র। এখানে বন্ধুত্ব হয় রবীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে। দুজনের খুব ভাব। দুজনে বেড়াতে যেতেন একসঙ্গে। এক এক দিন সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো স্টীমারে করে গঙ্গার বুকে। এমনি খেয়ালী প্রকৃতির ছিলেন। এইসময়ে তারাকাকা (৺তারাকুমার ভাদুড়ী) কয়েকটি বই উপহার দেন তাঁকে—তার মধ্যে একটি ছিল 'দাদামশায়ের থলে'। কিছুদিনের মধ্যে ছোটদের একখানা মহাভারত হাতে পেয়ে পড়ে নেন কৌতূহলী বালক। যীশুর জীবন কাহিনীও পড়তেন খুব আগ্রহের সঙ্গে। যীশুর জীবন কাহিনী এতই ভাল লেগেছিল যে তিনি খ্রীষ্টধর্মী

মানুষের সংস্পর্শে আসেন আকৃষ্ট হয়ে। অবশ্য বেশী দিন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকেনি। ছোট বয়সেই জলধর সেনের 'হিমালয়' গ্রন্থটি পড়ে নিয়েছিলেন। তখন থেকেই হিমালয় দেখবার জন্যে গভীর আকর্ষণ বোধ করতেন। বয়স যখন বছর দশেক পাঁটির বাগানে এক ভাড়াটে বাড়ীতে থাকার সময় ঐ বাড়ীতেই দেখেছিলেন নিবারণ বৈরাগী ও তার স্ত্রী কেষ্টদাসীকে। এসব চরিত্র পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয় ছোটগল্পের আসরে। বৈষ্ণব দাস-দাসীর প্রভাব পড়েছিল বালক প্রবোধকুমারের মনে। তাই নবদ্বীপে গিয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আসেন। সে পাগলামী অবশ্য ছিল বছর দুয়েক ধরে। দিদিমার অবসর সময়ে তাঁর মুখে শুনতেন যশোর খুলনা জেলার বামুনদের গল্প। সে গল্প প্রবোধকুমারের পূর্বপুরুষদের। এমনি করেই প্রবোধকুমার গল্পের ছলে জেনে নিয়ে ছিলেন ঠাকুরদা-ঠাকুরমাদের প্রকৃত পরিচয়। ছোট বয়স থেকেই ফুটবল আর হকি খেলার প্রতি ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। খেলার মাঠে যাওয়া চাই। এই ঝোঁকে পড়ে গড়ে তুলেছিলেন সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে একটি ফুটবল খেলার সঙ্ঘ। আর ভালবাসতেন ঘুড়ি ওড়াতে—রঙিন কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়াবার অনাবিল আনন্দে।

সাহিত্য

স্কটিশচার্চ স্কুল থেকে প্রকাশিত হয় হস্তলিখিত 'বাণী' নামে দেওয়াল পত্রিকা। তার সম্পাদক ছিলেন প্রবোধকুমার। এই পদটি অবশ্য লাভ করতে হয়েছিল সাহিত্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এই সময় হঠাৎ লোকান্তরিত হন স্কুলের পণ্ডিত মশাই। পণ্ডিত মশাইয়ের মৃত্যুতে গভীর আঘাত পেয়েছিল কিশোর মনে। পণ্ডিত মশাই পুত্রের মতো ভালবাসতেন দুরন্ত প্রবোধকুমারকে। পণ্ডিত মশায়ের মৃত্যুতে স্কুলে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। বালক প্রবোধকুমার সেই শোকসভায় স্বর্গীয় পণ্ডিত মশায়ের স্মরণে কবি মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনুসরণে একটি কবিতা লিখে পাঠ করেন—

গোপন হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের অভিমান সে। প্রবোধকুমারের ছেলেবেলা কাটে মামার বাড়ী আর ভাড়াটে বাড়ীতে। বিভিন্ন পরিবেশে ভাড়া বাড়ীতে বাস করার ফলে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয় সঞ্চিত। পরবর্তীকালে ছোট গল্প ও কোন কোন উপন্যাস লেখার উপাদান হিসাবে কার্যকরী হয় যথেষ্ট ভাবে। তিনি যখন উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র তখন সারা দেশে এসেছে অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার। এই পরিস্থিতিতে তিনিও স্থির থাকতে পারেননি—এসে যোগ দেন ছাত্র-আন্দোলনে। একের পর এক অভিজ্ঞতার হীরক খণ্ড দিয়ে ভরিয়ে তুলতে লাগলেন আগামী দিনের সাহিত্যিক তাঁর পরিব্রাজকের ঝুলি। ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু পড়াশুনা আর বেশী দূর এগোয়নি। কলেজে ভর্তি হবার পর এসে পৌঁছলেন এক অজানা বাইরের জীবনে। তাঁর গতি ও বিধি এখন আর কারো জানা নেই। তিনি রচনা করছিলেন একটা জগৎ। সে জগতে কোন দোসর ছিল না। তারপর থেকে এই পৃথিবীর সমস্যা বহুল পথ ধরেই হাঁটতে শুরু করেন কোথায় এর শেষ তাই দেখবার উদগ্র অভিপ্রায়ে।

সময়টা ১৯২২ সাল। কাশীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন। প্রবোধকুমার প্রথম দেখলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে। বিশ্বকবি ছিলেন ঐ সম্মেলনের সভাপতি আর কিশোর প্রবোধকুমার ছিলেন ভলেণ্টিয়ার মাত্র। সূর্যের আলো এসে পড়েছিল সবুজ কিশোর মনভূমিতে। আলো আর আনন্দে ভরে গিয়েছিল অনুসন্ধিৎসু কিশোরের অন্তর-জগৎ।

পড়া নেই, কোন কাজ নেই, তাই প্রচুর সময় হাতে। নতুন ভাবনা এসে সমগ্র মন জুড়ে বসলো, গল্প লিখতে হবে। শুরু হয়ে গেল গল্পের উপাদান সংগ্রহের কাজ। প্রথমেই লক্ষ্য পড়ল অবহেলিত মানুষদের প্রতি। যাদের সুখ-দুঃখের কোন সাথী নেই, যাদের বেঁচে থাকার মতো উপযুক্ত অবলম্বন নেই, নেই কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা পরিবর্তে আছে শুধু বঞ্চনা, অবহেলা আর শোষণ। প্রবোধকুমার তাদেরকে নিয়েই তাঁর গল্প লেখার কাজ শুরু করলেন। এই অসাধ্য সাধন করতে ওঁকে ঘুরতে হয়েছে রেলওয়ে প্লাটফরমে, ওয়েটিং রুম এবং যত্র তত্র। অল্প দিনের মধ্যে সেই সাধনার ফসল স্বরূপ একটি গল্প ছেপে বের হলো কল্লোল পত্রিকার প্রথম সংখ্যার পাতায়। গল্পটির নাম 'মার্জনা'। সেটা হলো ১৯২৩ সাল। এমনি করেই শুভারম্ভ হল সাহিত্যে পদযাত্রা।

কর্মজীবন ও ভ্রমণ

এক সময় জেলেদের সঙ্গে মিশে মাছের ব্যবসা করেন। বয়স তখন কত হবে! আঠারো-উনিশ। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যে কোন প্রকারে কিছু রোজগার করতেই হবে এই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। মাস তিনেক ধরে চলে ছিল সেই ব্যবসা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো। মায়ের মনের অশান্তি দূর হল। এবার তিনি যাবেন হরিদ্বারে মায়ের সঙ্গে। তরুণ প্রবোধকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর মা—যাবি নাকি? প্রবোধকুমার তো এক পায়ে খাড়া। এতদিনে জুটে গেল হিমালয় দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ। চলে গেলেন নাগাধিরাজ হিমালয়ের প্রবেশদ্বার—হরিদ্বার। হিমালয় থেকে ফিরে বন্ধু রবীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই দুজনে পালিয়ে গেলেন রেঙ্গুনে। হিমালয়ের পর সাগর যাত্রা। সে যাত্রার কষ্ট পরে সাহিত্যের খোরাক জুটিয়েছিল। ফিরে এসে 'বিচিত্রা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের কাজে যোগদান করেন মাত্র দু'মাসের জন্য। ১৯২৬ সালে শ্রীরামপুর ডাকঘরে সরকারী চাকরী অল্প কিছুদিন করার পর বিশেষ চেষ্টা করে সে চাকরীর দায় থেকে অব্যাহতি পান। এরপর এলো প্রবোধকুমারের জীবনে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ। ভারতীয় সৈন্য বিভাগে চাকরী নিয়ে চলে গেলেন রাওয়ালপিণ্ডি জেলার মারী পাহাড়ে। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল দেখবার বিশেষ সুযোগ পেয়ে গেলেন। ১৯২৮ সালের শেষে চাকরী ছেড়ে আবার ফিরে আসেন বাংলা মুল্লুকে। চাকরি ছাড়লেন শুধু সাহিত্যের জন্য। লিখেই তিনি রোজগার করবেন। যখন সেটা ছিল সে সময়ে অলীক কল্পনা। তবু কল্লোল, কালি-কলম প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবোধকুমারের একের পর এক লেখা ছেপে বার হতে লাগলো। ইতিমধ্যে 'যাযাবর' (১৯২৮) কলরব (১৯৩৩) প্রভৃতি উপন্যাস তাঁকে ইতিমধ্যে খ্যাতি এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেলেন কলরবের জন্য। কেদারবদ্রী ভ্রমণ করে ফিরে এসে রচনা করলেন এক নতুন সাহিত্য 'মহাপ্রস্থানের পথে'। সেই প্রথম সৃষ্টি হল বাংলা সাহিত্যে 'ভ্রমণ-উপন্যাস'। তারপর থেকে প্রবোধকুমারকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৩৭ সালে যুগান্তর পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে

সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে মা বিশ্বেশ্বরী পরলোক গমন করেন। প্রবোধকুমার মনের দিক থেকে এই সময় সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়েন। 'বন্যাসঙ্গিনী' ও 'অঙ্গরাগ'-এর মতো বিখ্যাত গল্প সংকলন তখন প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্য সাধনা চলছে অব্যাহত গতিতে। তাই প্রবোধ কুমারকে বলতে শুনি "আমার অশান্ত গতিকে আমি থামতে দেব না। আমার পথ কোনদিন শেষ হবে।"

প্রথম খণ্ডে প্রবোধকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথার প্রথম পর্ব প্রকাশ করা হলো। পরবর্তী আরো তিনটি খণ্ডে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে বাকি তিনটি পর্ব—এই প্রতিশ্রুতি রইলো।